ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।

(প্রমম খণ্ড)

প্রণেতা

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"মাতৃভাষার আলোচনায় মনুষ্যের আয়ু সম্বর্দ্ধিত
হয়; সাহিত্যের আলোচনায় পরমানন্দ
জন্মে। আনন্দ সমাযুক্ত দীর্ঘ জীবন
কেবল মোক্ষেচ্ছুদিগেরই
পরম ধন"।—গ্রন্থকার।

কলিকাতা।
৩০/৫ মদন মিত্রের লেন নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১০

মূল্য ১৷৹ পে

স্থচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	মাসিক পত্রের নাম
মাহাত্তা শৈশা ...	১	... (ভারতী)
অজহর ...	১৫	... ঐ
সম্পূর্ণ আদর্শ ...	২৮	... (সুধা)
শ্রীনাথদ্বার ...	৩৬	... (ভারতী)
দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ	৬১	... (উৎসাহ)
সংযম সামর্থ্য ...	৬৯	... ঐ
বাবা ব্রহ্মানন্দ ...	৭৯	... (আরতি)
ইটের বই ...	৯২	... (নব্যভারত)
সাসারামের রোজা ...	১০৬	... (সাহিত্য)
হিন্দু শব্দ তত্ত্ব ...	১১৩	... (ভারতী)
বউ কথা কও ...	১৪৯	... (বামাবোধিনী পা
পদচিহ্ন ...	১৫৫	... (সুধা)
রেতীমায়ী ...	১৬৭	... (নবপ্রভা)
অদৃষ্ট খণ্ডন ...	১৭৯	... (সুধা)
রাণী ভবানীর পত্র ...	২০১	... (প্রবাসী)
বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ	২০৯	... ঐ
শাক্ত ও শৈব ...	২২৭	... (সুধা)
শব্দ তত্ত্ব ...	২৪৫	... ঐ
দাসের সংস্কৃতাভিজ্ঞতা	২৮৯	... (ভারতী)

ভূমিকা।

আমার "প্রবন্ধাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি একটি কথাও কহিতে ইচ্ছা করি না। গ্রন্থখানি সর্ব্ব সাধারণের পাঠের জন্য সমর্পিত হইল; প্রবন্ধ সমূহের দোষগুণ সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয়েরাই আলোচনা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার অভিলাষ ও প্রার্থনা।

প্রবন্ধাবলীর ১ম খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার সম্বন্ধে "নব্যভারত" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের সুযোগ্য ও সদ্বিদ্বান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আমি নানা কারণে ঋণী আছি। আমার যে সকল বন্ধু এই গ্রন্থ প্রচারে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের নিকটেও কৃতজ্ঞ রহিলাম। যাহা হউক, নানা প্রকারের উপকার ও উদারতার জন্য দেবী বাবুর নাম এই গ্রন্থের সহিত চিরদিন সংযোজিত থাকিবে।

কলিকাতা,
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। বিনীত
ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

প্রকাশকের নিবেদন।

"ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী, নবপ্রভা, বঙ্গভাষা, সাহিত্য, সুধা, আরতি, বামাবোধিনী পত্রিকা, উৎসাহ, বিশ্বজননী, বীরভূমি, গৌড়-ভূমি, পন্থা, আশা, সখি, ভারতসুহৃদ্, অতিথি, সমালোচনী, প্রদীপ, জন্মভূমি, প্রকৃতি, বঙ্গদর্শন, কোহিনুর, কৃষক, ছাত্র, আলোচনা প্রভৃতি

ত্রিশখানি মাসিক পত্র ও পত্রিকায়, শ্রীমৎ স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের বিরচিত যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ও সংগ্রহ করিয়া আমি "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী"র প্রথম খণ্ড পরিসমাপ্ত করিয়াছি। সহৃদয় পাঠক ও গ্রাহকবৃন্দের আগ্রহ ও উৎসাহ অনুসারে এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ করা আশাতীত বলিয়া আশঙ্কা হয় না।

বর্ত্তমান খণ্ডে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তৎসম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করা গ্রন্থকার বা প্রকাশকের ইচ্ছা নহে। বলা বাহুল্য, এই সকল প্রবন্ধের সমালোচনার সময়ে নানা ভাষার নানা দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়গণ লেখকের এবং প্রবন্ধ নিচয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ ইংরাজি, হিন্দী, তামীল এবং উর্দ্দু ভাষার সমাচার পত্রে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে এবং কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষে কেন, সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বহুল সমাচার পত্রে এবং গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রবন্ধাবলীর অনেক প্রবন্ধ "প্রামাণিক" (authority) বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় প্রাজ্ঞ বৃন্দের অথবা প্রখ্যাত সম্বাদ পত্র সম্পাদক কিম্বা মাসিক পত্র পরিচালক মহাশয়দিগের রাশি রাশি অভিমত উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের আয়তন বর্দ্ধন করিবার ইচ্ছা নাই; বিশেষতঃ সমালোচনার মহিমায় পুস্তক প্রচার করা গ্রন্থকারেরও অভিলাষ-সম্মত নহে। সহৃদয় পাঠক মহাশয় এবং পাঠিকা মহাশয়গণ প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন, ইহাই আমাদের আশা এবং ইহাই প্রার্থনা।

যে সকল মাসিক পত্রে প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ সমূহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, সূচীপত্রে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। ভরসা করি, পাঠক মহাশয়দিগের অনুগ্রহে "প্রবন্ধাবলী"র অপরাপর খণ্ডগুলি সত্বরে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব।

কলিকাতা,
নব্যভারত-প্রেস।
১লা আষাঢ়, ১৩১০।

বিনয়াবনত,
শ্রীভূতনাথ পালিত।
প্রকাশক।

ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।

মাহাতা শৈসা।

সততা, ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রমপটুতা, এবং অসাধারণ অধ্যাবসায় বলে জগতে যে সকল ব্যক্তি অতি দীন হীন অবস্থা হইতে অত্যুচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, মাহাতা শৈসা তাঁহাদের অন্যতম। ধনকুবের শৈসা ইউরোপীয় বা আমেরিকান ছিলেন না; ভারত মহাসাগরের মধ্যস্থিত সিংহল দ্বীপের কোনও দরিদ্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পিতার ঔরসে এবং দরিদ্রা বৌদ্ধ মাতার গর্ভে ইহঁার জন্ম হয়। মহৎ লোকের বিচিত্র এবং পবিত্র জীবন-চরিত আলোচনা করিলে যদি ভগ্ন হৃদয়ে আশা, অধঃপতিত সমাজে উদ্দীপনা, কর্ত্তব্য-বিমুখ মানবের মনে কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং চিরদরিদ্রের মনে ধন-বান হইবার ইচ্ছা ও তজ্জনিত চেষ্টা বলবতী হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে মহাত্মা মাহাতা শৈসার বৈচিত্র্যময়ী জীবনী বর্ত্তমানকালের শিক্ষিত যুবকদিগের নিকটে পঠিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। মাহাতা শৈসার জীবনী আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সিংহলের পুরাতন ইতিবৃত্তের একটু পরিচয় না দিলে এই প্রবন্ধের অন্তর্গত অনেক বিষয় বুঝিয়া উঠা কঠিন হইবে, এই জন্য তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলিয়া রাখা ভাল। বহুকাল-

ব্যাপী হিন্দুরাজত্বের বিলোপ হইলে মূর নামক অর্দ্ধবর্ব্বর জাতি কিছুকাল সিংহলে শাসন বিস্তার করে; তদনন্তর পর্টুগীজ এবং দিনেমরাগণ স্বল্প-কাল রাজত্ব করিবার পরে ওলন্দাজেরা আসিয়া সিংহল আক্রমণ করেন এবং সিংহলের অধীশ্বর হয়েন। ওলন্দাজেরা রোমান কাথলিক খৃষ্টান ছিলেন; সিংহল অধিকার করিয়া তদ্দেশবাসী সমগ্র বৌদ্ধজাতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। সংকল্প সুসিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা বলপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; পাশব বলপ্রয়োগে অযথা উপায়ে ওলন্দাজেরা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যিশুর ধর্ম্মপ্রচার জন্য তাঁহারা যে সমস্ত কঠোর আইন প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ওলন্দাজ শাসনের দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপে সিংহলবাসীরা স্মরণ করিয়া থাকে। আইনের মর্ম্ম এই :—

"যে কেহ খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত না হইবে, তাহাকে রাজকীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করা যাইবে না। এরূপ অ-খৃষ্টান ব্যক্তিকে বাণিজ্য বা ব্যবসা করিবার জন্য পাট্টা (লাইসেন্স) দেওয়া যাইবে না এবং এরূপ ব্যক্তির গৃহ, কৃষিক্ষেত্র, গো, অশ্ব, ছাগ, মহিষ, বালক, বালিকা এবং আয়ের উপরে কর নির্দ্ধারিত করা হইবে। অ-খৃষ্টান ব্যক্তিরা কোনও প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে অধিকার পাইবে না এবং তাহাদের বিবাহকালে রাজকীয় ভাণ্ডারে দশ টাকা জরিমানা দাখিল করিতে হইবে।" ইত্যাদি।

এরূপ অত্যাচারে অনেকে খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করিল বটে, কিন্তু প্রজা-পুঞ্জের মনে রাজভক্তির লোপ হইল। যাহারা পুরাতন ও পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, তাহারা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সিংহলের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত বহুদিনের গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রণা এক্ষণে ভীষণ বিদ্রোহে পরিণত হইল। ওলন্দাজদিগের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল না, সুতরাং তাহারা বৌদ্ধদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। সন্ধির মর্ম্ম এই—

"খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য যে সকল আইন প্রচার করা গিয়াছিল, তাহাতে প্রজা সাধারণের ঘোরতর অনিচ্ছা ও অসুবিধা দেখিয়া, ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা নিয়ম করিতেছেন যে অতঃপর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা অথবা না করা প্রত্যেক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর ইচ্ছার অধীনে রহিল, তদ্বিষয়ে কোনও বল বা কঠোরতা প্রকাশ করিবার জন্য ওলন্দাজ রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইলেন। অদ্য হইতে রাজা এবং প্রজা এতদুভয়ের সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে রাজকীয় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আইন সমূহ ব্যবস্থা-পুস্তক (Statute Book) হইতে স্বতন্ত্র করা হইল এবং ঐ আইন অদ্য হইতে পরিত্যক্ত পত্র (Dead Letter) বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে। কিন্তু ঐ সকল রাজবিধির পরিবর্ত্তে এক্ষণে এই নিয়ম করা হইল যে, এই দ্বীপে (সিংহলে) যে সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরিণত বয়স্ক পুরুষ আছেন, তাঁহাদিগকে এবং অতঃপর তাঁহাদের পুরুষাপত্য (Male issue) দিগকে বৌদ্ধ নামের সঙ্গে একটি করিয়া খৃষ্টান নাম ব্যবহার করিতে হইবে। উভয় পক্ষে লোকেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায়, অদ্যকার দিনে—বৃহস্পতিবারে—সেন্ট বার্থলোমিউ গির্জ্জায় খৃষ্টীয় ১৬৬৮ শব্দে জুলাই মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে রাজা প্রজা এতদুভয়ের প্রধান প্রতিনিধির স্বাক্ষরে এই সন্ধিপত্র বিধিবদ্ধ হইল।" *

এইরূপে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে প্রজারা সুখে ও শান্তিতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বৌদ্ধনামের সঙ্গে একটি বা ততোধিক খৃষ্টীয় নাম সংযোজিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে এজন্য এক একটা রেজেষ্ট্রি আপিস ছিল, তাহাকে ওলন্দাজেরা তাহাদের ভাষায় "দানশ্চিয়ন" বলিত। বৌদ্ধনামের সহিত কিপ্রকারে কৌতুককর খৃষ্টীয় নাম সংযোজিত হইত, তাহার দুই চারিটি নমুনা দিয়া পাঠক মহাশয়কে বুঝাইতে ইচ্ছা করি। তদ্যথা—উইলিয়ম উভয়শেখর; পল্ যাদুকরীণ; ফ্রেডুরিক যশস্কর; আঞ্জিলো ডি দিবাকরম্; গাম্বোটা হেন্‌রী সূর্য্যাধিকারীন্; রিজাবেলা অনন্তগিরি; ইত্যাদি। এই সকল নামে উভয়

* "The Ancient History of Ceylon," Trubner and Co, vol. II, chap IX (Vide St. Bartholomew's Church.)

শেখর, যাহুকরিন, যশস্কর, দিবাকরম্, সূরিয়াধিকারীণ এবং অনন্তগিরি এইগুলি পালি, মাগধী ও সিঙ্গালী ভাষা মতে বৌদ্ধ নাম; বাকি নাম গুলি খৃষ্টীয়। অনেক বর্ষ পর্য্যন্ত ওলন্দাজেরা সিংহল শাসন করিয়া হীন-বল হইয়া পড়েন এবং অবশেষে বাধ্য হইয়া কয়েক লক্ষ মাত্র রৌপ্য মুদ্রা মূল্যে ইংরাজদিগকে এই দ্বীপটি বিক্রয় করেন, তদবধি সিংহল বা লঙ্কায় বিক্রমী বৃটিশের শাসনারম্ভ হইয়াছে। অনেক কাল ইংরেজের রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে; খৃষ্টান হইয়াও ইংরাজ ওলন্দাজদিগের ন্যায় পরকীয় ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু তথাপি প্রবীণ ওলন্দাজদিগের সন্ধিপণানুসারে লঙ্কাদ্বীপে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বৌদ্ধদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৮ জন খৃষ্টীয় নাম ব্যবহার করেন। অনেকের নাম শুনিলেই খৃষ্টান বলিয়া ভ্রম হয়। যাহাহউক, মাহাতা শৈসার পিতা অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াও পৈত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকেও খৃষ্টীয় নাম ধারণ করিবার জন্য বাধ্য হইতে হইয়াছিল। শৈসার পিতার নাম ছিল ডেকোস্‌টা দিবাকর শৈসা। দিবাকর অতি দরিদ্র ছিলেন, বৈদ্যগিরি করা তাঁহার ব্যবসা ছিল; দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে পীড়িত ব্যক্তি-বর্গকে ঔষধ দিয়া তিনি যাহা কিছু সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাঁহার সংসার প্রতিপালন হইত। মাহাতা শৈসা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, তদ্ব্যতীত আর তিনটি পুত্র এবং ছয়টি কন্যা ছিল। দরিদ্র দিবাকর, মাহাতা শৈসাকে সামান্য মাত্র সিংহলী ভাষা এবং অতি সামান্য ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বৈদ্যশাস্ত্রমতে চিকিৎসা বিদ্যায় অনেকদিন পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া তাঁহাকে "কাজ চলা গোছ" চিকিৎসক করিয়া তুলিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষা হইতে সুশ্রুত, বাভট, হারীত, চরক প্রভৃতি বহুল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকে পালি, মাগধি এবং সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। মালাবার উপকূল

হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহলের সমুদ্রতট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র "দেশীয় চিকিৎসার" এখন খুব প্রচলন। দিবাকুর বৃদ্ধবয়সে এবং একপ্রকার নিঃস্ব অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে মাহাত্তা দেখিলেন, পিতার গচ্ছিত বা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে ৩৬টি রৌপ্য মুদ্রা, ৪৭টি বোতল, ২৯টি শিশি, দ্বাদশটি মৃণ্ময় পাত্র, তিন যোড়া পরিধেয় বস্ত্র, একখানি কার্পেট, ৫ খানি মাদুর এবং দুইটি উপাধান (বালিশ) ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। অপরাপর দ্রব্যাদি যাহা ছিল, তাহাদের সমুদয়ের একত্রিত মূল্য পঞ্চবিংশতি মুদ্রার অধিক হইবে না। এই সামান্য মাত্র সম্পত্তি রাখিয়া অষ্টাদশ বর্ষীয় মাহাত্তার পিতা ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার শরীরের, মনের এবং গৃহস্থালীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, প্রবীণ বয়সে মাহাত্তা তৎসম্বন্ধে স্বহস্তে যাহা লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অনেকগুলি ভাই, ভগ্নি এবং আমাকে ও আমার বিধবা মাতাকে একেবারে নিঃস্বাবস্থায় রাখিয়া আমার পিতা মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সামান্য চিকিৎসা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন আয় ছিল না। সে সময়ে বিলাতী এবং দেশীয় চিকিৎসকের সংখ্যাও কম ছিল না। চিকিৎসা ব্যবসায়ে আমার অতি সামান্য আয় ছিল, কারণ আমার প্রবৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসকেরা আমাদের রোগীদিগের নিকট এই বলিয়া আমার নিন্দা করিত, যে, শৈসা ছেলেমানুষ, চিকিৎসার কি জানে? কোন কোন দিন আমার হাতে কিছুই আসিত না; যে দিন কিছু পাওয়া যাইত, তাহার পরিমাণও সামান্য ছিল। কিন্তু আমি সহজে দমিত হইবার যুবক ছিলাম না। যে বৎসর আমার পিতার মৃত্যু হয়, সে বৎসর সিংহলে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লঙ্কার লোকেরা ভাত খায়, কিন্তু এ দেশে ধান্যের চাষ ভালরূপ হয় না, এজন্য মান্দ্রাজ হইতে চাউল আসিত। সস্তা হইবে বলিয়া অনেকে সে বৎসর চাউলের পরিবর্ত্তে ধান্য আনাইয়া লইয়াছিল; আমার মাতা অনেক গৃহস্থের

বাটিতে গিয়া ধান ভানিতেন, তাহাতে আমাদের ছয় আনা লাভ হইত। যে দিন চিকিৎসা চলিত না, সে দিন আমি প্রতিবাসীদিগের পুরাতন ছিন্ন পোষাকাদি স্বহস্তে সেলাই করিতাম এবং সে সময়ে চেয়ার টেবিল মেরামত করিয়া দিতাম। এই দুইটি কার্য্য আমার পিতা আমাকে শিখাইয়াছিলেন। ইহাতে কিছু কিছু আয় হইত। আমার ছোট ছোট ভাই ও ভগ্নিগণ পাঠশালা হইতে আসিয়া অবসর মত ফুল তুলিতে যাইত এবং ফুলের সুন্দর মালা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিত, তাহাতেও কিছু লাভ ছিল। অনেক প্রকারে অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া আমি সংসার চালাইতাম। শরীর ভাল ছিল না, মনে সততই চিন্তা থাকিত, কিন্তু তথাপি কখনই নিরাশ হই নাই। অমিত অধ্যবসায়বলে সকল প্রকার বিপদ এবং অসুবিধা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম। আমি আত্মহত্যার পোষক নহি, আত্মহত্যা করিতে কাহাকেও পরামর্শ দিই নাই, কিন্তু ভিক্ষা করা অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয়স্কর, ইহা আমার ধারণা ছিল। ভিক্ষা করা আমি ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমি কেবল পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিতাম এবং পরিশ্রমও সততই আমাকে পরিণামে লঙ্কেশ্বর পদবীতে অভিষিক্ত করিয়াছিল।”

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, একদিন তিনি অকস্মাৎ একখানি পত্র পাইলেন, ঐ পত্রে যাহা লেখা ছিল তাহা এই—

“তোমার পিতা আমাদের পুরাতন চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় আমরা তোমাকে তৎপদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। উপস্থিত কোনও বেতন দেওয়া হইবে না, কিন্তু আমাদের কাহারও পীড়া হইলে চিকিৎসার জন্য তোমাকেই আহ্বান করা যাইবে। আমি এক্ষণে যক্ষ্মা রোগ এবং ক্ষয় রোগে কষ্ট পাইতেছি, পত্রপাঠ মাত্র আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইবে।”

পত্র প্রাপ্ত হইয়া ঝটিতি মাহাতা শৈসা প্রেরকের বাটিতে গেলেন। ঐ পত্রের লেখক একজন সম্ভ্রান্ত সিংহলী খৃষ্টান, প্রায় দুই পুরুষ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছেন; অবস্থাও খুব উন্নত। তাঁহার নাম লরেটো বেঞ্জামিন পিটর। মাহাতা তথায়

পৌঁছিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আশু কোন প্রতি-কার সম্ভাবনা দেখা গেল না। লরেটোর বাটীর অল্প দূরে একটী প্রকাণ্ড পুরাতন উদ্যান ছিল, মাহাতা প্রতিদিন প্রাতে তথায় একাকী বেড়াইতে যাইতেন। ঐ উদ্যানের বহুকাল সংস্কার হয় নাই, সুতরাং উদ্যান-মধ্যস্থিক অট্টালিকাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সর্প, শৃগাল, গর্দ্দভ প্রভৃতি জন্তুর সতত গমনাগমন হইত। একদিন প্রভাত কালে ঐ বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার পদাঘাতে স্থানবিশেষে এমন সকল লক্ষণ দেখা গেল, যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐ মৃত্তিকার নিম্নে কোন দ্রব্য প্রোথিত আছে। অনেক চেষ্টার পরে শৈসা জানিতে পারিলেন, মাটির নীচে কতকগুলি তাম্র নির্ম্মিত কলসে সুবর্ণ এবং রৌপ্য মুদ্রা পোঁতা আছে। অকস্মাৎ এই প্রচুর মুদ্রা দেখিয়া তিনি আনন্দ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু এত টাকা লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ নহে, নিশ্চয়ই লোকে ইহা দেখিতে পাইবে; অনন্তর অনেক প্রকারের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া স্থির করিলেন, "যাঁহার মৃত্তিকা মধ্যে এই গুপ্ত ধন পাইয়াছি তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ইহা আত্মসাৎ করা মহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমি লরেটোকে একথা ব্যক্ত করিব, তাহার পরে তিনি যেরূপ আদেশ করেন, সেইমত কার্য্য করা যাইবে।" শৈসা অতি দরিদ্র ছিলেন, বিশেষতঃ সেই সময়ে তাঁহার অর্থের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল, কিন্তু যুবা বয়সে অনেকে প্রথমে লোভান্ধ হইলেও স্বল্প সময় মধ্যেই ধর্ম্মজ্ঞানে আলোকিত হইয়া উঠে। শৈসা তাঁহার জীবনে এক সহস্র মুদ্রা একত্রে কখন দেখেন নাই, কিন্তু লোভ সম্বরণ করিয়া তিনি ধর্ম্মজ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। লরেটো এই সকল কথা শুনিয়া রুগ্ন দেহে বল প্রাপ্ত হইলেন, এবং বলিলেন, "আমার আর রোগ নাই। যদি কিছু বাকি

থাকে, তাহা হইলে অতঃপর বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইব।" টাকার উষ্ণতা এবং প্রভাব এমনই বটে! হাতে লাঠি লইয়া সেই তিন মাস শয্যাগ্রস্ত লরেটো ধীরে ধীরে বাগানে গেলেন এবং ভৃত্যদের সাহায্যে মুদ্রাসমূহ স্বগৃহে উঠাইয়া আনিলেন। শৈসার ভাগ্যে দুইশত স্বুবর্ণ মুদ্রা এবং পঞ্চশত রৌপ্য মুদ্রা মিলিল। পরদিন লরেটোর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শৈসা বাটী চলিলেন। পথে যাহা ঘটিয়াছিল, তাঁহার নিজের মুখেই শুনুন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমার সঙ্গে আবার হিতৈষী লরেটো তিন জন লোক দিয়াছিলেন। সায়ংকালে আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশস্থিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া চলিতেছিলাম, এমন সময়ে ভাদুই নামক অসভ্য জাতিরা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করতঃ যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আমরা রিক্ত হস্তে এবং নগ্নাবস্থায় গৃহে আসিয়া পৌছিলাম। অদৃষ্টে আমি খুব বিশ্বাস করিতাম এবং বৌদ্ধ জাতির মধ্যে পুরাকাল হইতে এই বিশ্বাস খুব প্রবল। ঘরে আসিয়া মাতাকে সকল কথা বলিলাম, তিনি এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন, "যেখানেই যাও, ভাগ্য ভিন্ন অন্য পথ নাই।"

ইহার প্রায় সার্দ্ধৈক বৎসর পরে লরেটো আর একবার শৈশাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সেবারে গিয়া শৈসা দেখিলেন লরেটোর প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধন ধান্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং প্রশস্ত দ্বারমণ্ডপে শাণিত তরবারীহস্তে সুসজ্জিত প্রহরী দণ্ডায়মান এবং তাহার পার্শ্বে ঘোড়া ও হাতী বাঁধা আছে! অতি যত্নে লরেটো শৈসাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহা তোমারই অনুগ্রহে হইয়াছে। কয়েক দিবস পরে, লরেটোর একমাত্র কন্যার সহিত শৈসার বিবাহ স্থির হইল। কন্যা অত্যন্ত রূপবতী ও অত্যন্ত গুণবতী ছিলেন। বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানে না, সুতরাং বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানে বিবাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাহ প্রণালীর কথা বর্ণনা করিলে

অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য প্রবন্ধও দীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং সে সকল কথা এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। এই বিবাহ সম্বন্ধে শৈসা স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলেও লরেটোর কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার লাবণ্যময়ী ভাবী পত্নীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও অনুনয়ে আমি বাধ্য হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মমতেই বিবাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। মরুটোয়া নামক স্থানে এক খ্রীষ্টীয় গির্জ্জায় আমার বিবাহ হয়। ঐ নগরেই আমার শ্বশুর বাড়ি এবং ঐ নগরেই এক্ষণে সৎপ্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ শৈসাকলেজ অবস্থিত। যখন আমি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম তখন খৃষ্টানদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, অথচ আমি খৃষ্টান হইয়াছিলাম! অনেক দেশে অনেক লোকের খৃষ্টান হইবার প্রথমাবস্থা বোধ হয় আমারই মত। বিবাহের পরে আমার শ্বশুর আমার পত্নীকে ছয় হাজার টাকা স্ত্রীধন দিয়াছিলেন এবং আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম "আমি পরের ধনে ধনী হইতে আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আমার নিজের হাতে যাহা উপার্জ্জন করিব, তাহাই আমার ধন তদ্ভিন্ন সমুদয়ই ভিক্ষার ধন বলিয়া গণ্য করি।"

কথা শুনিয়া লরেটো বিস্মিত হইলেন। শৈসা লিখিয়াছেন, "আমি আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে একটি পয়সাও কখনও ঋণ বা সাহায্য স্বরূপে গ্রহণ করি নাই। আমি আমার নিজের চেষ্টায় ধনকুবের ও লক্ষেশ্বর হইয়াছি, শ্বশুরের সাহায্যে হই নাই।" কি আশ্চর্য্য আত্মমর্য্যাদা! ভবিষ্যতে যাঁহারা জগন্মণ্ডলে পুরুষপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়েন, বাল্যকালে এবং যুবাবস্থায় তাঁহাদের এইরূপ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। পত্নীকে লইয়া শৈসা গৃহে আসিলেন এবং জননীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন—"অয়ি সহধর্ম্মিণী! তুমি ধনবান ভদ্রলোকের কন্যা তাহা আমি জানি এবং শৈশব কাল হইতে সুখে ও স্বচ্ছন্দে

জীবন কাটাইয়া আসিয়াছ তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে,কিন্তু আমি দরিদ্র-সন্তান এবং আমার গৃহস্থালীও দরিদ্রের গৃহস্থালী। দরিদ্র হইলেও আমি তোমার স্বামী এবং তুমি আমার স্ত্রী; পতির দুঃখভার বহন করা পত্নীর ধর্ম্ম। আমার গৃহে তুমি সৌখিন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবে না, এখানে তোমাকে গৃহস্থের মেয়ের মত কার্য্য করিতে হইবে। ষ্টকীং আঁটিয়া, বুট জুতা পায়ে দিয়া, কোট পরিয়া, আতর গোলাপের আঘ্রাণ লইতে লইতে দিন কাটাইলে চলিবে না; পরিশ্রম কর এবং খাও, ইহাই আমার নীতি। গৃহকর্ম্ম করা সতীস্ত্রীর ধর্ম্ম; নিরবচ্ছিন্ন অলসভাবে সৌখীনি করা বারাঙ্গনার কর্ম্ম।" অতি সুন্দর নীতি! অতি সুন্দর উপদেশ!

স্বল্পকাল মধ্যে কয়েকখানি বিদেশীয় সম্বাদপত্র পড়িতে পড়িতে শৈসা নিজের সুতীক্ষ্ণ সূক্ষ্মদর্শিতা জ্ঞানে বুঝিতে পারিলেন, অতি অল্প সময় মধ্যে ইউরোপে এক মহাযুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা, এবং ঐ যুদ্ধ ঘটিলে বহু লক্ষ মুদ্রা মূল্যে"অস্থির"প্রয়োজন হইবে। তিনি নানাস্থানে গমন করিয়া এবং নানা-প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট অতিক্রম করিয়া হাড় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নরাস্থি, পশ্বাস্থি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে লাগিল। প্রায় সার্দ্ধেক মাস কাল মধ্যে ঐ সকল রাশিকৃত অস্থি কলম্বো নগরে আনীত হইয়া প্রায় দ্বাদশটি গুদামে পরিপূরিত হইল। অল্পদিনের পরেই বড় বড় সওদাগরদিগের নিকটে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সমাচার আসিয়া পৌঁছিল, 'যত টাকা মূল্য চাও দিতে সম্মত আছি, লক্ষ লক্ষ মণ হাড় জাহাজ ভরিয়া পাঠাইয়া দাও।" ইউরোপ ও আমেরিকার তাগিদের জোর খুব, কিন্তু সওদাগরদিগের কাহারও ঘরে মাল নাই। এ দিকে বর্ষা ঋতুর সূত্রপাত হওয়ায় হাড়সংগ্রহ করা সুকঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। মাহাতা শৈসা এই হাড়ের ব্যবসায়ে খরচ খরচা বাদে এক লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এতদিন পরে তিনি

রীতিমত মূলধন প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার কার্য্যের সূচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তেইশটি নীল কুঠি এবং সতেরটি চা কুঠি প্রতিষ্ঠিত হইল। চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যে মাহাতা শৈসা সিংহল দ্বীপের সমুদয় দেশীয় এবং বিদেশীয় সওদাগর এবং ধনবান জমিদারদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। তখন মহাজনী, তেজারতী ও ব্যাঙ্কের কর্ম্ম, জমিদারী, হুণ্ডির কারখানা, সওদাগরী প্রভৃতিতে শৈসার নাম প্রতি গৃহে গৃহে গার্হস্থ্যশব্দ বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। যে কোনও নগর বা যে কোনও উপনগরে যাও, শৈসা ভিন্ন আর কথাটি নাই! অমুক রাজা বিপদে পড়িয়াছেন, অমুক জমিদার রাজস্ব দিতে পারিতেছেন না, অমুক সওদাগরের ইন্‌সলভেন্ট্ হইবার উপক্রম হইয়াছে, অমনই সকলে সেই পতিতপাবন ধনকুবের শৈসার গৃহে গিয়া উপস্থিত! শৈসার নামে ও বিক্রমে বাঘে ছাগে এক ঘাটে জল খাইত; তাঁহার ভয়ে ডাকাইতেরা দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যাইত। শৈসার সুপারিষ পত্রে তখন লোকের ডেপুটীগিরি হইত এবং খুনীর সাত খুন মাপ হইত! গবর্ণরই বল আর পুলীশের কনেষ্টবলই বল, শৈসার প্রাসাদে সকলেই এখন গমনাগমন করেন। পথ দিয়া শৈসার গাড়ি গেলে সহস্র সহস্র লোক দুই হাত তুলিয়া সেলাম করে। কি আশ্চর্য্য উন্নতি! কি অসাধারণ স্বয়ম্ভূ সমুত্থান শক্তি! মাহাতা শৈসার সমগ্র জীবন-চরিত আলোচনা করিবার অবকাশ নাই এবং ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এত বড় জীবনচরিত্রের সমাবেশ হওয়াও অসম্ভব।

শৈসা এখন ইহলোকে নাই; কিন্তু তিনি মৃত হইলেও জীবিত; এমন পরোপকারী পবিত্রচেতা মহাপুরুষের কি মৃত্যু হয়? উপনিষদকার বলেন, "মহাপুরুষদের মৃত্যু কেবল দেহান্তর মাত্র; ইহাঁদের অন্তর্দ্ধান কেবল অনন্ত জীবনলাভের উপায় মাত্র।" যত প্রকারের উপাধি দিলে

মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্মান করা হইতে পারে, সিংহল গবর্ণমেণ্ট শৈসাকে তাহা দিয়াছিলেন; নাইট, লর্ড, আরল্ প্রভৃতি উপাধি বিলাত হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু শৈসা প্রজাপুঞ্জের প্রদত্ত "লঙ্কেশ্বর" উপাধি ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সিংহল দ্বীপে খুব বড়লোকদিগকে মাহাতা বলে, বোধ হয় ইহা সংস্কৃত মহাত্মা শব্দের অপভ্রংশ; শৈসা "মাহাতা" উপাধি ভালবাসিতেন এবং ঐ নামই সতত ব্যবহার করিতেন। অনেক অনুরোধে তিনি গবর্ণরের কৌন্সিলের মেম্বরপদ, জষ্টিশ্ অব্ দি পিস্ পদ এবং কলোনিয়াল গবর্ণমেণ্টের ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করিয়া অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি যেমন ধনকুবের হইয়াছিলেন, তেমনি নানা ভাষায় এবং নানা বিদ্যায় অতুল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা ও সংগীত বিদ্যায় তিনি উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং কৃষিবিদ্যার প্রচলন জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান পুরুষদিগের ভক্তিপাত্র হইয়াছিলেন। শৈসার বদান্যতা সম্পূর্ণরূপে উল্লেখ করিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে, সংক্ষেপে আমি তাঁহার কতকগুলি প্রধান প্রধান সৎকীর্ত্তি ও দানের কথা লিখিতেছি।

১। মরুটোয়া শৈসা কলেজ, বার্ষিক ব্যয় বিংশ সহস্র টাকা। ২। নিগম্বো ধীবর বিদ্যালয়, বার্ষিক ব্যয় দুই সহস্র টাকা। ৩। পারাদেনীয়া কৃষি কলেজ ও কৃষিক্ষেত্র, বার্ষিক ব্যয় এক লক্ষ মুদ্রা। ৪। কলম্বোর তিনটি বালিকা বিদ্যালয়, বার্ষিক ব্যয় (একত্রে) ছয় সহস্র টাকা। ৫। কলম্বো শৈসা কলেজ, বার্ষিক ব্যয় চতুর্ব্বিংশ সহস্র মুদ্রা। ৬। মরুটোয়া খৃষ্ট গির্জ্জা ও খৃষ্ট সভা, বার্ষিক ব্যয় তের হাজার টাকা। ৭। কলম্বো খৃষ্ট সমাজ, বার্ষিক ব্যয় দশ সহস্র টাকা। ৮। কলম্বো, কাণ্ডি, অনন্তপুর এবং গলবন্দরের রাস্তার জন্য বার্ষিক ব্যয় সার্দ্ধ তিন

সহস্র টাকা। ৯। কাণ্ডি কলেজে বার্ষিক দান বার শত টাকা। ১০। ত্রিনকমলী বন্দরে দীনহীন যাত্রীদিগের দুঃখোপনোদন জন্য সভায় বার্ষিক সাহায্য আড়াই হাজার টাকা। ১১। গলবন্দরে ঐ আড়াই হাজার টাকা। ১২। বৌদ্ধ কাঙ্গালি সভায় বার্ষিক দান বার হাজার টাকা। ১৩। খৃষ্ট কাঙ্গালি সভায় বার্ষিক দান বার হাজার টাকা। ১৪। সমুদয় সিংহলের দরিদ্র খৃষ্টীয়দিগের জন্য পান্থশালার ব্যয় বার্ষিক ৮ হাজার টাকা। ১৫। সিংহলীভাষায় উন্নতিকল্পে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা। ১৬। খৃষ্টীয় পুস্তক প্রচার জন্য বার্ষিক ছয় হাজার টাকা। ১৭। চারিটি হাঁসপাতালের বার্ষিক ব্যয় এক লক্ষ টাকা। ১৮। সংগীত কলেজের বার্ষিক ব্যয় বার হাজার টাকা। ১৯। দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বিদ্যালয়ে বার্ষিক দান দুই সহস্র টাকা। ২০। অনাথাশ্রমের বার্ষিক ব্যয় দশসহস্র টাকা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়! ধনকুবের শৈসার দানের পরিচয় আর কি পাইতে ইচ্ছা করেন? ভাবুন দেখি, যাহার বৃদ্ধা মাতা ছয় আনা পয়সার জন্য সমস্ত দিন ধান ভানিত, আজ সেই ব্যক্তি লঙ্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ! সেই শৈসা আজি লঙ্কেশ্বর, আজি ধনকুবের! মৃত্যুর সময়ে মাহাতা নগদ দুই কোটি টাকা জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তদ্ভিন্ন আসবাব, অলঙ্কার, সরঞ্জাম, ভূসম্পত্তি, জমিদারী কুঠি ইত্যাদির ত কথাই নাই। সকল গুলি এক করিলে আরব্যোপন্যাসের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। লঙ্কায় এমন বড় স্থান নাই, যেথানে শৈসার সম্পত্তি নাই!

মাহাতার পুত্র কন্যার বিবাহে যাহা ব্যয় হইয়াছিল, তাহার তালিকাটা দেখুন।

প্রথম পুত্র	...	...	বিবাহের ব্যয় ১৪ লক্ষ টাকা।
দ্বিতীয় পুত্র	...	...	ঐ ১৪ লক্ষ টাকা।

তৃতীয় পুত্র	...	...	ঐ	৫ লক্ষ টাকা।
প্রথম কন্যা	...	...	ঐ	বিশ লক্ষ।
দ্বিতীয়া কন্যা	...	...	ঐ	৮ লক্ষ।

অন্যান্য পুত্র ও কন্যার বিবাহের হিসাব দিলাম না। ভাবিয়া দেখুন, কি অসাধারণ ব্যাপার! ইহাকেই বলে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ এবং ইহাকেই বলে "স্বনাম পুরুষ ধন্য"! বাঙ্গালার রামদুলাল সরকার কিম্বা মাদ্রাজের জটাচালু শৈসার কাছে নগণ্য মাত্র! শৈসার স্ত্রীর গাত্রে এক কোটি টাকার অলঙ্কার! সিংহলের গবর্ণর এবং মহারাণীর পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই স্ত্রীলোকের গহনা বিলাতের একটা বড়দরের লর্ডের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।"

শৈসা যে দিন মরেন, সে দিন কলম্বো নগরে দশসহস্র লোক একত্রে সমবেত হইয়াছিল। সমাধি-ক্ষেত্রে সিংহলের গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য দোকানদার পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র লোক দণ্ডায়মান ছিল। পথের দুই ধারে সঙ্গীণ নামাইয়া ইউরোপীয় ও দেশীয় সেনাগণ ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, দর্শকেরা "আজ সিংহল আকাশের মধ্যাহ্ন রবি অকালে অস্তগত হইল" বলিয়া দর দর ধারায় অশ্রু ফেলিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রেরা তিন লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছিলেন। শৈসা আর নাই; কিন্তু সেই পুণ্যচেতা মহাপুরুষের নাম, যশ ও চরিত্র শুষ্ক গোলাপের ন্যায় এখনও সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। তাঁহার পুত্রেরা এখন যোগ্য হইয়াছেন, ধনকুবের শৈসার নাম তাঁহারা রাখিতে পারিবেন কি?

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অজ্হর।

আফ্রিকার "অজ্হর্" জগতের এক অপূর্ব্ব পদার্থ। মহাকবি বাল্মীকির কিম্বা কবিবর কৃত্তিবাসের মারুতী-দগ্ধ লঙ্কার নাম উচ্চারিত হইলে অনেক পাঠকের মনে যেমন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের মহাবিভবময়ী সুবর্ণকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর পাণ্ডিত্য, বীরত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতির কথা উদয় না হইয়া কেবল নরমাংসলোলুপ রাক্ষসের ভীষণ মূর্ত্তি, শ্মশান ও সমাধিক্ষেত্রের শিবা ও সারমেয়সমূহের ভয়োৎপাদক চীৎকার অথবা অবিচার ও অধর্ম্মের জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রতিকৃতির কথা উদয় হইয়া থাকে, অথবা বিপুল বিক্রমশালী বৃটিশবীরের অধিকৃত ও সুশাসিত "ভারত" বলিলে সুদূর স্কটলণ্ডের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্যকৃষকদিগের মানস-পটে যেমন অসভ্যতা, অজ্ঞানতা, বর্ব্বরতা, বলহীনতা প্রভৃতির চিত্র ভিন্ন আর কিছুই অঙ্কিত হয় না,—"আফ্রিকা" এই শব্দটির উচ্চারণে ভূগোলের ভারতীয় পাঠকপুঞ্জের মধ্যে অনেকেরই মনে সেইরূপ কদাকার কাফেরী, হাস্যবিহীন হাপ্শী, নিন্দিত নিগ্রো, কৃষ্ণকায় ককেশী, বর্ব্বর বগেলী, বহুযোজনব্যাপী জুলু, কদর্য্য "ফেল্লাহীণের" মূর্ত্তি এবং তৎসঙ্গে পয়ঃপাদপবিহীন সাহারার ভীষণত্ব ভিন্ন বুঝি আর কিছুই উদয় হয় না। আফ্রিকার প্রাচীন মিশর* সমগ্র খৃষ্টীয় সমাজের সভ্যতা ও আলোকের যে প্রসূতি ছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের অনুসন্ধান করি-

---

* আফ্রিকায় বহুসংখ্যক জাতির বাস ছিল, এক্ষণে সর্ব্বসমেত সাতাইশ জাতি বাস করে। আফ্রিকার প্রাচীন রাজধানীর নাম মিশর; হিব্রুভাষায় বিজ্রাইন গ্রীকভাষায় অজ্যাপৎ Egypt এবং আরব্য ভাষায় চিমাই।

বার অবসর নাই। আফ্রিকার আলেক্‌জেন্ড্রিয়া নাম্নী প্রাচীনা নগরীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায়, খৃষ্টান ধর্ম্ম, খৃষ্টান সাহিত্য, খৃষ্টান সমাজ, এবং খৃষ্টান ধর্ম্মনীতি, আফ্রিকার নিকটে চিরঋণী।

যীশুর স্বর্গবাসের অল্পকাল পরে প্রসিদ্ধ গস্‌পেল্ প্রণেতা মার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় সমাজ, "অসভ্য আফ্রিকা" হইতে ধর্ম্মনীতি,সমাজনীতি,শাস্ত্র ব্যাখ্যা এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান ও আলোক প্রাপ্ত হইয়া, সভ্যজগতে মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আলেক্‌জেন্ড্রিয়ার পৃথ্বীপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে খৃষ্টীয় ৬৪১ অব্দে সাত লক্ষ গ্রন্থের একত্র সমাবেশ ছিল; আবদুল আমরুর অধিনায়কত্বে আরবেরা যখন ইহা নষ্ট ও দগ্ধ করিয়া ইহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিতে অস্বীকৃত হয়, তখন সাতশত পুস্তকরক্ষক এই সুবিশাল গ্রন্থালয়ে লাইব্রেরিয়ানের কার্য্য করিত এবং সহস্রাধিক প্রাজ্ঞ পুরুষেরা এই বিপুল গ্রন্থরাশির পরীক্ষক বলিয়া পরিগণিত ছিল। পুরাকালের সেই আনন্দময়ী আফ্রিকা "কৃতজ্ঞ খৃষ্টীয় সমাজে" আজ কালকার দিনে "অসভ্য আফ্রিকা" বলিয়া পরিগণিতা! কালের কুটিলা গতি বুঝা ভার; নিন্দিত-নিগ্রো-নিবাস পরিপূর্ণ সুদূর আফ্রিকা এখন অসভ্য হইলেও এক বিষয়ে ইহা সভ্যসমাজকে পরাজয় করিতে সমর্থা হইয়াছে। আফ্রিকার "অজ্‌হর" জগতে অতুলনীয়—জগতে অদ্বিতীয়। আমরা আফ্রিকা রাজ্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্বচক্ষে এই অপূর্ব্ব "অজ্‌হর্" দর্শন করিয়া এবং পশ্চাৎ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে সমর্থ হইয়াছি, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমরা আলেক্‌জেন্ড্রিয়া হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রায় ১৩০ ক্রোশ পথ রেলওয়ে শকটের সহায়তায় অতিক্রম করিয়া ইজিপ্তের রাজধানী কায়রো নগরে উপস্থিত হইলাম। অসংখ্য অট্টালিকা, অগণ্য পিরা-

মিড্, অনন্যসাধারণ শোভার আকর এই কায়রো নগরের মনোহর মূর্ত্তির সহজে বর্ণনা হয় না। সহরের চারিদিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর এবং নগরের মধ্যে পঞ্চশতাধিক মনোহর মস্‌জিদ্। এই প্রাচীন প্রাচীরের পশ্চিম দিকে প্রসিদ্ধ নীলনদের নীলোর্ম্মিমালা আসিয়া সুবিখ্যাত বুলাক্ বন্দরের পান্থশালাপুঞ্জকে বিধৌত করতঃ মুকাত্যম পর্ব্বতের পাদদেশে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে। সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব! আমাদের দ্বিভাষীর (interpreter) * মুখে আমরা "অজহরের" কথা সর্ব্বপ্রথমে শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলাম। দ্বিভাষী বলিল "It is the largest University—the largest Temple of Knowledge in the world."—পৃথিবীর মধ্যে অজ্‌হর যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বিদ্যামন্দির, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রথমে সাহসী হই নাই, কিন্তু অনুসন্ধানে ও তুলনায় জানিতে পারিলাম "আফ্রিকার অদ্ভুত অজ্‌হর জগতের কেবল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির তাহা নহে, ইহার সমকক্ষ বা সমতুল্য হইতে পারে, এমন বিদ্যামন্দির জগতে আর নাই। অপূর্ব্ব অজহর জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়।" † যে মহাবিশাল ভূমিখণ্ডে এই প্রকাণ্ড বিদ্যামন্দির অবস্থিত তাহার দীর্ঘতা ছয় 'মানহা' (মাইল) অর্থাৎ পাকা তিন ক্রোশ, বিস্তারে দুই মাইলের কম নহে। যে অভ্রভেদী অত্যুচ্চ বিদ্যামন্দিরকে অজ্‌হর বলা হয়, তাহা দর্শন করিয়া আমরা অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্র পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। ফ্রান্সের অনৈক পণ্ডিত

---

* ইজিপ্তে মুসলমান দ্বিভাষীগণ ইন্‌টারপ্রিটার বলিয়া কথিত হয় না, ইহারা "ছিছিরণ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ইংরাজি Cicerone শব্দের ইহা বোধ হয় অপভ্রংশ। আফ্রিকার সকল স্থানেই দ্বিভাষীগণের বিদ্যা প্রায়ই একরূপ।

† Lane's Modern "Egyptians"

মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কায়্রো দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন।—"যিনি কায়রো দেখেন নাই, তিনি পৃথিবীর কিছুই দেখেন নাই; এখানকার মাটি সোণা; নাইল নদ একটি মহা রহস্য, এখানকার কৃষ্ণনয়না মহিলারা নন্দনকুমারীগণের ন্যায়; এখানকার গৃহসমূহ প্রাসাদতুল্য; এখানকার বায়ু অতি কোমল—সুগন্ধে চন্দনকানন পরাজয়কারী, এবং অন্তঃকরণে আনন্দোৎসাহ সম্পাদক; অজহর সকল আশ্চর্য্যের চরম আশ্চর্য্য—পৃথিবীর মহত্তম আশ্চর্য্য বস্তু; কায়রো ইহার বিপরীত হইবেন কেমন করিয়া যখন তিনি ধরিত্রীর মাতৃস্বরূপা পৃথিবীর সর্ব্বসভ্যতা ও জ্ঞানের প্রসূতি?" অজহর দেখিতে মসজিদের ন্যায়; যে ভূমিখণ্ডের উপরে ইহা প্রতিষ্ঠিত তাহার সম্মুখাংশ "সঙ্গে মুসা" (মুসার প্রস্তর) নামক প্রসিদ্ধ প্রস্তর দিয়া স্তরে স্তরে গাথা; ক্রমে ক্রমে একাদশখানি স্থূলকায় প্রস্তর মশলা দিয়া সংস্থাপন করতঃ তাহার উপরে নীলনদের অর্দ্ধ শ্বেত অর্দ্ধ লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা দিয়া আবৃত করা হইয়াছে; মন্দিরের উচ্চতা যত, ঠিক তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ কলেবর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত আছে। মন্দিরটি কেমন সুদৃঢ়, ইহা তাহার প্রধান পরিচায়ক। প্রায় সার্দ্ধ চারি হাত উচ্চ ধাপের উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখের ভাগে সাকল্যে ৬৪টি দরজা আছে, পশ্চাদ্দিকেও ততগুলি দরজা। বারাণ্ডা, খিলান, দরগা মজহর প্রভৃতির সংখ্যা না করাই ভাল। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে মনোহর উদ্যান, মনোহর সরোবর, সুগভীর কূপএবং সুন্দর সুন্দর অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষ। পৃথিবীতে এত বড় বিদ্যামন্দির আর নাই। ছাত্রসংখ্যা যখন কম থাকে তখন মোটে দশ সহস্রের কম মুসলমান বিদ্যার্থী দেখা যায় না। একটা অট্টালিকায় এবং একটা কলেজে দশ সহস্র ছাত্রের সংখ্যা শুনিয়া অজহরকে কি অদ্বিতীয় বিদ্যা-

মন্দির বলিতে পারা যায় না? রোগে,শোকে,বিপ্লবে,দুর্ঘটনায় ছাত্রসংখ্যা কম না হইলে ১৭ সহস্র ছাত্রের ইহাতে সমাবেশ হইতে দেখা যায়; খৃষ্টীয় ১৮৪১ অব্দে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ষোল সহস্র তিন শত উনপঞ্চাশ। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন অন্য ধর্ম্মবিদ্যার্থীগণ অজ্‌হরে বিদ্যাভ্যাস করিবার অধিকারী নহে; বালিকা বা স্ত্রীলোকেরা এই মন্দিরের বিদ্যার্থিনী বা পরিচারিকা হইবার অনধিকারিনী; স্ত্রীলোকেরা ইহাতে প্রবেশ করিতেও অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না; সমগ্র মন্দির মধ্যে বিংশ সহস্র বিদ্যার্থীর সমাবেশ হইবার স্থান আছে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রের বসিবার আসন ইংরাজি স্কুল কলেজের শ্রেণী বিভাগ মত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত; চেয়ার টেবিলের ব্যবহার নাই; ছাত্রেরা মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রস্তর খণ্ডের উপরে উপবেশন করে এবং শিক্ষক মহাশয়েরা লোহিতবর্ণের কিন্‌খাপাবৃত হিন্‌শী পাথরের উচ্চাসনে ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় উপবিষ্ট থাকেন। উদ্যানের মধ্যে বোর্ডিংহাউস,প্রার্থনালয়, বক্তৃতাগার, ভাণ্ডার, অস্ত্রাগার, যন্ত্রাগার, ঔষধালয় প্রভৃতি বহুবিধ প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যার্থীদিগের ক্রীড়াভূমি গুলির পার্শ্বদেশে শিক্ষক দিগের বাসবাটী; শিক্ষকদিগের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারা অজ্‌হরের কম্পাউণ্ড মধ্যে বাসা করিয়া থাকিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না। লাইব্রেরিতে সার্দ্ধ তিন লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে ইহার অধিকাংশ গ্রন্থ আরব, পারস্য এবং চেমি ভাষার লিখিত বা মুদ্রিত। ফরাসী, পর্টুগীজ্, লাটিন, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় মুসলমান ধর্ম্ম বা মুসলমান শাস্ত্রের পোষকতা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কয়েক সহস্র এখানে সংরক্ষিত আছে। কোরাণের নানা প্রকার অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে এবং সমুদয় লাইব্রেরীতে নানা আকারের প্রায় সাত সহস্র কোরাণ একত্রিত আছে। পশ্চিম দিকের

এক কোণে একখানি অপূর্ব্ব কোরাণ রক্ষিত আছে, তাহার মূল্য ঊনবিংশ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা; ইহাতে ৫ খানি হীরক এবং বহুল মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড মধ্যে ৮ খানি অত্যুজ্জ্বল রত্ন সংযোজিত আছে। অজ্‌হরের মস্‌জিদের অন্তর্দ্দেশে, বহির্দ্দেশে এবং চারি পার্শ্বে পঞ্চবিংশ সহস্র মুসলমান একত্রে এবং এক সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া নেমাজ করিতে পারে; মস্‌জীদে মৌলবীর সংখ্যা ১৩২, মোল্লার সংখ্যা ৮৩, ইমামের সংখ্যা ২০৫ এবং আজানীর সংখ্যা ৬২ জন। বোর্ডিং হৌসে পাচকের সংখ্যা ৩৪১, ভৃত্যের সংখ্যা ৭৬, বালক পরিচারকের সংখ্যা ৯২ এবং গোমস্তার সংখ্যা ৪৫ জন। গড়ে প্রতিদিন দুই বেলায় ২৮ মণ মাংস পাক হইয়া থাকে। শিক্ষকের সংখ্যা ১৮৬ জন; কলেজের কুলির সংখ্যা প্রায় শিক্ষকের সংখ্যার সমতুল্য। এতদ্ব্যতীত প্রায় অর্দ্ধশত কুলি এবং শতাধিক শিক্ষক "অতিরিক্ত" ভাবে বেতন পাইয়া থাকে। ছাত্রদের কাহাকেও বেতন দিতে হয় না; শিক্ষকদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকেই বেতন পাইয়া থাকেন, অধিকাংশেরই "অজ্‌হর্‌-সম্পত্তি" আছে; শিক্ষকতার জন্য তাঁহারা এই সম্পত্তি ভোগ করিতে পারেন, ইহাকে এক প্রকার দেবোত্তর সম্পত্তি বলিলে বলা যায়। অজ্‌হরের পড়িবার অযোগ্য অথবা অন্য বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত দীনহীন, তাহারা আহারের নিয়মিত সময়ে অজ্‌হর্‌ মন্দিরে উপস্থিত হইলে কেবল দিবসে খয়রাতী আহার পাইতে পারে; অজ্‌হরের বিদ্যার্থী না হইলে দুই বেলা বিনামূল্যে খাইতে পায় না। অজ্‌হর বিদ্যামন্দিরের অনেক দরিদ্র ছাত্র রীতিমত বৃত্তি পাইয়া থাকে। পুস্তকের মূল্য সকল ছাত্রকেই নিজের ঘর হইতে আনিতে হয়। অজ্‌হরে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, ধর্ম্মতত্ত্ব, ব্যবস্থা, কোরাণ, তর্কশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, ভূগোল এবং মুসলমান জাতির ইতিহাস শিক্ষা

দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাই প্রধান বা মুখ্য বিভাগ। অন্যান্য অসংখ্য বিভাগে চিকিৎসা, স্থাপত্যবিদ্যা, ভাস্কর্য্য বিদ্যা, লিপি-চাতুর্য্য, কোরাণ পাঠের দক্ষতা, বক্তৃতা করিবার কৌশল প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে নানা বিভাগের পরে রাজনৈতিক বিভাগ, এখানে রাজনীতির লেক্‌চর হয়, এই সকল রাজনৈতিক বক্তৃতা সম্বন্ধে রুসিয়ার ঐতিহাসিক ভ্রমণকারী ক্লিন্‌জীংগফ বলিয়াছেন,—

এই বক্তৃতাগুলি হইতে ছাত্রেরা প্রকৃত রাজনীতির অতি অল্পই শিখিয়া থাকে, তাহারা অর্জ্জন করে কেবল ধর্ম্মাসংক্রান্ত দম্ভ এবং শিক্ষা করে খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য অবিশ্বাসীদিগকে ঘৃণা করিতে।*

এই বিশাল বক্তৃতা প্রসাদের এক দিকে মিলিটারী ক্লাস এবং অপর দিকের অস্ত্রাগার, এই অস্ত্রাগারে ধনুর্ব্বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে অস্ত্রাগারের পার্শ্বে স্বর্ণ নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড, তাহার উপরে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আরব্য অক্ষরে লেখা আছে "আল্‌ অজ্‌হর্‌।" মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ সাহিত্যাচার্য্য জে, মর্ডক সাহেব তৎপ্রণীত "Egypt: The Land of the Pyramids" নামক ক্ষুদ্র ইংরাজি পুস্তকে অজ্‌হর সম্বন্ধে মোটে দশটি পংক্তি লিখিয়াছেন, তিনি বলেন,—"Al Azhar (which means 'the splendid') is the largest Mahomedan College in the world" এই পুস্তকে Mahomedan College শব্দের অর্থ যদি এরূপ হয় যে, পৃথিবীতে মুসলমানদিগের যতগুলি বিদ্যামন্দির আছে, তাহার সঙ্গে তুলনায় অজ্‌হর্‌ সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহা হইলে মর্ডক্‌ সাহেব ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া আমরা দুঃখিত। মুসলমানদিগের

* Klinzingoff's *Upper Egypt* quoted by S. Lane Poole

এই "অজ্‌হর্‌" পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতির সমস্ত বিদ্যামন্দির হইতে বড়। আমরা এবার এই অপূর্ব্ব বিদ্যামন্দিরের নির্ম্মণ ব্যয় এবং ইহার পরিচালনার ব্যয় সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অজ্‌হর্‌ মন্দির একবিংশ বর্ষকাল ব্যাপিয়া নির্ম্মিত হয়, ইহার নির্ম্মাণ জন্য ৬৩ লক্ষ মানবকে নানা প্রকারে পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, নানা প্রকারের বুদ্ধিমান ও কৌশলসম্পন্ন মনুষ্যদিগকে অজ্‌হরের মন্দির নির্ম্মাণে মস্তিষ্ক, হস্ত ও পদকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। অসংখ্য মিস্ত্রী অসংখ্য কুলি, অসংখ্য কারিকর এবং অসংখ্য চিত্রকরগণ অজ্‌হর মন্দির নির্ম্মাণে সহায়তা করেন। নানা দেশের ধনবান লোকের নিকট হইতে অর্থ সংগৃহীত হয় এবং অনেক সময়ে অনেককে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতে হয়। যে সকল মিস্ত্রি আসিয়া নির্ম্মাণ কৌশলের সহায়তা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, আব্বাস্‌ হামিদ তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক; দুঃখের বিষয় এই অতুলনীয় বিদ্যা মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুপ্রসিদ্ধ আব্বাস্‌ হামিদ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্ধাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তাঁহার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ অজ্‌হরে একটি "অন্ধবিভাগ" আছে, তাহাতে প্রায় সাত শত অন্ধ বালক-বিদ্যার্থীর বিদ্যা শিক্ষা হইয়া থাকে। লেন্‌পুল্‌ সাহেব অনুমান করেন, "এখনকার কালে অজ্‌হর নির্ম্মাণ করিতে ত্রয়োদশ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা"। ইহার পরিচালনার নিমিত্ত, নানা দেশ ও নানা সম্পত্তি হইতে অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। আরবা, তুরস্ক, তাতার, আর্ম্মেনিয়া, সমরখন্দ, বোগ্‌দাদ্‌, গজনি, আফ্‌গানিস্থান, আবিসিনিয়া, জাঞ্জিবার, মিশর, পারস্য প্রভৃতি নানা রাজ্য হইতে সাহায্য আইসে, তদ্ভিন্ন বিপুল মৌরশী সম্পত্তির আয় হইতে

অজ্‌হরের ব্যয় ভার বাহিত হইয়া থাকে। ছাত্রেরা একত্রিত হইলে "লা—ইল্লা—মহম্মদ রসুলুল্লা!" এবং "বিস্‌মিল্ল" রবে যে ঔপক্রমণিক চীৎকার ধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তাহা হঠাৎ শ্রবণ করিলে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা; কলেজ বন্ধ হইবার সময়ে "আল্‌ হামদোলিল্লা" রবে দিক্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত হয় এবং নীলনদের তরঙ্গ-বক্ষে সে মহাভীষণ ধ্বনিতে ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া থাকে। ছোট ছোট বালকেরা পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোড়ার উপরে কোরাণ রাখিয়া যখন 'ইয়াকা ন বুদো য়ো ইয়াকা নস্তাইন্‌" প্রভৃতি আয়েৎ (শ্লোক) পড়িতে পড়িতে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় নানা বর্ণের পরিচ্ছদ শোভিত দেহগুলিকে সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে এবং দক্ষিণে হেলাইতে দুলাইতে থাকে, তখন বোধ হয়, যেন নীলনদের নীলোর্ম্মিমালা নদসলিলকে পরিত্যাগ করতঃ অজ্‌হর সমুদ্রে আসিয়া পতিত হইয়াছে। সে দৃশ্য অসাধারণ!

"অজ্‌হর" যে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যামন্দির, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা কয়েকটি প্রসিদ্ধ কলেজের সহিত ইহার সংক্ষিপ্ত তুলনা ও সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমেরিকার চিকাগো, ইউরোপের অক্‌স্‌ফোর্ড ও লাইপ্‌জিগ্‌ এবং ভারতের কুইন্‌স্‌ কলেজ ও আঙ্গলো ওরিয়েণ্টেল কলেজ পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দির। চিকাগোর ছাত্র সংখ্যা একাদশ শতের অধিক নহে; চিকাগো কলেজে গড়ে নয় শত বিদ্যার্থী হইতে অধিকসংখ্যক ছাত্র উপস্থিত থাকে না। অক্‌স্‌ফোর্ড কলেজের ছাত্র সংখ্যা গড়ে ত্রয়োদশ শত; লাইপ্‌জিগ্‌ কলেজে তদপেক্ষা ন্যূন—মোটে সপ্তশত বিদ্যার্থী। বেনারসের (কাশীর) কুইন্‌স্‌ কলেজ পৃথিবীর শিক্ষার ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়; ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের

আদেশে মেজর কিটো সাহেব কর্ত্তৃক চুনার প্রস্তরে এই মনোমোহন বিদ্যামন্দির ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১ লক্ষ ৮২ সহস্র টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার উচ্চতা ৭৫ ফিট; কলেজ ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা ছয় শত, স্কুল ক্লাসে ৭৬৪; কাশীধামে ইহাপেক্ষা সুন্দরতম অট্টালিকা আর নাই। স্বনামখ্যাত নবাব সৈয়দ আমেদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আলিগড়ের ওরিয়েন্টাল মহমেডান্ কলেজ এক অপূর্ব্ব বিদ্যামন্দির; আসিয়াখণ্ডে এতদপেক্ষা বৃহত্তর বিদ্যামন্দির আর নাই; ইহা সমগ্র ভারতভূমির অন্যতম গৌরব ও অলঙ্কার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহার সুবিশাল কম্পাউণ্ড্, মনোহর অট্টালিকা প্রভৃতি দর্শন করিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। এই কলেজের ছাত্র সংখ্যা গড়ে বার শত। অজ্‌হরের ছাত্র সংখ্যা গড়ে সপ্তদশ সহস্র! অজ্‌হরের প্রকাণ্ডত্ব, বিশালত্ব, উচ্চতা, গাম্ভীর্য্য, নির্ম্মাণকৌশল, বন্দোবস্তের বাহাদুরী, বিপুল ব্যয় প্রভৃতির সহিত তুলনায় চিকোগো, লাইপ্‌জিগ্, অক্‌স্‌ফোর্ড, আলিগড় কিম্বা কুইন্‌স্ কলেজকে নগণ্য বলিয়াই বোধ হয়। অজ্‌হর নির্ম্মাণ করিতে যে অর্থ, যে বুদ্ধি ও যে পরিশ্রমের ব্যয় হইয়াছে, তাহার তুলনায় এ সকল কলেজের ব্যয়কে কুবেরের ভাণ্ডারের পার্শ্বে কঙ্কালাবশিষ্ট অনাথের ভাণ্ডার বলিয়া বোধ হয়। অজ্‌হরে যে সকল ছাত্র কেবল সেলাইয়ের কাজ শিখে, তাহাদের সংখ্যা চারি সহস্র তিন শত তেত্রিশ!! অজ্‌হরের অধীনে চারি শত পাঠশালা আছে, সে গুলি কায়রো নগরের স্থানে স্থানে অবস্থিত। এই সকল পাঠশালা এবং অন্যান্য মাদ্রাসা ও মক্তব্ এবং তৎসঙ্গে অজ্‌হরের বিদ্যামন্দিরস্থ ছাত্রসংখ্যা এক করিলে, সমুদয়ে ১ লক্ষের অধিক বিদ্যার্থীর সংখ্যা হইয়া উঠে। পাঠকমহাশয়! অজ্‌হরময়ী আফ্রিকাকে এখন অসভ্য বলিয়া অভিহিত করিতে অভিরুচি হয় কি?

কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের সন্নিহিত মহারাজা দ্বারবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত টোলে প্রায় আটশত বিদ্যার্থী থাকে। ইহারা বিনামূল্যে পুস্তক, পরিচ্ছদ এবং আহার ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এত বড় টোল আর নাই। * এই টোলে ছাত্রদিগকে বৃত্তিভোগী হইতেও দেখা যায়। কিন্তু অজ্‌হরের তুলনায় ইহা সূর্য্যের নিকটে খদ্যোৎ! কার সাহেব লিখিয়াছেন, সমুদয় কাশীতে সংস্কৃত বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৫ সহস্র, এথেন্সে প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বাধ্যায়ীর সংখ্য ১৬ শত এবং জর্ম্মণীতে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্রের সংখ্যা তিন সহস্র। † কুইন্‌স্‌কলেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয় লিখিয়াছেন, ঐ কলেজের ছাত্র সংখ্যা এইরূপ—‡

ইংলিশ কলেজ	২১০
সংস্কৃত কলেজ	৩৫৩
এংলো সংস্কৃত কলেজ	৪৮
কলেজিয়েট স্কুল	২৮৬
টাউন স্কুল	২৯১
মোট	১১৮৮

ইহার মধ্যে তেরটি ছাত্র বিনা খরচায় থাইতে পায় এবং ৫১ জন ছাত্র বৃত্তি পায়। অজ্‌হরে সর্ব্বসমেত নিত্য গড়ে বিংশসহস্র বিদ্যার্থীর অন্ন সংস্থান হইয়া থাকে!

অজ্‌হর পৃথিবীর প্রধানতম বিদ্যামন্দির বলিয়া পরিগণিত

* "Sanskrit Schools in Benares" By the Rev. J. Hewette, M. A.

† Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, pp. 125.

‡ From the Principal W. H. Wrights' Report.

হইলেও ইহার শিক্ষা বা সভ্যতা, অক্‌স্‌ফোর্ড, চিকাগো, লাইপ্‌জিগ্‌ অথবা ভারতবর্ষীয় কলেজের শিক্ষা ও সভ্যতা হইতে অত্যন্ত অপকৃষ্ট। অজ্‌হর হইতে দ্বাদশবর্ষকাল বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া অথবা কাশীর সংস্কৃত টোল হইতে পাণিনি, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া যে সকল বিদ্যার্থী পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়, তাহাদের তুলনায় ইয়ুরোপ আমেরিকা কিম্বা ভারতের ইংরাজি কলেজের পাশ করা বিদ্যার্থী সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। লর্ডমেকলে তাঁহার সুবিখ্যাত "Minute on Education in India" মধ্যে লিখিয়াছেন—"আরব্য ও সংস্কৃত কলেজের জন্য আমরা যাহা ব্যয় করিয়া থাকি, তাহা যে শুধু সত্যের বিস্তার হিসাবে নিতান্তই জলে দেওয়া মাত্র তাহা নহে, তাহা ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষক মহারথীবৃন্দের সৃষ্টির জন্য মূল্যবান দেবোত্তর দান। ইহাদ্বারা একটি কুলায় সৃষ্টি হয় কেবল আত্মনির্ভরক্ষমতাশূন্য পদান্বেষীদিগের জন্য নহে—কিন্তু এক মোহান্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্যও—যাহাদিগের স্বার্থ ও তামসিক প্রবৃত্তি যুগপৎ তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার হিতকর ও উপযোগী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে"। বাবু ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার হিন্দুর ভ্রমণবৃত্তান্ত (Travels of a Hindu) নামক সুপরিচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন—"আশা করা যায় যে, হিতার্থিগণ বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া এমন কোন প্রকার শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করিবেন, যাহা দ্বারা সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এবং মুসলমান মোল্লারা অন্ততঃ সেই টুকু শিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হন, যেটুকু কোন নিয়মিত স্কুলসংশ্লিষ্ট একজন দশ বৎসরের বালকের নিকটও অতি সহজ ও সুপরিচিত। সংস্কৃত উপন্যাস মাত্র, পার্শি গল্প মাত্র, কিন্তু ইংরাজী প্রকৃত খাদ্য।" লর্ড বেকনের প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে লর্ড মেকলে সাহেব তাঁহার Stoical Philosophy of the Ancients নামক প্রসিদ্ধ প্রস্তাবে যাহা

লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এক প্রকার জাঁতা কল আছে যাহাতে ঢেঁকির মত পা দিয়া এক পায়ের পর অপর পা চালনা করিতে হয়, ইহাতে চাকা ঘোরে এবং জাঁতার কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পাদচালক এক বিন্দুও উন্নীত বা অগ্রসর হইতে পারেন না। তাহারই সহিত তুলনা করিয়া মেকলে বলিয়াছেন—"প্রাচীন দর্শন এক প্রকার পদচালিত জাঁতা কল মাত্র কিন্তু তাহা পথ নহে। ইহা ঘুর্ণমান ও আবর্ত্তিত প্রশ্নাবলীর প্রতি-নিয়ত পুনরুত্থিত পুরাতন বিরোধ ও সমস্যার সমষ্টি মাত্র। ইহা প্রচুর পরিশ্রম প্রাপ্তি অথচ বিন্দু মাত্র অগ্রসরণ লাভ না করিবার জন্য কৌশলোদ্ভাবিত একটা মহাযন্ত্র। যাঁহারা ইহাতে আত্মসমর্পণ করিতেন, তাঁহাদের মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণতা ও প্রাবল্য লাভ করিতে পারিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ বিতণ্ডায় জ্ঞানভাণ্ডারের কিছু মাত্র বৃদ্ধি লাভ ঘটিত না। ইহা দ্বারা সত্য সংগৃহীত ও সমষ্টিকৃত হইত না, একটি মানব বংশের শ্রমার্জ্জিত জ্ঞানরাশি পরবর্ত্তী বংশের জন্য পৈত্রিক ধনরূপে সঞ্চিত থাকিত না এবং পুনঃ পরবর্ত্তী বংশের হস্তে বহু বৃদ্ধির সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে সমর্পিত হইত না। সেই চিরন্তন তার্কিকমণ্ডলী অবিচ্ছেদে যুদ্ধ করিয়া যাইত, সেই চির অসন্তোষজনক চির সংশয়পূর্ণ তর্কাস্ত্রগুলি লইয়া সেই চির অসম্পূর্ণ সমস্যারাশি সম্বন্ধে চির যুদ্ধ হইত। লাঙ্গল দেওয়া, মই দেওয়া, ধান কাটা, ধান আছড়ান প্রচুর পরিমাণে চলিয়াছিল কিন্তু মরাই পূরিত হইত কেবল খড়ের গোড়া এবং ঘর্ম্মে। ষষ্ঠি পুরুষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিখ্যাত মণীষীগণের সমস্ত পরিশ্রমের সমস্ত ফল হইয়াছিল কেবল কথা আর কথা ভিন্ন কিছুই নহে। পুরাতন দার্শনিকগণ অসম্ভবের আশা দিতেন, সম্ভবকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা জগৎকে দীর্ঘ বাক্যাবলী ও দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজিতে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন

এবং তাঁহারা আসিয়া পৃথিবীকে যেরূপ পাষণ্ড এবং অজ্ঞ দেখিয়াছিলেন সেইরূপই রাখিয়া গেলেন।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সম্পূর্ণ আদর্শ।

শরীরের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার যেরূপ ঘনিষ্ঠ এবং অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাহাতে সম্যক প্রকারে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত না হইলে, মনুষ্যের 'প্রকৃত মনুষ্যত্ব' থাকা অসম্ভব। শরীর, মন এবং আত্মার রক্ষণ পোষণ ও প্রসারণ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব; এই মনুষ্যত্বের অভাব হইলে মনুষ্য 'প্রকৃত মনুষ্য' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। শাখা, পত্র, ফল, ফুল প্রভৃতি লইয়া যেমন মহীরুহ, শরীর মন এবং আত্মা লইয়া তেমনি "মানব;" এই তিনটির পারস্পরিক সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, ইহাদের সমুদয়ের সম্যক উৎকর্ষ ব্যতীত মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব হইতে ও অসম্ভবতর। এই জন্যই শরীর, মন ও আত্মার সম্যক উৎকর্ষ সাধনের নাম "ধর্ম্ম"। হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দের এই অতি সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়; পৃথিবীর আর কোনও প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দের এতদপেক্ষা সুন্দরতর অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "আরোগ্যং মূল মুত্তমং" এবং "তনুধর্ম্ম সাধনং" প্রভৃতি শ্লোকে শরীর রক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করা সাধনের একটি অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে; 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং মন গুহায়াং' প্রভৃতি শ্লোকে মনরূপ গুহায় ধর্ম্মতত্ত্বের অবস্থিতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে এবং গীতা প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রে আত্মিক উন্নতির

অসংখ্যাসংখ্য অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীর মন এবং আত্মার উৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য চেষ্টার নাম "সাধন", ইহাই ইংরাজিতে Culture (কল্‌চর) শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ম্ম কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড এবং উপাসনা (ভক্তি) কাণ্ডে বিভক্ত; এই কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির পূর্ণ বিকাশের নাম সাধন; এই সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিতে হইলে শরীর মন এবং আত্মার পূর্ণ উৎকর্ষ হওয়া আবশ্যক। মানবদেহে ইন্দ্রিয় সমূহের সংখ্যা প্রধানতঃ দশটি, ইহাদের পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অপর পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। মানব-কলেবর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধীন; মানব-মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধীন এবং মানবের আধ্যাত্মিক জগত সূক্ষ্ম শরীরের অন্তর্গত আত্মার বশীভূত, সুতরাং শরীর মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনই ধর্ম্ম। শরীরের উন্নতি (Physical culture), মনের উন্নতি (Mental culture), এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিই (Spiritual culture) মানবের পূর্ণ সাধন এবং তাহাই পূর্ণ ধর্ম্ম। এই পূর্ণ ধর্ম্ম হইতেই পরিণামে মোক্ষ বা অব্যয় ব্রহ্মপদ লাভ লইয়া থাকে। যাহাদের কেবল শরীরের উন্নতি হইয়াছে, মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই, তাহাদের সাধন ভজনও অসম্পূর্ণ; এইরূপে যাহাদের কেবল মানসিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, কিন্তু আত্মিক উন্নতি হয় নাই, তাহারাও এখনও সম্পূর্ণ সাধক হইতে পারেন নাই; যাঁহাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে বটে' কিন্তু অপর দুইটির উন্নতি সাধন হয় নাই, তাঁহারাও সম্পূর্ণ সাধক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না; কিন্তু এখানে একথাও বলা আবশ্যক যে, এবম্প্রকার আত্মিক উন্নতিলাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; কারণ এই যে, ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, একের অবনতি বা অবহেলায় অপরগুলির উন্নতি হওয়া পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অসম্ভব। শারীরিক উন্নতি+মানসিক

উন্নতি + আধ্যাত্মিক উন্নতি = "পূর্ণ মানব" (Perfect-Man)। যাঁহারা কেবল প্রভূত পরিমাণে শারীরিক উন্নতি সাধন করিয়া অপরিমিত বলশালী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা মহাবীর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন কিন্তু মহামানব বা পূর্ণ মানব (Perfect-Man) উপাধিতে তাঁহারা সম্মানিত হইতে পারেন না; কেবল জ্ঞান, বিজ্ঞানের আলোচনায় যাঁহারা সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাও সম্পূর্ণ মানব নহেন; এবং বহির্জগত ভুলিয়া অন্তর্জগতে প্রবেশপূর্ব্বক যাঁহার মহা প্রেমিক পুরুষ কিম্বা ভক্তাধিকভক্ত পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও সম্পূর্ণ মানব বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত নহেন। ধর্ম্ম, মুখের দ্রব্য নহে, ইহা সাধনের (Practice) দ্রব্য; ইহা কেবল গ্রৈন্থিক জ্ঞানের (Theoretical knowledge) সহায়তায় সুলভ নহে, ইহা ক্রিয়াজ জ্ঞানের (Practical knowledge) অন্তর্ভুক্ত। হিন্দুশাস্ত্র মতে যেমন বেদ তিন, তেমনি সাধনও তিন—কর্ম্মের সাধন, জ্ঞানের সাধন, এবং ভক্তির সাধন; কর্ম্মসাধনের সহায়ক শরীর, জ্ঞান সাধনের সহায়ক মন এবং ভক্তি বা প্রেম সাধনের সহায়ক আত্মা। এই জন্যই শরীর, মন ও আত্মা লইয়া ধর্ম্ম; এই জন্যই সম্যক শারীরিক সম্যক মানসিক এবং সম্যক আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে যাঁহারা সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই 'সম্পূর্ণ মানব' (Perfect Man) বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই "সম্পূর্ণ মনুষ্য" আমাদের আদর্শ, এই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মানব-সমাজ উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। মনুষ্যেরএই সম্পূর্ণতায় আদর্শের সম্পূর্ণতা হয়, এই জন্যই এই "সম্পূর্ণ মনুষ্য" সম্পূর্ণ আদর্শ। এই Perfect Ideal (সম্পূর্ণ আদর্শ) God-Man অথবা Man-

God বলিয়া পূজিত হয়েন, অর্থাৎ নরসমাজে ইনি নরাকারে ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বররূপী নর বলিয়া পূজ্য হয়েন। সুতরাং কেবলমাত্র কঠোর শারীরিক তপস্যা ধর্ম্ম নহে, গীতার মতে এই তপস্যা "আসুরিক"। প্রাচীন ভারতের আর্য্যজাতি ধর্ম্মমলয়ের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া মানব সমাজের অধিনায়কত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই জন্যই প্রাচীন ভারতে—প্রাচীন আর্য্য হিন্দুজাতিতে—"সম্পূর্ণ মানব" অর্থাৎ "সম্পূর্ণ আদর্শের" অভাব ছিল না। রাজর্ষি জনক, মহর্ষি উপানন্দ, রঘুবংশাবতংস মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র, পাণ্ডব কুলধুরন্ধর অর্জ্জুন প্রভৃতি ইহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; জগতের ইতিহাসে এরূপ সম্পূর্ণ আদর্শের মানব আর নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে অপরিমিত অধিকার লাভ করিয়া ইউরোপ বা আমেরিকার অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ পুরুষেরা প্রকৃতিকে করায়ত্ব করতঃ সলিলে শিলা ভাসাইতে পারেন, শূন্যে সরোবরের সৃষ্টি করিতে পারেন কিম্বা সূচীকার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্ষুদ্র ছিদ্র মধ্য দিয়া মত্ত মাতঙ্গকে অবাধে চালাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত "সম্পূর্ণ আদর্শের মানবের" সৃষ্টি করিতে পারেন না; কারণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চিরকালই সাংসারিক (Materialistic), আধ্যাত্মিক (Spiritual) নহে; এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকায় অর্দ্ধ মানবের সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও "সম্পূর্ণ মানবের" সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং তদ্দেশে "সম্পূর্ণ আদর্শ" পাওয়া সুকঠিন।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শরীর ও মনের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, একথা স্বীকার করি; কিন্তু প্রকৃত আত্মিক উন্নতি সাধনে তদ্দেশীয় অধিবাসিগণ এখনও পরাঙ্মুখ। নৈতিক উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু নৈতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। Religion (ধর্ম্ম) Morality (নীতি) নহে এবং নীতি ও ধর্ম্ম নহে;

ধর্ম্মের উন্নতি "সূক্ষ্ম শরীরে" অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতে; পাশ্চাত্য প্রদেশের প্রাজ্ঞেরা তাহা বুঝিতে পারেন না। নীতি মনের জিনিষ; ধর্ম্ম আত্মার জিনিষ; মন হইতে আত্মা ভিন্ন বলিয়া ধর্ম্ম হইতে নীতি ভিন্ন। ভক্তি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; ইউরোপীয়েরা ভক্তিকে মস্তিষ্কের জিনিষ বলেন, আমরা ভক্তিকে হৃদয়ের (আত্মার) জিনিষ বলি; আমাদের ও তাঁহাদের মধ্যে চিরকালই এই লইয়া বিবাদ, এই লইয়া প্রভেদত্ব চলিতেছে। ইংরেজ বলেন, "Faith is an action of the brain brought upon by thoughts; when our thoughts undergo a change our faith necessarily becomes changed" আমরা বলি "Faith is an action of our heart brought upon by deep convictions through her inspired communion with the soul."

দেখিলে কত গুরুতর প্রভেদ! এই প্রভেদের জন্যই সে দেশে "সম্পূর্ণ আদর্শ" নাই। যদি বৈজ্ঞানিক চক্ষু উন্মিলন করিয়া কুসংস্কার ও কুজ্ঞানজ তর্ককে পরিত্যাগ করিয়া, আধ্যাত্মিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবে, এইরূপ সম্পূর্ণ আদর্শ কেবল ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং এখনও কেবল ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করিতে পারে, অন্য দেশে নহে। এই মহা রহস্যময়ী কথার সম্যক ব্যাখ্যা করিতে হইলে বহুল গুরুতর বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু আমাদের তত অবকাশ নাই; এই প্রবন্ধেও তত স্থান নাই। সুতরাং কথাটি সংক্ষেপে বুঝাইব। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত, পদ প্রভৃতি দশেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের) সম্যক উন্নতি সাধনই "সম্পূর্ণ আদর্শের" মূল; ইহার সম্যক উন্নতি সাধন জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ভারত-ভূমিতেই তাহা বিদ্যমান; সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশে তাহা নাই।

এই জন্যই বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,—"সেই ব্যক্তিই ধন্য, পবিত্রা ভারতভূমি যাঁহার জন্মদেশ।" নানাকারণে হিন্দুজাতিতে এবং বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বংশে এই উৎকর্ষের আশু সম্ভাবনা, এই জন্য বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন,—"ধন্য সেই হিন্দু যিনি ব্রাহ্মণ-কুলের বংশধর হইয়া ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন।" মনে কর, কোনও শিশু বা বালককে যদি অন্ধকারময়ী কুটীর মধ্যে এরূপে যাবজ্জীবন আবদ্ধ রাখা যায় যে, তাহার হস্তপদাদির কোনও মতেই স্ফুরণ হয় না, তাহা হইলে তাহার কি হস্তপদাদির উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে? সেইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির স্ফুরণ চাই। নয়নের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে প্রকৃতির নানা প্রকারের দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টির আবশ্যক, শ্রবণের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে নানা প্রকার শব্দ ও স্বরের শ্রবণ আবশ্যক; ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতির এই বৈচিত্র কেবল ভারতবর্ষেই সম্পূর্ণভাবে আছে,ভারতের সদৃশ দেশ আর কোথায় পাইবে? ভারতবর্ষ, প্রকৃতির সম্পূর্ণ লীলাস্থল। অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অটল অচল, বহুযোজনব্যাপী বিশাল অরণ্য, উর্ম্মিস্ফিত বেলাকুলান্দোলিত মহানদ, কুলুকুলুবাহিনী নদী বা নির্ঝরিণী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর, অত্যুচ্চ মহীরুহ, শোভাময়ী লতা-লতিকা, মনপ্রাণতৃপ্তিকর প্রসূনপুঞ্জ, রসনানন্দদায়ক ফল, বহুপ্রকারের বিচিত্র ভাষা, বহুপ্রকারের নরনারী এবং বহুপ্রকারের আকৃতি ও প্রকৃতি, ভারতে ভিন্ন আর কোথায় পাইবে? ভারত ভিন্ন ষড় ঋতু আর কোথাও ক্রমান্বয়ে নিয়মিতরূপে শোভা বিস্তার করে না। আধ্যাত্মিক্ তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত ভারতে সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের ভারতই সম্পূর্ণ লীলাস্থল। শিক্ষার এমন স্থান আর কোথায় পাইবে? দেখিবার, শিখিবার,

জানিবার, পড়িবার, ঘুরিবার, এবং আলোচনা করিবার এমন দেশ আর কোথায়? অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু ভারতে ভ্রমণ করিয়া যাহা দেখিবার ও শিখিবার আছে, অন্যত্রে তাহা কোথায়? সম্পূর্ণ আদর্শ হইবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা একা ভারতেই বর্ত্তমান। ভারতে যাহা আছে, অন্যত্রে সম্পূর্ণভাবে তাহা নাই। সামান্য কথায় দেখ, ভারতবর্ষের অধিবাসীকে যে কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে দাও, তিনি তাহাতেই সম্যক সক্ষম হইবেন, কিন্তু একজন ইউরোপীয়কে ঢ় প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে দিলে তিনি গলদঘর্ম্ম হইয়া বিদূষকের বাচালত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখাইতে পারিবেন না। দেখিলে, ইউরোপীয়ের জিহ্বার দুর্গতি কেমন!! তাহাতেই বলিতে-ছিলাম, সম্যক সাধন ভারতেই সম্ভবে। এইরূপে দেখান যাইতে পারে, ইউরোপীয় ও আমেরিকান জাতিদিগের কেবল জিহ্বার অসম্পূর্ণতা নহে, প্রত্যেক কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় অস্ফূরিত অথবা একদেশদর্শী। ভারতেই এই সম্পূর্ণ আদর্শের মানব ছিল, সেই জন্যই ভারত "ধর্ম্মজগত" বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ। ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায় আর সে সম্পূর্ণ আদর্শ নাই। আলোকের পর অন্ধকার এবং অন্ধকারের পর আলোক আইসে; কিন্তু ভারতের যে সুখ-দিনমণি অস্ত গিয়াছে, তাহা কি আবার উঠিবে? আবার কি আদর্শ মানব—আবার কি প্রকৃত মহামানব—আবার কি সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিতে পাইব? মনে কর, ক, খ, গ, এই তিন ব্যক্তি এক স্থানে একই সময়ে দণ্ডায়মান। ক শারীরিক উন্নতির আদর্শ, কিন্তু তাহার মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি নাই; খ মানসিক উন্নতির আদর্শ, কিন্তু তাহার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নাই; এবং গ আধ্যাত্মিক উন্নতির আদর্শ, কিন্তু তাহাতে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষতার লেশমাত্র নাই। যদি কেহ আমাকে

জিজ্ঞাসা করে, "বৃদ্ধ মহাভারতী! তুমি ইহাদের কোন্‌টিকে আদর্শ করিতে চাহ" ইহার উত্তরে আমি বলিব "আমি ইহাদের কাহাকেও আদর্শ করিতে চাই না, কারণ ইহারা সকলেই অসম্পূর্ণ। কিন্তু "ক"এর শারীরিক উৎকর্ষ, "খ" এর মানসিক উৎকর্ষ এবং "গ" এর আত্মিক উৎকর্ষ একত্রিত হইলে যে মহাআদর্শ, যে সম্পূর্ণ আদর্শ পাওয়া যায়, তাহাই আমার আদর্শ। সেই মহাআদর্শ, সেই সম্পূর্ণ আদর্শ (Perfect Ideal) জগতে নরাকারে ঈশ্বর।" সেই সম্পূর্ণ আদর্শকে চিন কি? সেই সম্পূর্ণ আদর্শের নাম ভগবান "শ্রীকৃষ্ণ।" ইনিই আমাদের Perfect Ideal ইনি আমাদের Godman এবং Man-God—even God Himself !! এই জন্যই এই "সম্পূর্ণাদর্শ" বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যোঃ মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

পাঠক মহাশয়! সে দিন আর নাই; যে দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "ব্যভিচারী; কুচক্রী; রক্তপিপাসু" বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আসিয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবিজ্ঞানময় যুগে বরণ্য এবং পূজ্য !! দুঃখের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াও দেখাইতে পারিলাম না; পাইয়াও দিতে পারিলাম না; বুঝিয়াও বুঝাইতে পারিলাম না। বোবার মুখে মিঠাই দিলে সে তাহার মিষ্টতা আস্বাদন করে, প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে কি? যে দিন সমস্ত ভারতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবে এবং বুঝিয়া তাঁহাকে আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিবে, সেই দিন ভারতের পশুত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব আসিবে। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিয়া উঠা অতীব কঠিন; মণিকার না হইলে কেমনে মণি চিনিবে? পারস্য কবি সেখ সাদি বলিয়াছেন "বলীরা বলী মেশনাসদ্‌; কবুতর বা কবুতর বাজ বা বাজ" সুতরাং কৃষ্ণের কৃপা

ভিন্ন কি কৃষ্ণকে চিনা যায়? চিনিতে পার আর না পার, এই সম্পূর্ণ আদর্শ জগতে অতুলনীয়। এই জন্যই পণ্ডিতপ্রবর জেকোলেৎ (Jaquolette) শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র লিখিয়া ফ্রান্সবাসীদিগকে বলিয়াছিলেন "Can ideal of Perfection go farther?" বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের তুলনা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ নাই।

"কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণ—অতুল ভূতলে।
জাহ্নবী পূজন যথা জাহ্নবীর জলে।"

বাস্তবিক ভগবান Srikrisna is a redeeming presence of Justice, love and magnanimity. আইস, আমরা সর্ব্ব আদর্শের আদর্শ—সেই সম্পূর্ণ আদর্শ—সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করি।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥*

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্রীনাথদ্বার।

পাঠক মহাশয়! আফ্রিকার নিহিজো সমরক্ষেত্র, রুসিয়ার উথাকাক্‌সপ্ শস্যক্ষেত্র, আমেরিকার গহনকানন মধ্যস্থিত সুগোনণ্টী গ্রাম অথবা অসভ্য অজাণ্টী জাতির অজালথ্ নগরের ভৌগলিক বিবরণে আপনি অভিজ্ঞ, কিন্তু শ্রীনাথদ্বার কোথায়, তাহা কি বলিতে পারেন? ইহা সমুদ্রপারস্থিত ইউরোপ বা আমেরিকায় অথবা হিমালয় পারস্থিত তির্ব্বত দেশে অবস্থিত নহে, আমাদের জন্মভূমি ভারতেই ইহার অস্তিত্ব! ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই, হিন্দুস্থানের ভূগোলে ইহা স্থান পায় নাই, ইংরেজাধিকৃত ইণ্ডিয়ার মানচিত্রে ইহার

নাম পর্য্যন্ত নাই, অথচ ছয় কোটি হিন্দুর ইহা পবিত্র ও পুরাতন তীর্থ-ক্ষেত্র! এখানে রেল নাই, তার নাই, ইংরেজ নাই, ছাউনী (Cantonment) নাই, অথচ হল্‌দিঘাটের জগদ্বিখ্যাত সমরক্ষেত্রে এখানকার বীরেরাই আকবর, আওরঙ্গজেব ও আলাউদ্দীনকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে সম্বাদপত্র নাই, কংগ্রেশের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, স্কুল নাই, কলেজ নাই, সভাসমিতি নাই, অথচ এই পুরাতন ও পবিত্র নগরের সমরকুশল পুরুষদিগের ষড়যন্ত্রে ভারতবর্ষীয় বৃটিশ বীর-কেশরগণ হিম্ শিম্ খাইয়া রাজপুতানা হইতে কয়েকবার পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনেক প্রান্তর, অনেক পাহাড়, অনেক জঙ্গল ও জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া এই দূরবর্ত্তী দুর্গম স্থানে গমন করিতে হয়; প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভয়াবহ হল্‌দিঘাট পার না হইলে শ্রীনাথদ্বারে যাওয়া যায় না। এই স্থান কোথায় বলিতে পারেন কি? এই অপূর্ব্ব স্থান রাজপুতানার অন্তর্গত মেওয়ারের রাজার অধীন। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যে বা পদ্যে শ্রীনাথদ্বারের বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই, কবিবর মিল্টনের ন্যায় আমি বলিতে পারি, শ্রীনাথদ্বারের কৌতুকাবহ বিবরণ Yet unattempted in prose or in rhyme. সুপ্রসিদ্ধ পারস্য লেখক গোলাম রসুল লিখিয়াছেন "হরা কস্‌কে তাবকৃতে হমা দর বেয়াণ কোশীষ ন কর্দ্দা বুদ্" সুতরাং এই অপূর্ব্ব স্থানের অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ বা পাঠ করিলে মনোমধ্যে নানা রস ও নানা ভাবের উদয় হয়। রাজপুতানা মালওয়া রেলওয়ের ভীলোয়াড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া শ্রীনাথদ্বারে যাওয়া যায়, কিন্তু নানা কারণে সেই পথটি নিরতিশয় অসুখ ও অসুবিধাজনক, এই জন্য অপেক্ষাকৃত সুগম ও সহজ পথ দিয়া আমি শ্রীনাথদ্বারে গমন করিয়াছিলাম। উদয়পুর নামক প্রসিদ্ধ নগর হইতে শ্রীনাথদ্বারে যাইবার অধিকতর সুবিধা দেখিয়া আমি এই

পথই অবলম্বন করিয়াছিলাম। উদয়পুর হইতে রওয়ানা হইবার সময়, একাখানি মহারাজার হাসপাতালের পার্শ্ব দিয়া আসিতে লাগিল। হাসপাতালের ভিতর বিষম কোলাহল শ্রবণ করিয়া আমি ডাক্তারকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "মেওয়ারের কতকগুলি হিন্দুজাতির মধ্যে নিয়ম আছে, তাহারা কাহারও দান গ্রহণ করে না এবং বিনা মূল্যে কাহারও অন্ন খায় না। রাজার হাসপাতালে রোগী-দিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও অন্ন দান করা হইয়া থাকে। যে সকল রোগী খয়রাতী অন্ন গ্রহণ করে না, তাহাদের বাটীর লোকেরা অন্ন আনয়ন করে। সম্প্রতি কতকগুলি লোক রাজার হাসপাতালে খয়রাতী অন্ন খাইয়াছে বলিয়া তাহাদের আত্মীয় ও কুটুম্বেরা তাহাদিগকে "পতিত" করিবার পরোয়াণা দিয়াছে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক সমাজে পুনঃ গ্রহণ ব্যাপার লইয়া জ্ঞাতিরা গোলমাল করি-তেছে।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার মহাশয় এদেশের লোকের আত্ম-মর্য্যাদার খুব প্রশংসা করিলেন; তিনি বলিলেন, বেণে, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতিরা কখনও ভিক্ষা করে না বা খয়রাতী খানা খায় না. তাহারা স্বহস্তোপার্জ্জিত টাকায় যাহা খাইতে পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আমি অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে অনেক হাসপাতালে এইরূপ আত্মমর্য্যাদার লোক ও জাতি দেখিয়া-ছিলাম। বস্তুতঃ মেওয়ার ও মাড়োয়ারের লোকেরা ব্যবসা ও বাণিজ্যে যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে ভিক্ষা বা খয়রাৎ ইহাদের পক্ষে অনুচিত বলিয়াই বোধ হয়। ব্যবসায় এরূপ উন্নতি ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি খুব কমই করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা ভিন্ন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এক্ষণে মাড়োয়ারীরা ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য গমনাগমন করে, এই জন্য সাহেবেরাও হিংসার

সহিত বলে These ubiquitous people (the Marwaris) go every where as interlopers and intruders. কিন্তু বঙ্গবাসী ভ্রাতা এত লেখা পড়া শিখিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের এত চর্চ্চা করিয়া, দেশহিতকর ব্রতে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াও, মাড়োয়ারীর পশ্চাদপদ হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য কবির ভাষায় বলিতে হয়——

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি।

অতি উচ্চ রবে, যারে তারে কবে,
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি॥
যদি বল কেন বলি হে এমন ?
বলিবার যে আছে হে কারণ
কোন্ জাতি বল এদের মতন
ছাড়িয়া ব্যবসা বাণিজ্য সাধন
পরের দাসত্বে মগন হয় ?"

যাহা হউক, উদয়পুর নগর হইতে তিন মাইল দূরে যাইবার পরে একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতকে সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। গাড়োয়ান বলিল, এই পর্ব্বতের উপর দিয়া একমাত্র পথ, সেই পথ অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে যাইতে হইবে। আমি উর্দ্ধে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আকাশের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই কেবল পাহাড় আর পাহাড়! অভ্রভেদী অত্যুচ্চ গিরিশিখরের উপরিস্থিত প্রকাণ্ড মহীরুহ সমূহ মেঘকে ভেদ করিয়া চলিয়াছে, উর্দ্ধে কেবল ধূঁয়া ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। আমরা প্রাতে বেলা নয়টার সময় পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এক মাইল উঠিবার পরে গাড়োয়ান বলিল, একার উপর আর বসা যায় না, একায় বসিয়া থাকিলে ঘোড়া চলিতে পারিবে না, সুতরাং

আমরা একা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলাম। চারিদিকে গহন বন, সেই বনের মধ্যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা। অন্যান্য বনে যেমন নানা প্রকারের শোভা থাকে, এখানে তাহার কিছুই নাই, কেবল শুষ্ক ও নীরস বন আর বন ভিন্ন কিছুই ছিল না। পর্ব্বতের প্রস্তর এমন কঠিন এবং পথ এত সঙ্কীর্ণ, বক্র ও পাথরভাঙ্গায় পরিপূর্ণ যে, পায়ের মজ্‌বুদ জুতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অতি কষ্টে ঘোড়া ও একাকে সেই পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বেলা প্রায় দ্বাদশ ঘটিকার সময় আমরা বন পার হইলাম, কিন্তু তখনও পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারি নাই। বন পার হইয়া দেখিলাম, পথ একটু প্রশস্ত হইয়াছে এবং দুই চারি জন পথিক গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু দূরে "নিগাবান-থানা" দেখিলাম; রাজপুতনায় প্রহরীদিগকে নিগাবান বলে। পথিকদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য এই স্থানে উদয়পুরের মহারাজার নিয়োজিত তিন জন বলবান প্রহরী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিবারাত্রি পাহারা দেয়। নিগাবান-থানা হইতে এক মাইল দূরে পথটি একেবারে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া গিয়াছে, পর্ব্বতের অতি কিনারা দিয়া বিশেষ কষ্টে ও ভয়ে ভয়ে পথিককে যাইতে হয়। পাহাড় এত উচ্চ যে, নীচের দিকে চাহিলে ধূঁয়া ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সেখান হইতে পড়িয়া গেলে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতীব সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই পথ দিয়া আমরা চলিতে চলিতে, অষ্টাবক্র মুনির মত বেঁকিতে বেঁকিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পাহাড়ের আর একটি শিখরে উঠিলাম। এই খানে "চড়াই"এর শেষ। তাহার পরে "উতরাই" আরম্ভ। এইবারে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে হইবে। অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকা শেষ হইতে যখন অল্প বাকী, তখন আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

পথে জল পাই নাই, পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছিল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল; ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন, ক্লান্তির আর সীমা ছিল না। সেই শীতকালে আমাদের গা দিয়া এত স্বেদ (ঘাম) নির্গত হইতেছিল যে, আমরা যেন কোন সরোবর হইতে স্নান করিয়া উঠিয়াছি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ঘোড়ার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে দুগ্ধবৎ ফেন নির্গত হইতেছিল, তাহার সর্ব্ব শরীর স্বেদসিক্ত হওয়ায় দুর্গন্ধের পরিসীমা ছিল না। পাহাড় হইতে নামিয়া আমরা জলান্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও জল পাওয়া গেল না। অনাহারে, পিপাসায়, পরিশ্রমে আমরা একেবারে মৃতবৎ হইয়া পড়িলাম। পর্ব্বতের পাদদেশে এক প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত প্রস্তর ছিল, তাহারই এক পার্শ্বে গাড়োয়ান এবং অপর পার্শ্বে আমি শয়ন করিয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, শরীরে এত বেদনা বোধ হইল যে, উঠিবার শক্তি ছিল না। ঘোড়াটাও এক স্থানে শুইয়া ছট ফট করিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া আমি তন্দ্রাভিভূত হইলাম; ভাল নিদ্রা হইবে কেন? ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন শরীরে সুনিদ্রা হওয়া সুকঠিন। কিছুক্ষণ পরে তন্দ্রাভঙ্গ হওয়ায় দেখিলাম, সেখানে একা কিম্বা ঘোড়া কিম্বা গাড়োয়ান ইহাদের কেহই নাই। এই বিপদের উপর বিপদে, এই উৎকণ্ঠার উপর উৎকণ্ঠায় আরও ব্যাকুলিত চিত্তে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর দেখিলাম, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখা গেল না। মনে মনে ভাবিলাম, বুঝি ভীলদস্যুরা ঘোড়া এবং একা ও গাড়োয়ানকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে,—বোধ হয়, শকটবান এতক্ষণে তাহাদের হস্তে নিহত হইয়াছে। এইরূপে নিরুপায় অবস্থায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত চিন্তা করিতে করিতে চক্ষু মুদিত করিলাম এবং চক্ষু মুদিয়া গুরুপদ ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। কিছুক্ষণ পরে বোধ হইল, আমাকে কেহ যেন শূন্যে

উঠাইয়া লইয়া যাইতেছে। সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চক্ষু খুলিয়া সম্মুখের দিকে তাকাইলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অথচ আমার দেহ ক্রমশঃ অল্পে অল্পে শূন্যে (ঊর্দ্ধে) উঠিতেছে। আবার চক্ষু মুদিলাম, আবার ভগ্ন ধ্যানের বাকী অংশ পূরণ করিতে লাগিলাম। এবারে বোধ হইল, যেন একজন মনুষ্য আমার দুইটি হাত এবং আর একজন মনুষ্য আমার দুইটি পা ধরিয়া আমাকে ধীরে ধীরে উঠাইতেছে ; অতি অল্পক্ষণ মধ্যে তাহাদের একজনের স্কন্ধে আমার দুইটি পা এবং অন্যজনের স্কন্ধে আমার দুইটি হাত নিপতিত হইল। লোকে যেরূপে মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া যায়, আমাকেও সেই রূপে তাহারা বহিয়া লইতে লাগিল। ইহারা কে এবং আমাকে কেন অথবা কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। এদিকে গাড়োয়ান, গাড়ী বা ঘোড়ার কোন সন্ধানই নাই !!

সাহসে নির্ভর করিয়া আবার চক্ষু উন্মীলন করিলাম, এবারে সম্মুখের লোকটিকে অর্থাৎ যাহার স্কন্ধে আমার পদদ্বয় বিস্তৃত ছিল, তাহাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, তাহার মাথায় সুদীর্ঘ জটা এবং মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ভস্মমাখা। তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, কেবল কটিদেশ সামান্যমাত্র গৈরিকবসনে আবৃত। মাথার দিকের লোক-টিকে আদৌ দেখিতে পাইলাম না। ইহারা আমাকে কিয়দ্দূরে লইয়া গিয়া এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বনের ভিতরে পর্ব্বত ছিল, ঐ পর্ব্বতের কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া "অনুপ দাস" বলিয়া দুই তিন বার উচ্চরবে চীৎকার করায় এক ব্যক্তি একটী ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া দিল। বুঝিলাম, ইহা একটি গুহা। ঐ গুহার দ্বার অর্গল বিমুক্ত হইলে পর, আমার দেহ সেই ভাবে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, গুহাটিকে গোধূলির ন্যায় অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইল। সেই অন্ধকারময় পথ দিয়া কিছু দূর

চলিয়া গিয়া তাঁহারা আমাকে ভূতলে দাঁড় করাইলেন, আমি দাঁড়াইবা মাত্র তাঁহাদের এক জন আমার কটিদেশের বামদিক এবং আর এক জন দক্ষিণ দিক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সজোরে টিপিয়া দিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার গাত্রবেদনা দূর হইয়া গেল। অতঃপর আমাকে সপ্রেম চুম্বন করতঃ তাঁহারা বলিলেন, "বোধ হয়, তুমি সুস্থ হইয়াছ, এবারে আমাদের সঙ্গে আইস"। আমি তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। প্রায় দশ মিনিট কাল যাইবার পরে তাঁহারা বলিলেন "আর যাইতে হইবে না, এই স্থানে বিশ্রাম-সুখ ভোগ কর"। আমি তখন বুঝিলাম, ইহাঁরা ভীলদস্যু নহেন, এই মহাত্মাদ্বয় এই নির্জ্জন বনাভ্যন্তরস্থিত গুহার মধ্যে তপস্বী (সাধু) এবং এই রমণীয় স্থান ব্রহ্মদর্শী যোগী পুরুষের পবিত্র আশ্রম। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই আশ্রমে অতীব স্বচ্ছসলিল পরিপূর্ণ সুন্দর ও সুবৃহৎ সরোবর বর্ত্তমান, তাহাতে নানা জাতীয় সুগন্ধি পরিপূর্ণ জলজপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং তদুপরি ভৃঙ্গ ও ভ্রমরগণ গুণ গুণ করিয়া ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে; সেই স্ফটিক-প্রতিম স্বচ্ছ সলিলে কলহংস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, বুহিল, বিড়ঙ্গ প্রভৃতি বিহঙ্গবর্গ বিনোদ তান ছাড়িয়া দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সরোবরের চারিদিক প্রশস্ত প্রস্তর দিয়া বাঁধান, তাহার ধারে ধারে বিবিধ প্রকার মনোহর পুষ্পবৃক্ষ এবং প্রসূন-ব্রততী অনুপম সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে সেই দেবোপম আশ্রমকে মাতাইয়া রাখিয়াছে। আমি ত্রিদিবে কি ভূতলে ঠিক করিতে পারিলাম না। পার্শ্বে দুইটি বিগ্রহ-মন্দির, তাহার পরে তপোবন, ফল মূলের উদ্যান, সাধুদের পাকশালা এবং তাহার কিয়দ্দূরে আশ্রমাধ্যক্ষ মহর্ষির কুটীর। যুবক শিষ্য অনুপদাস এবং সেই দুইটি সাধু আমাকে মহর্ষির নিকটে লইয়া গেলেন, তিনি আমাকে

সপ্রেম আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন, আমি সেই একশত বর্ষাধিক বয়ঃক্রমের এবং সুদীর্ঘ শুভ্র জটাজুট ও শুভ্র শ্মশ্রু সমাযুক্ত মহর্ষির পবিত্র পদে সভক্তি প্রণাম করিয়া আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিলাম। শেষে সকলের সহিত মধুর আলাপ পরিচয় হইল। আমি গাড়োয়ানের কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রবৃদ্ধ মহা-পুরুষ বলিলেন "চিন্তা নাই, এই আশ্রমে সকলই মজুদ আছে।" অল্প-ক্ষণ পরে অনুপদাস সেই গাড়োয়ানকে আনিয়া আমার সম্মুখে দাঁড় করাইল। গাড়োয়ানকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে এখানে কে আনিল?" সে ব্যক্তি বলিল "তাহার কিছুই জানি না, সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে; এখানে এক্কা, এক্কার ঘোড়া এবং আমি উপ-স্থিত আছি, এই টুকু জানি, তাহার অধিক কিছুই জানি না।" তদ-ন্তর আমি তাহাকে আমার নিজের অবস্থার কথা বলিলাম; সে কথা শুনিয়া গাড়োয়ান বলিল, "আপনি এখানে কেমনে আসিলেন, তাহার বিবরণ আপনি কিছু কিছু দিতে পারিতেছেন, কিন্তু আমি এখানে কেমনে আসিলাম এবং এই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া এই ঘোড়া এবং এই গাড়ী কেমনে আনীত হইল, আমি তাহার কিছুই বলিতে পারি না। মহাশয়! আমরা বাল্যকাল হইতে পুরুষপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, এই মহাবনে এবং এই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে ঋষিরা বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই মনুষ্যের নয়নগোচর হয়েন না। অদ্য মহাপুরুষ দর্শন করিয়া পরম পবিত্র হইলাম।" যাহা হউক, আমরা 'মহর্ষির আশ্রমে তিন দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম। মহাপুরুষদিগের যত্ন, প্রেম, ভালবাসা, অলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি যাহা কিছু দর্শন করিয়া-ছিলাম, তাহার সম্যক বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। যাহা হউক, তিন দিনের পরে আমরা সাধু মহাত্মাদিগের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করিয়া

বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাঁহারা বলিলেন "আপনারা অগ্রসর হউন, একা ও ঘোড়া পশ্চাৎ প্রেরিত হইতেছে।" আমি ও গাড়োয়ান পুনরায় গুহার বাহিরে সেই প্রস্তরখণ্ডের নিকটে আসিয়া দেখি, আমাদের আসিবার পূর্ব্বে একা ও অশ্ব সেই থানে মজুদ রহিয়াছে। এই অলৌকিক কাণ্ডে গাড়োয়ান নিতান্ত বিস্মিত হইল, আমি বলিলাম, "বিস্মিত হইও না, ব্রহ্মদর্শী পুরুষদিগের নিকটে সকলই সম্ভব।" যাহা হউক, একটা অনতিবৃহৎ উপত্যকা পার হইয়া আমরা যাইতে আরম্ভ করিলাম, সেই উপত্যকার প্রান্তভাগে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় (Hillock) ছিল, তাহা অতিক্রম করিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বত পার হইয়া আর একটি উপত্যকা দেখিলাম, সেই উপত্যকায় সুন্দর সরোবর এবং অনেক গুলি মনোহর শস্যক্ষেত্র ছিল। সরোবরে স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলাম, সেই গ্রামের প্রান্তভাগে সুপ্রসিদ্ধ "একলিঙ্গ" দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। একলিঙ্গ মহাদেবের নাম। এই শিবমন্দির অতি পুরাতন এবং সমগ্র মেওয়ারবাসিদিগের নিকটে অতি পবিত্র। রাজা ও প্রজা উভয়ে ইহাকে মেওয়ারের ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন। মুসলমান শাসনের পূর্ব্বকালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুনা যায়, উদয়পুরের এক প্রাচীন মহারাজা এক সময়ে সমগ্র রাজ্যটি এই বিগ্রহের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। বৃটীশ রেসিডেণ্টের নিষেধে তাহা করিতে পারেন নাই। এই সুদৃঢ় মন্দির প্রশস্ত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত,প্রবেশের সময় বোধ হয়, যেন মাটীর ভিতরে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। মেওয়ারের মধ্যে একলিঙ্গকে না জানে এবং না মানে,এমন লোক নাই। উদয়পুরে এই দেবতার নামে অর্থাৎ "একলিঙ্গ" নামে একখানি সাপ্তাহিক হিন্দী সম্বাদপত্রও প্রচারিত হইত, এখন তাহা বন্ধ হইয়া

গিয়াছে। আমরা একলিঙ্গ দর্শন করিয়া সেই গ্রামে নিশিযাপন করিলাম। প্রভাতে এক্কাওয়ালা বলিল, "মহাশয়! এখান হইতে শ্রীনাথদ্বারে যাইবার দুইটি পথ আছে; যদি সোজা পথে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিরাপদে এবারে সমতলভূমি দিয়া আমরা যাইতে পারিব, আর যদি হলদিঘাট দেখা আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে চারি ক্রোশ পথ পাহাড়ে পাহাড়ে (বক্রভাবে) যাইতে হইবে। আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন।" আমি জগদ্বিখ্যাত হলদিঘাট দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, গাড়োয়ান বলিল, "তাহা হইলে একজন ভীল সর্দ্দারকে সঙ্গে লওয়া উচিত, নতুবা সে পথে যাওয়া কঠিন হইবে।" আমি সেই গ্রাম হইতে একজন ভীলসর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া:পুনরায় গমন করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় নয় মাইল পথ পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়া দেখিলাম, আরাবল্লী পর্ব্বতমালার যে অংশ দিয়া আমরা যাইতেছিলাম, সেই অংশের বিচ্ছেদ (Detached) হইয়াছে এবং সেই অংশ ঘুরিয়া গিয়া প্রায় দুই মাইল দূরে (সম্মুখে) প্রসারিত হইয়া অত্যুচ্চ অটল অচলবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা যে পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই পাহাড় এবং সম্মুখের ঐ পাহাড় এতদুভয়ের মধ্যে সুবিশাল প্রান্তরের প্রায় চতুর্দ্দিক নিরবচ্ছিন্ন গিরিমালায় পরিবৃত। এই প্রান্তরে উপস্থিত হইলে সম্মুখের দিকে চাহিয়া ভীলসর্দ্দার কহিল, "ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, ঐ হলদিঘাটের প্রবেশদ্বার।" আমি সুপ্রসিদ্ধ হলদিঘাটের দরওয়াজার দিকে তাকাইয়া বলিলাম "এই স্থানের হলদিঘাট নাম হইবার কারণ কি?" সর্দ্দার কহিল, "ইহার প্রকৃত নাম হাওলদারঘাট, হলদিঘাট নয়। আমাদের দেশে সেনাধিনায়কের প্রধানামাত্যকে হাওলদার বলে, এই ঘাট হাওলদারদিগের দ্বারায় রক্ষিত হইত, এই জন্যই ইহার হাওলদার-

ঘাট নাম হইয়াছিল, অপভ্রংশে হাওলদাঘাট, হলদিঘাট প্রভৃতি নাম হইয়াছে।" দূর হইতে দেখিলে হলদিঘাটের প্রবেশদ্বারকে ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র বলিয়া বোধ হয়, যতই নিকটে যাওয়া যায়, ততই উহার বিশালত্ব বুঝিতে পারা যায়। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সুবিশাল আরাবল্লী পর্ব্বতের দুইটী অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শাখা দুই দিকে দণ্ডায়মান, তাহার মধ্যে ভীষণ পার্ব্বত্য পথ (mountain pass); এই পথ প্রায় দেড় মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে অল্পে অল্পে অন্ধকার এবং অত্যন্ত শীতলতা অনুভূত হয়। স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণ ঝরণাও আছে। ভীলসর্দ্দার বলিল, "এদিকে এই হলদিঘাট এবং অন্যদিকে চিতোর গড় যদি সুন্দররূপে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে মেওয়ার আক্রমণের আর আতঙ্ক থাকে না। কিন্তু দেখুন, মুসলমানদিগের বীরত্ব, বিক্রম ও সৌভাগ্য কেমন প্রবল! তাহারা চিতোর ধ্বংস করিয়া হলদিঘাট পর্য্যন্ত মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অগ্রসর হইয়াছিল।" যবনের হাতে হিন্দুর পরাজয় ব্যাপার স্মরণ করিয়া ভীলসর্দ্দার কাঁদিতে লাগিল, আমি ইত্যবসরে হলদিঘাটের দরওয়াজাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ঘাটের ফটকের দুই ধারের দেওয়ালে দুইটি বর্ম্ম পরিহিত মহাবীরের প্রতিমূর্ত্তি, তাহাদের কটিদেশে, বক্ষস্থলে ও বাহুতে সুতীক্ষ্ণ আয়ুধ খোদিত দেখিয়াছিলাম। ফটকের উপরে লক্ষ্মী, নারায়ণ, মহাদেব ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি, ইহাদের চারি পার্শ্বে শঙ্খ চক্র, গদা পদ্ম। গেটের ভিতরের দেওয়ালে রাম, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, দশরথ, হনুমান, কংসবধকারী শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। আমি গাড়োয়ানকে নীচে রাখিয়া ভীল সর্দ্দারের সঙ্গে হলদিঘাটের উপরে (পাহাড়ের উপরে) উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকের অরণ্য ও গিরিমালার যে নৈসর্গিক শোভা

দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অত্যন্ত রমণীয়। ভীলসর্দ্দার আমাকে নানা স্থান দেখাইয়া দিল। যেস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, যেস্থানে মহাবীর রেওয়াল সিংহ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, যে যে স্থানে গোলাগুলি লাগিয়া পাহাড়ের গাত্রে দাগ হইয়াছিল, যে স্থানে মহারাজা উদয়প্রতাপ সিংহ বীরদিগকে শিক্ষা ও উৎসাহ দিতেন, যেখানে সমরের মন্ত্রণা হইত, যেখানে রজপুত রমণীরা যুদ্ধের জয়লাভ জন্য শিবপূজা করিতেন, যে সকল বনে প্রতাপসিংহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীলদিগের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতেন, সে সকল দেখিলাম। ভীলসর্দ্দার, ভীলদিগের সম্বন্ধে যুদ্ধের ব্যাপার লইয়া অনেক কথা শুনাইল। তাহার পরে পাহাড়ের উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া হলদিঘাট অতিক্রম পূর্ব্বক ভীলসর্দ্দারকে তাহার যথোচিত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার প্রদান করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। সর্দ্দার তাহার গৃহে চলিয়া গেল। এবারের পথ ভাল ছিল, আমরা বিনা কষ্টে যাইতে লাগিলাম। যেখানে সন্ধ্যা হইল, সেই গ্রামের নাম "গো করণ (অর্থবা গোকর্ণ) পুর"। পাঠক মহাশয়-দিগের বোধ হয় জানা আছে, রাজপুতনার—কেবল রাজপুতনা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুরাজাদিগের একটি করিয়া গোশালা থাকে, গোপালন করা হিন্দুরাজারা মহাপুণ্যজনক ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। গোকর্ণপুরে কেবল ২৬ ঘর গোয়ালার বসতি, ইহারা রাজার গো ও বলদ সমূহ প্রতিপালন করে এবং তজ্জন্য ভূমি ও বৃত্তি ভোগ করে। এই গ্রামে উদয়পুরের মহারাজার গোশালায় ৫০টি বলদ এবং ১০০টি গাভী ছিল। এই সকল গাভী হইতে যে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা রাজার বা রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রাপ্য নহে, এই দুগ্ধ বিক্রয় করা হয় না; ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, সন্ন্যাসী, অনাথ, অতিথি প্রভৃতিকে দান করা হইয়া থাকে। এই গ্রামে নিশিযাপন করিয়া

পর দিন প্রভাতে আমরা শ্রীনাথদ্বারাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলাম এবং রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় প্রবল শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নগরে প্রবেশ করিলাম। পথ ভাল ছিল; সমতল ভূমির উপর দিয়া শস্যক্ষেত্র সমূহ দেখিতে দেখিতে সহজে আসিতে পারিয়াছিলাম। পথে এক জলাশয় পার হইতে হইয়াছিল, ঐ জলাশয়ের জল লাগিয়া আমার পুস্তকাদি ভিজিয়া গিয়াছিল। নগরে প্রবেশ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, হিন্দুর ধর্ম্মস্পৃহা কি আশ্চর্য্যরূপে বলবতী! এরূপ দূর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও অসংখ্যাসংখ্য হিন্দুনরনারী এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে। যে জাতির হৃদয় মধ্যে ধর্ম্মভাব এরূপ প্রবল, সে জাতি কালপ্রভাবে অধঃপতিত হইলেও তাহার পুনরুত্থানের ভরসা আছে।

আমি রাত্রিকালে শ্রীনাথদ্বারে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সুতরাং অন্ধকারে নগরের কিছুই দেখিতে পাই নাই। প্রভাতে জানিতে পারিলাম, এই ক্ষুদ্র নগরটি মৃত্তিকা ও শষ্পাবৃত প্রস্তরস্তূপোপরে (Hillock) অবস্থিত। সমগ্র মেওয়ার বা উদয়পুর রাজ্যের অন্যদিকে যেমন চিতোর প্রথম সীমা এবং প্রথম দ্বার, এই দিকে শ্রীনাথদ্বার ইহার শেষ সীমা এবং শেষ দ্বার, এই স্থানেই সুবিশাল মেওয়ার রাজ্যের এবং আরাবল্লী পর্ব্বতের শেষ প্রান্ত দেখিতে পাইবেন। শ্রীনাথদ্বারে প্রবেশ করিলে বিদেশী পথিকেরা সর্ব্বপ্রথমে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন; কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় সকল তীর্থেই আমরা পুরুষ "পাণ্ডা" দেখিয়া থাকি, কিন্তু শ্রীনাথের পাণ্ডারা পুরুষ নহেন—ব্রাহ্মণকন্যা!! বিধবা হইলে পাণ্ডাগিরি করিতে পারে না, কুমারী কিম্বা সধবারাই পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকে; এখানে স্ত্রীলোকের অধিক

বয়সে বিবাহ হয়, সুতরাং কুমারীপাণ্ডাগণ প্রায়ই পরিণত বয়স্কা; আমি দ্বাবিংশ বয়স্কা একজন ব্রাহ্মণকুমারী পাণ্ডা দেখিয়াছিলাম সমগ্র মেওয়ার রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা অতীব রূপবতী, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ ঠিক পরীর ন্যায়, এই সকল পাণ্ডার মনোরজ্জুতে বড় বড় যাত্রীজাহাজেরা টানা গিয়া থাকে। আকর্ষিত হইতে হইতে কোনও কোনও হতভাগ্য পথিক বা যাত্রী এমন আহত হয় যে, তাহাতেই তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীনাথদ্বারের দ্বিতীয় আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এখানকার বাজারে গোধূম, সর্ষপ, লবণ, ঘৃত, মুড়কী প্রভৃতির ন্যায় প্রতিদিন দুই বেলা পান্তা ভাত ও গরম ভাত বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা তাহা বিক্রয় করে। বাঙ্গালা দেশে এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে দেশীয় হোটেল আছে, তথায় পয়সা দিয়া অনেক পথিক হোটে-লের ভিতর ভাত খায়, কিন্তু এখানে বসিয়া কেহই ভাত খায় না, ভাত রীতিমত বিক্রয় হয়। বাজারে গিয়া দেখিলাম, কেহ দুই পয়সা, কেহ চারি পয়সা, কেহ দুই আনা, কেহ তিন আনা দিয়া ভাত খরিদ করি-তেছে এবং বিক্রেতা তাহা ওজন করিয়া বিক্রয় করিতেছে। ছয় পয়সা দিলে গরম ভাত এবং চারি প্রকারের তরকারী পাওয়া যায়, তাহা একজন বলবান লোকের আহারের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু শ্রীনাথ-দ্বারের ছয় পয়সা আমাদের বৃটীশ ভারতের নয় পয়সার সঙ্গে সমতুল্য। তৃতীয় আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এখানে ব্রাহ্মণেরা যখন আহার করেন, তখন স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করেন না। মনে করুন, একজন ব্রাহ্মণের স্ত্রী তাহার অন্ন (ভাত) বা রুটি পাক বা প্রস্তুত করিয়াছে, স্বামীকে "পরিবেশন" করিয়াছে, স্বামীর ভোজনের সময়ে তাহার ভোজনপাত্র স্পর্শ করিয়া অন্ন, রুটী এবং অন্যান্য দ্রব্য পরিবেশন করিতেছে, ব্রাহ্মণ ইহাতে আপত্তি করিবেন না, কিন্তু আহারের সময় স্ত্রীর দেহের অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিলেই, স্বামী ভোজনপাত্র পরিত্যাগ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া ফেলিবেন এবং ঐ অন্ন "অস্পৃশ্য" বলিয়া বিবেচনা করিবেন। আমি, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণ-কন্যা, ব্রাহ্মণ পিতামাতার ঔরসে ও গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও, উপবীত ধারণ করিতে অনধিকারিণী হওয়ায়, শূদ্রা মধ্যে গণনীয়া, এজন্য ব্রাহ্মণী পূজাকার্য্য সাধনে অনুপযুক্তা।" কি আশ্চর্য্য দেশাচার! ভারতের নানা স্থানে কতই অদ্ভুত সামাজিক প্রথা !!

"শ্রীনাথদ্বার" এই নামের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তির সঙ্গে শ্রীনাথদ্বারের ইতিহাস সম্পর্কীভূত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম "শ্রীনাথ"। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্য নামে একজন সুচতুর ও সুবিদ্বান গোস্বামীর প্রাদুর্ভাব হয়, সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যে (দ্রাবিড় দেশে) ইঁহার জন্ম হইয়াছিল; বল্লভাচার্য্য নয় বৎসর কাল নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রজধামে (মথুরা ও বৃন্দাবনে) উপনীত হয়েন। কথিত আছে, বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ইঁহাকে আদেশ করেন যে, "আমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মতত্ত্ব লোপ হইয়া গিয়াছে; ভক্তেরা বৈরাগ্যাশ্রম করিয়া কঠোর ভাবে জীবনযাপন করিতেছে; তাহারা সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া সংসারকে অসার ও আনন্দশূন্য করিয়া তুলিতেছে; অতএব তুমি পুনরায় আমার প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কর।" সুচতুর বল্লভাচার্য্যের এই কথা জনসাধারণ মধ্যে প্রচারিত হইলে, সকলে তাঁহাকে অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও মান্য করিতে লাগিল; বল্লভাচার্য্য "মহারাজা" উপাধি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্যভাবের উপাসনা সৃষ্টি করিলেন, এই নূতন ভাবের নাম "পুষ্টিমার্গ"—ইহার ঠিক ইংরাজি অর্থ Eat and drink doctrine অর্থাৎ "সংসার কেবল

ভোগের স্থান; খাও, পিও আর মজা উড়াও।” পূর্ব্বকার বৈষ্ণবেরা দীনহীন ভাবে থাকিত, অনিত্য সাংসারিক সুখকূপে লম্ফ দিত না, কঠোর এবং তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তিমার্গেরই পথিক হইত, এক্ষণে একজন অবতারের মুখে “সাংসারিক সুখভোগই মোক্ষের কারণ” এই নূতন রসাল কথা শুনিয়া মরীচিকামুগ্ধ হরিণীদিগের ন্যায় প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুসরণ করিতে লাগিল। দলে দলে বল্লাভাচার্য্যের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নেতারা “মহারাজা” নামে খ্যাত হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র কচ্ছদেশ, কাটিয়োবাড়, সিন্ধু প্রদেশ, গুজরাট, বোম্বায়ের অধিকাংশ, সমগ্র মালব, মধ্যভারত, সমগ্র রাজপুতানা এবং দক্ষিণাবর্ত্তের অধিকাংশ বল্লভী মতে দীক্ষিত হইল। অসংখ্যাসংখ্য শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, মঠ, মূর্ত্তি ও “মহারাজা”দিগের বিলাস-ভোগ জন্য সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হইল। বৃন্দাবন ও মথুরা “প্রধান আড্ডা” বলিয়া প্রখ্যাত হইল। বল্লভাচার্য্য মতের বৈষ্ণবেরা “বল্লভীকুল” বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। ভারতবর্ষের অসংখ্য স্থানে বল্লভীমন্দির আছে, তন্মধ্যে যে গুলি মহা প্রধান, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম। ১ জয়পুরের গোবিন্দ-জি, ২ যোধপুরের গোপীনাথজী, ৩ যশলমীরের রাধাকান্ত, ৪ বিকানী-রের ব্রজসুন্দর, ৫ কোটার রাধানাথ, ৬ উদয়পুরের শ্রীনাথজী, কেরোলীর মদনমোহন, ৮ উজ্জয়িনীর কৃষ্ণচন্দ্র, ৯ কচ্ছের ব্রজপতি, ১০ কাটিয়াবাড়ের রাখালরাজা ১১ রটলামের গোবিন্দ স্বামী, ১২ ডাকোরের বিষ্ণুরাজ, ১৩ (মান্দ্রাজের) মাদুরার শ্রীগোবিন্দ, প্রভৃতি। সম্ভবত ভারতবর্ষে ইং ১৮৮০ অব্দে প্রায় সার্দ্ধ নয়শত বল্লভীকুল মন্দির ছিল। বেহার, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের কায়স্থেরা বল্লভকুলীদের খুব বিরোধী, কায়স্থজাতি অধিকাংশই

তান্ত্রিক, সুতরাং ইহাদের দশ হাজারের মধ্যে একজনও বল্লভকুলী কিনা সন্দেহ। পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদের অধিকাংশই বল্লভকুলী। রাজপুতানার, গুজরাটের, কচ্ছ ও কাটি-বাড়ের, মধ্যভারতের এবং বরোদার দেশীয় রাজাগণ বল্লভকুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও অতি ভক্ত শিষ্য। বল্লভাচার্য্যের নূতন মত বঙ্গদেশকে স্পর্শ করিতে বিমুখ হয় নাই, ইহাদেরই দুর্নীতি মূলক মতানুসরণ করিয়া বাঙ্গালায় সেই চিরকলঙ্কের চিহ্নস্বরূপ "গুরুগ্ গাঁই" প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল; সুখের বিষয়, বঙ্গদেশে এখন এই কুপ্রথা আর প্রচলিত নাই। বল্লভীকুলের "মহারাজাদিগের" বিবরণে এই প্রথার কতকটা আভাষ প্রাপ্ত হইবেন। এই মহারাজা দিগের Practices are more revolting than the superstitions of the most degraded savages. কল্পনা ও কার্য্যে বিলাস-সম্ভোগের যতদূর ধারণা হইতে পারে, ইন্দ্রিয়-লালসা ও পশুত্বের যতদূর সীমা থাকিতে পারে, নিবৃত্তিমার্গের পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তিমার্গে যতদূর আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে এবং পুণ্যের পবিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া পাপের মহা অপবিত্র ও অনিষ্টকর পথে গেলে মানুষের যাহা পরিণাম হয়, বল্লভীকুলী মহারাজাদিগের জীবনে তাহা প্রতিদিনে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, ভগবানের নামে, রোমের পোপও এত পাপ করিয়াছে কিনা সন্দেহ। মথুরা ও বৃন্দাবনের পরেই শ্রীনাথদ্বারের মন্দির ভারতবর্ষীয় বল্লভী-কুলী বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ ও আড্ডা। নিরপেক্ষ ভাবে বলিতে হইলে ইহা দেবতার মন্দির নহে—ইহা সয়তানের দরবার!! ভারত-বর্ষের ৬ কোটি হিন্দু এই সয়তানের দরবারের সভাসদ ও শিষ্য। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এখনও দ্বাদশ শতাধিক "মহারাজা" বিচরণ করেন; ভারতের অরণ্যে এই নিশাচরদিগের বিচরণে ভারতের অমঙ্গল ভিন্ন

মঙ্গল নাই। শ্রীনাথদ্বারে সচরাচর তিনটি মহাদৈত্যরূপী মহারাজা বিরাজ করেন।

এই সকল "মহারাজা" উপাধিধারী ব্রাহ্মণগুরুরা বিলাস ও ইন্দ্রিয় লালসার জীবন্তমূর্ত্তি। ইহাদের মাথার চুলগুলি বেশ চিক্কণ, সর্ব্বদাই চিরুণী দ্বারা সুবিন্যস্ত এবং বিবিধ সুগন্ধি তৈল ও এসেন্সে পরিপূর্ণ। গলায় পদ্ম ও তুলসী কাষ্ঠ মিশ্রিত মালা, তাহার উপরে স্বর্ণের হার; কোমরে সোণার বা রূপার মোটা মোটা "গোট্" ও চন্দ্রহার; হাতে বাজু, অনন্ত ও "বালা"; কাহারও কাহারও পায়ে সোণার নূপুর বা সোণার মল; পরিধানে সুন্দর সুন্দর "বাহার-ওয়ালা" ধুতী ও সাড়ি; গায়ে আতর গোলাপ ছড়ান; কাণে ফুলের ছোট ছোট গুচ্ছ; ভালে চন্দনের তিলক ও ফোঁটা এবং ওষ্ঠে পানের লাল দাগ চব্বিশ ঘণ্টাই বর্ত্তমান। ইহারা মদ্যপান করে না এবং নিরামিষ খায়; জাতিভেদ খুব রক্ষা করে; কিন্তু ভাং (সিদ্ধি), গাঁজা, অহিফেন প্রভৃতির প্রচলন ইহাদের মধ্যে খুব আছে। ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরী, কৃষি, মহাজনী প্রভৃতি ইহারা করে না, কেবল শিষ্যের মাথায় হাত বুলাইয়া (অথবা শিষ্য ঠকাইয়া) খায়। ইহারা খুব সৌখীন, ইহাদের শয্যা অতি সুন্দর এবং সুকোমল, গৃহের সর্ব্বত্র পুষ্প ও পুষ্পসারে পরিপূর্ণ এবং যাহা কিছু বিলাসের বা ঐন্দ্রিয়িক লালসার দ্রব্য, তাহা ইহাদের ঘরে দেখিতে পাইবেন। ইহাদের শিষ্যেরা যাহাতে তাহাদের ছেলেদিগকে ইংরাজী পড়িতে না দেয়, তজ্জন্য ইহারা খুব কঠোর আদেশ প্রদান করে। কচ্ছ, কাটিওয়াবাড়, গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থলের বল্লভকুলীরা চাকুরী বা কৃষিকর্ম্ম করে না, ইহারা বাণিজ্য ও ব্যবসা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। কচ্ছদেশের ভাটিয়া নামক জাতি বল্লভকুলের প্রধান গোঁড়া, ইহারা ভুলেও বালক-

দিগকে ইংরাজী শিখায় না এবং উপবাসী থাকিলেও কাহারও চাকুরী স্বীকার করে না। গুরুগণ (মহারাজগণ) শিষ্যদিগের নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা এই—

প্রত্যেক মণ চাউল (বিক্রীত হইলে)		এক আনা বৃত্তি।
ঐ ঐ তৈল	ঐ	অর্দ্ধ আনা ঐ
দালালীর প্রত্যেক শতকরায়		ঐ ঐ
হুণ্ডীর কারখানায়	ঐ	১ আনা ঐ
বস্ত্র, তুলা, রেসম, পশম ইত্যাদি		½ আনা (টাকায়)
চিনি, গুড়, মশালা		এক টাকায় এক পয়সা
সুবর্ণ, রৌপ্য, লৌহ	ঐ	ঐ
অহিফেন, গাঁজা প্রভৃতি	ঐ	½ পয়সা
মহাজনী কারবারে (প্রতি সহস্র টাকায়)		২ টাকা।
প্রত্যেক বিবাহে		৫ টাকা
প্রথম পুত্র সন্তান জন্মিলে		২ টাকা
নূতন গৃহ প্রস্তুত করিলে		২ টাকা
কন্যা বা বধূর ঋতু হইলে		৫ টাকা
শ্রাদ্ধের বৃত্তি		৩ টাকা
প্রথম দোকান খুলিলে		৪ টাকা
		ইত্যাদি।

প্রবন্ধ বড় হইবে বলিয়া তালিকাকে বড় করিলাম না। এতদ্ভিন্ন আর কয়েকটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা না লিখিলে প্রস্তাবের অঙ্গহীনতা হইবে বলিয়া তাহা উল্লেখ করিলাম।

গুরুর প্রথম প্রণামের দক্ষিণা	৫৲
গুরুর পদস্পর্শ দ্বারা প্রণাম	২০৲

গুরুর পদধৌত দ্বারা প্রণাম	৩৫৲
রাসে বা দোলে গুরুকে দোলায় ঝোলান জন্য বৃত্তি	৪০৲
গুরুর শরীরে সুগন্ধি মালিষ	৪২৲
গুরুর সহিত একাসনে উপবেশন	৬০৲
গুরুর গৃহে রাত্রিযাপন ৫০৲ হইতে	৫০০৲
মহারাজার স্বহস্ত প্রদত্ত পান ভক্ষণে	১৭৲
মহারাজার গাত্রস্নাত জলপান জন্য	১৯৲
মহারাজার প্রসাদ ভক্ষণে	২২৲
মহারাজার মাথায় মুকুট দেওয়া	২৫৲

গরীব হউক, আর ধনীই হউক, এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত টাকা দিতে না পারিলে ঐ সকল "পবিত্র কার্য্য" সম্পাদন করিয়া "সদ্য সদ্য মোক্ষ"লাভে কেহই অধিকারী হইবে না!! গুরুকে প্রাতেঃ দর্শন না করিলে শিষ্যেরা দোকান খুলিবে না এবং সে দিন আহার করিবে না, সুতরাং গুরুর পয়সার দরকার হইলে মন্দিরের দরজা সে বন্ধ করিয়া রাখে এবং বিগ্রহ দেখায় না অথবা নিজেও দেখা দেয় না। গুরু পান চিবাইতে চিবাইতে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে, শিষ্য কাছে থাকিলে তাহা উঠাইয়া লয় এবং "মহা পবিত্র" ভাবিয়া তাহা জিহ্বায় মাখাইয়া দেয়। Can idea of meanness go farther? Is there any parallel to such degradation to be found even among the lowest savages? ইহা অপেক্ষা মানবের অধঃপতনের আর অধিক কি পরিচয় চাও? কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে, অতঃপর যাহা বলিব, তাহাতে আমার ও তোমার রোমাঞ্চ উপস্থিত

হইবে—দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় আমাকে এবারে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু অশ্লীল কথার অবতারণা করিতে হইবে, কিন্তু সে জন্য আমি কুণ্ঠিত নহি। এই জলন্ত ও জীবন্ত মহাপাপ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে কি? I have called a spade a spade সুতরাং আমি সে জন্য সঙ্কুচিত নহি। মহারাজাদিগের কার্য্য কি, তাহাই এক্ষণে অনুধাবনা কর। ইহার একটা সংক্ষিপ্ত ফর্দ্দ দিতেছি।

১ম। কাহারও কুলবধূ বা কন্যার প্রথম ঋতু হইলে মহারাজা উপাধিধারী গুরুর দ্বারা উচ্ছিষ্ট না করাইয়া তাহার স্বামী সকাশে পাঠাইতে পারে না, পাঠাইলে "পতিত" ও সমাজচ্যুত হইবে।

২য়। বাটীতে যে কোন স্ত্রীলোক প্রথম ঋতুমতী :হইবে, তাহার সম্বন্ধে ঐ নিয়ম।

৩য়। গুরু মহারাজা যে কোনও সময়ে যে কোনও সধবা স্ত্রীলোককে ডাকাইয়া পাঠাইবেন, তখনই তাহাকে গুরুর বিলাস গৃহের শয্যায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৪র্থ। গুরু মহারাজা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং স্ত্রীলোকমাত্রেই তাঁহার গোপীকা, ইহা বিশ্বাস না করিলে মুক্তি নাই।

৫ম। গুরু মহারাজা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারেন, তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীকে সাক্ষাৎ "রাধিকা" বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। গুরুর সহিত মৈথুন সদ্যোমুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

৭ম। গুরুকে অদেয় কিছুই নাই।

৮ম। গুরুর সকল অভাব মোচন করা শিষ্যের ধর্ম্ম।

৯ম। গুরুকে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা "তন্" "মন্" ও "ধন্" সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত হইবে। ইত্যাদি।

রাস, দোল ও ঝুলনার সময়, ভারতের যে যে স্থানে বল্লভকুলী মন্দির আছে, সেখানকার অশ্লীলতা, অপবিত্রতা ও পাশবতার চূড়ান্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া চারিদিকে গোলাকারে সারি দিয়া দাঁড়ায়, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীমহারাজা দণ্ডায়মান হয়েন, তাহার পরে যাহা হয়, তাহা আর না লিখিলেই ভাল। কচ্ছদেশের রেসিডেণ্ট্ কাপ্তেন ম্যাক্‌মর্ দো লিখিয়াছেন * "The most respectable families consider themselves honored by (Gooroo's) cohabiting with their wives and daughters. The principal Maharaj of Srinathdwar is a man worn to skeleton and shaking like a leaf, from debauchery of every kind. He is constantly in a state of intoxication from opium and other stimulants which the ingenuity of the sensual has discovered under the name and sanction of religion, this devil practices every kind of licentiousness."

বাস্তবিকই ক্রমাগত নেশা করিয়া আর দিন রাত্রি ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত থাকিয়া এই পাপিষ্ঠগণ তালপাতার মত কৃশ ও ভূতের মত কদাকার হইয়া যায়। অতি বাল্যকাল হইতে বালিকাদিগকে এই সকল পাপাত্মারা ধর্ম্মের নামে এই সকল পাপকার্য্য শিখাইয়া রাখে।

ইংরাজি ১৮৬২ অব্দে কর্ষাণদাস মূলজী নামে একজন বল্লভকুলী বৈষ্ণব ঘটনাচক্রে ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী আইনে সুন্দররূপে

---

* Transactions of the "Literary society of Bombay" (now the Bombay Branch of the R. A. Society) Vol. II. P. 230.

সুশিক্ষিত হইয়া এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করেন। তাহাতে মহাআন্দোলনকারী মোকর্দ্দমার সৃষ্টি হয় এবং হাইকোর্টে পর্য্যন্ত এই মোকর্দ্দমা উঠিয়াছিল। মুলজী মহাশয় এই মোকর্দ্দমায় জয়-লাভ করেন বটে, কিন্তু কুপ্রথাগুলি তখন যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনি আছে। এই মোকর্দ্দমার মহা বিস্তৃত বিবরণ বৃহৎ পুস্তকা-কারে বিলাতে ছাপা হইয়াছে, উহার মূল্য দশ টাকা এবং উহাতে প্রায় বিংশতিটি চিত্র আছে। এই পুস্তকের নাম History of the sect of the Maharajas by Messrs. Trubner & co. (London) 1865. তদ্ভিন্ন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক মালাবারী মহাশয়ের Gujerat and the Gujeratees (B. M. Malabari. Spectators Press. Bombay) নামক প্রখ্যাত পুস্তক পাঠ করিলে এই মহারাজাদিগের বিবরণ জানিতে পারিবেন। বোম্বাই হাইকোর্টে যে বৎসর এই মোকর্দ্দমা উঠিয়াছিল, সে বৎসর সার মাথু সসে মহোদয় (Sir Mathew Saucesse) চিফ্ জষ্টিস্ ছিলেন, তিনি মুলজীর মোকর্দ্দমার রায় লিখেন, ঐ রায় আমি আদ্যন্ত দেখিয়াছি, বাহুল্য ভয়ে উহার সামান্য মাত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

"The Maharajas make their disciples believe that the best way of propitiating Krisna in heaven is by ministering to the sensual appetites of the priests. Women are taught to believe that the highest bliss will be secured to themselves and their families by intercourse with the Maharajas. * * * The Maharajas have been sedulous in identifying themselves with the God Krisna by means of their own writings and teachings and the similarity of

ceremonies of worship and addresses which they require to be offered to themselves by their followers. All songs connected with the god Krisna, which were brought before us, were of an amorous character, and it appeared that songs of a corrupting and licentious tendency, both in ideas and expression, were sung by young females to the Maharajas, upon festive occasions, in which they are identified with the God in his most licentious aspect. In these songs, as well as stories, both written and traditional, the subject of sensual intercourse is most prominent. Adultery is made familiar to the minds of all ; it is nowhere discouraged or denounced ; but, on the contrary, some of the stories, those persons who have committed the great moral and social offences are commended." এখন বুঝিলেন কি, শ্রীনাথদ্বার বাস্তবিক জগতে এক অদ্ভুত স্থান কি না ? ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, ভগবানের নামে, আমাদের হিন্দুভাই এখানে সয়তানের কার্য্য করেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ।

বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্মচিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে কোনও কথা লিখিতে বা বলিতে হইলে, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী প্রাচীন নবদ্বীপের কথা মনে হয়। বাঙ্গালী জাতির উন্নতির ইতিহাসের সহিত প্রাচীন নবদ্বীপের ইতিহাস এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযোজিত যে, নবদ্বীপের নাম উহ্য রাখিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির বিস্তৃত বিবৃতি দেওয়া কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের অথবা বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস নাই; সমগ্র বাঙ্গালা দেশের কেন, বঙ্গের কোনও জেলারই বিস্তৃত ও প্রকৃত ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহাও দক্ষিণ কেন্দ্রের তুষারাবৃত জলজ শৈবালপ্রসূনের ন্যায় অপরিস্ফুট এবং অপরিস্কৃত, সুতরাং নবদ্বীপের ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবার অভিপ্রায় আমার নাই। নবদ্বীপ, বাঙ্গালী জাতির বিদ্যা শিক্ষার প্রসূতি; নবদ্বীপ, বাঙ্গালা দেশের জ্ঞানের আকর; নবদ্বীপ, ধীশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী জাতির মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণ মেধা। সমগ্র বঙ্গের অথবা সমগ্র ভারতের কেন, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে প্রাচীন নবদ্বীপ মহাগৌরবের লীলাস্থল! আফ্রিকার আল্ অজ্‌হর্, গ্রীশের এথিনিয়া (Athenia), বিলাতের অক্‌স্‌ফোর্ড বা কেম্ব্রিজ, ইটালীর ভ্যাটিকান্ (Vatican), স্পেনের এশ্‌কুয়েল, জর্ম্মণির লাইপজীগ্ অথবা ভারতমধ্যস্থিত কাশীধামের কুইন্‌স্ কলেজ কিম্বা আলিগড়ের আংগ্লো ওরিয়েন্টল মহম্মদীয় কলেজ যদি পৃথিবীর বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের

সুশিক্ষার গৌরবস্থল হয়, তাহা হইলে এই সকলের একত্রিত গৌরব অপেক্ষা প্রাচীন নবদ্বীপ অধিকতর গৌরবময় ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার অণুমাত্রও কারণ নাই। কিন্তু আমরা যে নবদ্বীপের কথা বলিতেছি, তাহা দ্বিতীয় যুগের নবদ্বীপ। এস্থলে "যুগ" শব্দের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। নবদ্বীপের আদি ইতিহাস অবশ্যই অজ্ঞাত; 'নবদ্বীপ' বলিলে কোনও নূতন দ্বীপ বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ আছে, কারণ এই 'নব' বা 'নূতন' শব্দের প্রকৃত অর্থ করিতে হইলে নব শব্দের অর্থ 'প্রাচীন' হইয়া পড়ে। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগ বর্ত্তমান যুগ নহে, অথবা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরবর্ত্তী সময়ের কথা বলিতেছি না। দ্বিতীয় যুগ অর্থে, চৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়কে বুঝিতে হইবে।

"চৈতন্যভাগবৎ"কার লিখিয়াছেন, "নবদ্বীপের একটি ঘাটে সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দশম ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রতিদিন গড়ে সার্দ্ধেক লক্ষ লোক স্নান করিত; গঙ্গাপূজা বা "গ্রহণ" অথবা অন্য কোনও উৎসবের সময়ে প্রায় একবিংশতি প্রধান প্রধান ঘাটে চতুর্দ্দশ লক্ষ লোক স্নান করিয়াছে, ইহা দেখা গিয়াছে।" গৌড়ের হিন্দু রাজা সুবুদ্ধি রায় এবং তৎপরবর্ত্তী মুসলমান নরপতি হোসেন সা (খৃষ্টীয় ১৪৯৮) মহাশয়দিগের সমসাময়িক গ্রন্থাবলীতে এ কথার প্রমাণ আছে। হণ্টার সাহেব বলেন, বর্ত্তমান কলিকাতার লোকসংখ্যা অপেক্ষা সে সময়ের নবদ্বীপের লোক-সংখ্যা চতুর্গুণ অধিক ছিল। নবদ্বীপ কোনও সময়ে সমগ্র বঙ্গের রাজধানী ছিল না, অথবা বাণিজ্য বা ব্যবসার জন্য ইহা কখনও প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই—It was famous as a seat of learning, in that respect the most famous city in the world. সমগ্র নগরে 'শিক্ষা' 'শিক্ষা' ভিন্ন আর কোনও চিৎকার শুনা যাইত না। নৌকায়

নাবিক, রাজবর্ত্মের বিপণিকার, নৃত্যকারিণী অভিসারিণী অথবা ক্রীড়াশীল বালক, যাহাকেই দেখ, সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা সকলেরই মুখে শুনিতে পাইবে। গল্পে, তামাসায়, বিবাদে, বিসম্বাদে, হাস্যে, কৌতুকে, সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্যমান হইত। সামান্য সামান্য জাতির অশিক্ষিত লোকদিগের মুখেও কথায় কথায় সংস্কৃত শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যাইত। জনৈক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "The one absorbing idea was the acquisition of knowledge. The old and the young, among the higher classes, were constantly engaged in intellectual pursuits, as if there was no other business in the world." ধনলাভের চেষ্টা, রাজনীতির চর্চ্চা, যুদ্ধের সমাচার অথবা মুসলমান শাসনের দোষ গুণ নবদ্বীপবাসীদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিত না; 'শিক্ষা' ভিন্ন অন্য কোনও কথা যেন তাঁহাদের অভিধানে ছিল না বলিয়া বোধ হয়। চাকুরী করা, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণের পক্ষে নর-পুরীষাপেক্ষা ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত। সুরাপান মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং সে সময়ে নবদ্বীপ নগরে অথবা ইহার পঞ্চক্রোশ মধ্যে সুরার দোকান ছিল না। জনৈক বৈষ্ণব সুলেখক লিখিয়াছেন "The Pundits and students of Nuddea had such an aversion for sensual pleasures that no liquor shop was permitted to be established in the city." টমাশ কার্লাইল বলেন, "Morality as regards study is, as in all other things the primary consideration, and overrules all others." কথাটি সত্য এবং সারগর্ভ; নবদ্বীপের শিক্ষক ও ছাত্র নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান ছিলেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। "কুকুরে এবং চাকরে সমান," এই প্রাচীন প্রবাদ নবদ্বীপের টোলের শিক্ষিত ছাত্রেরাই প্রথমে উচ্চারণ করেন, ক্রমে রূপসনাতন সে কথার জ্বলন্ত

ও জীবন্ত কার্য্যকারীতা দেখাইয়াছিলেন। নবদ্বীপের ছাত্রের স্বাধীনতা-প্রিয়তা খুব প্রশংসনীয়।

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের মতে, জ্ঞানই কর্ম্ম, জ্ঞানই ধর্ম্ম এবং জ্ঞানই মোক্ষ। জ্ঞানলাভ করা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও চরম উদ্দেশ্য, ইহাই পণ্ডিতদিগের অভিমতি। বালকেরা চতুর্থ বৎসর বয়ক্রমকালে শিক্ষা-মন্দিরে প্রেরিত হইত এবং কিছু শিখিতে সক্ষম না হইলেও পাঠার্থী-দিগের সহিত বসিয়া থাকিত, ইহাতে অতি শিশুকাল হইতে বালকের শিক্ষার প্রবৃত্তি সমূহ প্রবলা হইয়া উঠিত; এখন যাহাকে 'ডিশিপ্লিন' বলে, তাহাও শিশুরা ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিত। সৌন্দর্য্য, বেশভূষা, ধন সম্পত্তি, উচ্চপদ, ক্ষমতা, প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি ছিল না, কেবল চতুর্দ্দিকে 'শিক্ষা' ভিন্ন আর কিছুই দৃশ্য হইত না। নামাবলী গায়ে দিয়া, নগ্নপদে, নগ্নশিরে, সামান্য দেশী ধূতী পরিয়া, বাহ্যাড়ম্বের চিহ্নমাত্র না রাখিয়া, শিক্ষকেরা অধ্যাপনা করিতে আসিতেন এবং বিদ্যার্থীরা খোলা গায়ে অধ্যয়ন করিতে আসিত। পিতারা ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিত, "ভগবন! দয়াময়! দেখ যেন আমার সন্তানটি শিক্ষিত হয়"; স্নেহময়ী জননী মহাশয়া জগদম্বার দিকে চাহিয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "দেখ মা! অভয়ে! আমার কন্যাটি যেন শিক্ষিত যুবার হাতে অর্পিত হয়।"

পণ্ডিতেরা নানা উপায়ে প্রতিপালিত হইত, সুতরাং অন্নবস্ত্রের চিন্তা কাহারও ছিল না। গুণগ্রাহী এবং বিদ্যোৎসাহীকে উৎসাহ দেওয়া সেকালের ধনবান গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম ছিল। সাধুর সেবা, ভগবানের পূজা এবং পণ্ডিতের প্রতিপালন, সেকালে হিন্দুগৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। মুসলমানেরাও হিন্দু পণ্ডিতদিগকে সাহায্য করিতেন। মুসলমানেরা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সময়ে

সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেকালের পণ্ডিতকে দেখিলে, হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই সম্মান করিত। বিদ্যা-চর্চ্চা জন্য সেকালের নবদ্বীপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অসংখ্যাসংখ্য ছাত্র ও অসংখ্যাসংখ্য শিক্ষকের বাটীর সম্মুখে তখন "বিদ্যাই ধর্ম্ম" "বিদ্যাই কর্ম্ম" "জ্ঞান হইতেই মোক্ষ" প্রভৃতি কথা লেখা থাকিত। হিন্দুদের দেখা দেখি মুসলমান মৌলবী-গণও তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে, পারস্যকবি সেখ সাদির বিরচিত ;

"বে-য়েলেম্ না তোঁয়া খোদা রা সনাক্‌ৎ"।

কবিতা লিখিয়া রাখিতেন। হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাজারে, সর্ব্বত্র বিদ্যার্থী দেখা যাইত। সভা-সমিতি প্রভৃতির অভাব ছিল না; ন্যায়ের কচ্‌কচি, বেদান্তের বক্‌বকী, ব্যাকরণের বিতণ্ডা, দর্শনের দলাদলি, এ সকল নিত্যকর্ম্ম ছিল। যেখানেই যাও, টুলো পণ্ডিতদিগের অথবা তাঁহাদের ছাত্রদের কিম্বা তৎপক্ষীয় লোকদিগের বিচারের ও বিতর্কের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। পণ্ডিতদের দলাদলি লইয়া প্রায়ই হাতাহাতি লড়াই পর্য্যন্ত হইয়া যাইত ; অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, পণ্ডিত বা তাঁহাদের শিষ্যদিগের আত্মম্ভরীতা এবং অধৈর্য্য অনেক সময়ে তাঁহাদের অপ্রশংসার কারণ ছিল। ঘাটে স্নান করিতে গিয়া টোলের বিদ্যার্থীরা শাস্ত্র লইয়া এমন বাদানুবাদ করিত যে, কোনও কোনও সময়ে পরাজিত সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়া গোপনে সন্তরণ দ্বারা ভাগীরথী অতিক্রম করতঃ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইত। "চৈতন্যভাগবত"কার লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতামহের সময়ে, নবদ্বীপে সাত শত টোল ছিল। বৃন্দাবন কুঠার স্বচক্ষে টোল দেখিয়া লিখিয়াছেন, "প্রতি দিনে নানা দেশ হইতে সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীকে নবদ্বীপে আসিতে ও পড়িতে দেখিয়াছি। সহস্র সহস্র লোক, অন্যস্থানে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া নবদ্বীপে

পরীক্ষা দিতে আসিত। নবদ্বীপে না আসিলে কাহারও লেখাপড়ার শেষ হইত না।" নবদ্বীপের বর্ণনা করিতে গিয়া জনৈক লেখক লিখিয়াছেন,'Thousands came to the city from all parts of India, some to begin and some to finish their education, and thousands left every day after having obtained their diplomas, The student who had been educated as far as possible elsewhere, felt bound to come to Nabadwip to complete his education and obtain a diploma, without which he could not hope to attain to any considerable status in society."

কেহ পণ্ডিতদিগের সাক্ষাৎ করিতে বা বিচার করিতে আসিত, কেহ বা বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষা-প্রণালী দেখিতে আসিত, কেহ বা কোনও দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য নবদ্বীপে উপনীত হইত অথবা কেহ বা তাহার বিদ্যার্থী পুত্রকে দেখিবার জন্য আগমন করিত। এইরূপে নবদ্বীপে নানা কারণে বহুলোকের সমাগম হইত; ভাদ্রের তরঙ্গভরা ভাগীরথীর ন্যায় নবদ্বীপ নগর লোকে ভরা থাকিত। প্রত্যেক গলিতে টোলের অস্তিত্ব ছিল। ছাত্রদের নিকট হইতে ফিজ্ স্বরূপে অর্থ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল না। কেহ লেখাপড়া শিখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে তাহাকে লেখাপড়া না শিখাইলে মহা অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। টোলের ছাত্রদিগকে পণ্ডিতেরা বিনা বেতনে পড়াইতেন এবং অনেক ছাত্রকে খাইতেও দিতেন। যে টোলে অধ্যাপকের সংখ্যা অধিক থাকিত না, বড় বড় ছাত্রেরা ছোট ছোট ছাত্রদিগকে অবকাশ মত পড়াইয়া দিত।

কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, বেদান্ত, উপনিষদ, ত্রিবেদ এই সকল

বিষয়ের আলোচনা অধিকতর রূপে সে কালের নবদ্বীপের টোলসমূহে দেখা যাইত। ন্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত তখনও হয় নাই। বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিখিয়া আসিতেন এবং সেই জন্য মিথিলাবাসীদিগকে 'গুরু' বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। মিথিলার পণ্ডিতেরা বাঙ্গালীর অসাধারণ ধীশক্তি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "বাঙ্গালী জাতিকে সকল বিষয়েই অসাধারণ পণ্ডিত দেখিতেছি কিন্তু তাহাদের দেশে ন্যায় শাস্ত্র নাই। ন্যায় আমাদের হাতে থাকুক, তাহা হইলে উহারা আমাদের নিকটে শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকিবে।" এই সময়ে নবদ্বীপে পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন, কিন্তু ন্যায়ের গ্রন্থ না থাকায় মুখে মুখে ন্যায়ের সূত্র সামান্যরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যার্থী মিথিলায় গিয়া ন্যায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম শ্লোকের প্রথম অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সূত্রের শেষ শ্লোক পর্য্যন্ত এমন আশ্চর্য্যরূপে মুখস্থ করিয়া লইলেন যে, নবদ্বীপে আসিয়া তাহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা জন্য এক প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক টোল-স্থাপন করেন। একজন লেখক লিখিয়াছেন, "This almost superhuman feat of Basudev Sarvavowm immortalised his fame." এই বিদ্যার্থী বাসুদেব পরিশেষে কেবল বঙ্গের নহে, কেবল ভারতের নহে, সমগ্র জগতের মধ্যে একজন অনন্যসাধারণ মহাপ্রাজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের "ন্যায় শাস্ত্র" শিক্ষা করিয়া মিথিলা হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে "চিন্তামণি" নামে প্রকাণ্ড নৈয়ায়িক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদনন্তর রঘুনন্দন এই ন্যায় হইতে

জগদ্বিখ্যাত "দীধিতি" গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রশাস্ত্রও এই এই দীধিতির ফলস্বরূপ। রঘুনন্দনের গ্রন্থ ২৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। Didheeti is perhaps the subtlest book that has ever been produced in any language. Raghunandan's code of laws is regarded as the highest authority in Bengal. The works which the professors of Sarvavowm's college have left behind them excite the wonder of mankind"—Babu Sisir Kumar Ghosh (A. B. Patrika)

সার্ব্বভৌমের যশোরাশি যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া উঠিল, তখন পুণা, কাশী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা নবদ্বীপে ন্যায় পড়িতে আসিতে লাগিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে লইয়া গিয়া পুরীধামে এক প্রকাণ্ড টোল স্থাপন করেন। সার্ব্বভৌমের বিহনে নবদ্বীপের রবি ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার বিদ্যালয়ে যে সকল জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যার্থীরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেশব ভারতী অন্যতম। মহাত্মা কেশব ভারতীর পিতা নবদ্বীপের একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। কেশবভারতী নানা বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন, সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাধবেন্দ্র পুরী কেশব ভারতীর সহাধ্যায়ী। সার্ব্বভৌমের শিক্ষা-মন্দিরে জগন্নাথ মিশ্র নামে শ্রীহট্ট দেশীয় এক ব্রাহ্মণ ছাত্র পাঠ করিতেন, ক্রমে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হয়েন; এই জগন্নাথ মিশ্র মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পিতা। এই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবও বিদ্যার্থী ছিলেন এবং নবদ্বীপে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। এখন নবদ্বীপ আর সে নবদ্বীপ নহে. এখন সেখানে বাসুদেব সার্ব্বভৌম

নাই, কেশব ভারতী নাই, চৈতন্য প্রভুনাই;—আছে কেবল দলাদলি, ন্যাড়ানেড়ি এবং সময়-সেবক অর্থপিপাসু দলের কোলাহল।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সংযম-সামর্থ্য।

প্রাচীন হিন্দুর আধ্যাত্ম বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং আধ্যাত্ম বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপক্রমণিকা স্বরূপ ষড়দর্শন শাস্ত্র, মানবীয় জ্ঞানক্ষেত্রে অতি অপূর্ব্ব পদার্থ! কঠোর তপস্যা ও সাধন-প্রসূত আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং গভীর চিন্তা ও নিদিধ্যাসন প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান এই উভয় জ্ঞানের সমবায়ে যে মহান্ পরাবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রাতিভাষিক জ্ঞান হয়, নৈয়ায়িকদিগের মতে সেই জ্ঞানের উপযুক্ত সংজ্ঞা "ব্রহ্মজ্ঞান"; হিন্দুর ন্যায় (Logic) দর্শন ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানশাস্ত্রের মুমুক্ষ মুনিদিগের এবং জীবন্মুক্ত ঋষি-বর্গের প্রত্যাদিষ্ট প্রাড্‌বিবেকদিগের আলোচিত ও বিশ্লেষিত এই ব্রহ্মজ্ঞানের গভীর বিবেকপূর্ণ বিচার কি সুন্দর, কি চমৎকার! আবার আরও অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া যখন এই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুবর্ত্তিনী বৃত্তি সমূহের প্রকৃতিপুঞ্জের অসাধারণ শক্তি নিচয়কে সম্যক বুঝিতে পারি, যখন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর রূপে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া মনোবৃত্তি সমূহকে পরাবিদ্যোন্মুখিনী করিতে শিক্ষা করি, তখন দেখিতে পাই, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাতিভাবিক সত্তা আরও উচ্চতর স্থানে সম্প্রসারিত হইয়া সঙ্কীর্ণ ন্যায় ও দর্শনের চিন্তাসম্ভূত জ্ঞানকে তুচ্ছ করতঃ আর এক অপূর্ব্ব প্রকীর্ণ অন্তর্জাগতিক জ্ঞানে তন্ময় হইয়া পড়ে, সেই প্রকীর্ণ জ্ঞান

সর্ব্বদাই কার্য্যকরী (Active) এবং সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল (Practical) ভাবে পরিণত হয়, সেই জ্ঞানের কার্য্যকারী শক্তির নাম (দার্শনিক শাস্ত্র মতে) "যোগ"; বেদান্ত দর্শন মতে যোগ সদতই সকর্ম্মক, কখনও অকর্ম্মক নহে। হিন্দুর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানশাস্ত্র সমূহের সূত্র ও নীতি অনুসারে বিচার করিলে জানিতে পারি, যোগের প্রাথমিক অবস্থার পরিভাষা চিত্তবৃত্তির নিরোধ, দ্বিতীয় অবস্থার পরিভাষা অতিরিন্দ্রিয়িক প্রতীতি এবং তৃতীয় বা চরম অবস্থার ফল বা নাম তুরীয়াবস্থা, যাহার নামান্তর তন্ময়তা, বিশিষ্ট সুষুপ্তি, কৈবল্য মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ বা অক্ষয় পরমানন্দ। এই মুক্তি বা ব্রহ্মানন্দ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহাই প্রত্যেক সাধন ও সাধকের বিশিষ্ট "জ্ঞাপ্তি" অর্থাৎ চারমিক ঈপ্সা এবং ধ্যান ও ধারণা জনিত তত্ত্বজ্ঞানের সর্ব্বশেষ ফল। এই অবস্থায় উপনীত হইতে গেলে বেগবতী সর্ব্বতোমুখিনী চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, কারণ "চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধের নামই যোগ; অভ্যাস ও বৈরাগ্য ভিন্ন এই প্রমাথিনী চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় না।" (পাতঞ্জল।) এই বিপ্রকার্ষিত চিত্তসমূহকে সম্প্রসারিত করিয়া কেন্দ্রীভূতা করিতে পারিলে যে অপূর্ব্ব অমানুষিক সামর্থ্যের উদ্ভব হয়, তাহার নাম সংযম-সামর্থ্য, ইহারই অপর নাম ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তিকে বুঝিলে পর-ব্রহ্মকে বুঝা যায়, কারণ ব্রহ্মবিদ্যার মূলে ইচ্ছাশক্তি কারণের কারণ স্বরূপ—ভিত্তির ভিত্তি স্বরূপ—প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে, মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, সৈকতাবৃত ফল্গুনদের ন্যায় অথবা তৃণাচ্ছাদিত পৌলস্ত-বাণের ন্যায়, ইচ্ছাশক্তি অপূর্ব্ব অলৌকিক ক্রিয়া সমূহ নিষ্পাদনে সমর্থা হয়। ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ উৎকর্ষে সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, আবার ইচ্ছা-শক্তির অবনতিতে মনুষ্য ব্রহ্মানন্দ উপভোগে বঞ্চিত থাকেন, এই জন্য

সূক্ষ্মদর্শী বিবেকী হিন্দুর ন্যায়, দর্শন এবং আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে ইচ্ছা-শক্তিই সকল প্রকার যোগশক্তি, সকলপ্রকার অনুভূতি শক্তি, সকল-প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞান শক্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এই সংযম-সামর্থ্য, বা ইচ্ছাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপকরণ; চিত্তশুদ্ধি, সাধন এবং আত্মিক উন্নতির পথে ইচ্ছাশক্তিই আমাদের উপদেশক ও প্রদর্শক। ইচ্ছাশক্তিই বেদ ও পুরাণ এবং বাইবেল ও কোরাণের মূলমন্ত্র; বৌদ্ধ, পার্সী ও জৈনের ধর্ম্ম, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ইচ্ছাশক্তিই সুবর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা। যাহার ইচ্ছাশক্তিতে অভ্যাস বা বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়া কঠিন হইতেও কঠিনতর এবং সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যোগীরা এই ইচ্ছাশক্তিকে সংযম-সামর্থ্য এই সংজ্ঞা দিয়াছেন, কারণ ইচ্ছাশক্তি সংযমতার সন্ততি; সংযমে সামর্থ্য জন্মিলে যে অনির্ব্বচনীয় অমানুষিক শক্তি হয়, তাহারই বলে প্রকৃতির উপরে মানবের আধিপত্য জন্মে এবং তাহারই বলে জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষেরা অলৌলিকক্রিয়া সমূহ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে দুই একটি প্রয়োজনীয় দার্শনিক কথার সংক্ষেপে এই স্থলে আলোচনা করিব।

আমরা চারিদিকে যে সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, তত্ত্বচিন্তকগণের মতে, সে সমস্তই শক্তির রূপান্তর বা অবস্থান্তর মাত্র। পণ্ডিত আন্‌ড্র-জ্যাক্‌সন্ ডেভিস্ "ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ" এই ভূতচতুষ্টয়কে সূক্ষ্মতম অবিনশ্বর পদার্থের স্থূলতম পরিণতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অধ্যাপক টিণ্ডেলের শক্তিবাদ অনুসারে, ভৌতিক পদার্থমাত্রেই শক্তির বিভিন্ন রূপ, শক্তি হইতে পৃথগ্‌ভূত পদার্থ অপ্রসিদ্ধ ও সত্তা শূন্য অবস্তু মাত্র।

কিন্তু, এই শক্তি স্বরূপতঃ কি? ভৌতিক বিজ্ঞানের অভিমতে উহা গতি ও স্থিতির নিয়ামিকা বা নৈমিত্তিক কারণ (Efficient Cause)। অধ্যাপক টিণ্ডেল শক্তিকে কপিলের সাঙ্খ্য-শাস্ত্রোক্ত "প্রধান" নামক শক্তির ন্যায় চেতনাপরিশূন্য অন্ধশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু সংবিদ্‌তত্ত্ববিদ্গণের মতে, চৈতন্য ও শক্তি, জল ও তরঙ্গের ন্যায় "সম্পরিষক্ত" অর্থাৎ একতাপ্রাপ্ত। উহাদের একতর অন্যতর হইতে বিবিক্ত (distinguished) হইতে পারে বটে; কিন্তু কোনক্রমেই পৃথগ্‌ভূত (separated) হইবার নহে। এতন্মতে "অন্ধশক্তি" একটি স্ববিরোধী (self contradictory) শব্দ সমন্বয় মাত্র।

শক্তি, স্থূল ও সূক্ষ্ম, ভৌতিক ও অভৌতিক, বা অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ভেদে দুই প্রকার। অনন্ত আকাশ, বিচিত্র বহিরঙ্গা শক্তির জীবন্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ। এই বহিরঙ্গা শক্তিই, এক সময়ে, সুবিমল চন্দ্রালোকে নিরম্বুদ নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া অনুপম সৌন্দর্য্যে প্রাণ মন বিমোহিত করে; আবার পরক্ষণেই আকাশ ঘন-ঘটায় সমাচ্ছন্ন করিয়া অশনি নিপাতে ও বারিবর্ষণে দর্শককে ব্যাকুল ও সন্ত্রাসিত করিয়া তুলে।

অপর উন্নতমুখী আত্মা, অন্তরঙ্গা শক্তির যেন একটি জীবন্ত সমরপ্রাঙ্গণ। উহাতে অহর্নিশ কত শক্তি যে কত শক্তির উপর প্রতিদ্বন্দ্বী বল প্রসারিত করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত বিচিত্র শক্তির যে উদয় ও বিলয় ঘটিতেছে; পলকে পলকে কত প্রসুপ্ত শক্তিই জাগ্রত আর কত জাগ্রত শক্তি যে প্রসুপ্ত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? আর কেই বা তাহার ইয়ত্তা করিবে?

বিচিত্র বহিরঙ্গা শক্তি, পরমাণুপুঞ্জের অগ্র-পশ্চাৎ গতি সঞ্জাত করিয়া পদার্থ-বিশেষকে যেমন শব্দায়মান, তেজস্মান, আলোকময়

কিম্বা তড়িৎ সম্পন্ন করে, অন্তরঙ্গা শক্তিও তেমন মানুষের অন্তঃকরণকে কখনও উৎসাহে স্ফূর্ত্তিমান্ কখনও বা নৈরাশ্যে নিমজ্জমান, কখনও কার্য্যনিষ্ঠ এবং কখনও বা অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলে। ইহারই প্রভাবে মানুষ একবার ভাবলহরীতে আন্দোলিত হইয়া সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করেন, আবার পরক্ষণেই রোষকষায়িত লোচনে কম্পিত কলেবর হইতে থাকেন।

"Chaotic cosmic matter" নামক মৌলিক উপাদানকে যেমন প্রকৃতিবিৎ পণ্ডিত বহিরঙ্গা শক্তির মূলদেশে নিরীক্ষণ করেন, ইচ্ছাশক্তিকে ও অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিত তেমত অন্তরঙ্গা শক্তির মূল প্রস্রবণ রূপে দেখিতে পান। নৈয়ায়িকগণ এই ইচ্ছাশক্তিকে অন্তর্জ্জগতে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়া বলিয়াছেন—"ইচ্ছা হইতে কৃতি, কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া জন্মে।" যোগশাস্ত্রোক্ত "অনিমালঘিমাদি" অষ্টসিদ্ধির অন্তর্ভূত "প্রাকাম্যের" অভ্যন্তরে আমরা ইচ্ছাশক্তিরই প্রবল পরাক্রমের পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইচ্ছাশক্তির নিম্নতম বিকাশের অবস্থা বিশেষকে "Spontaniety of movement" এবং "Self-preservation" এই দুই নামে আখ্যাত করিয়াছেন। মিস কব্ ইচ্ছাশক্তি কার্য্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ইচ্ছা-সাপেক্ষ, (Voluntary) ইচ্ছানিরপেক্ষ, (Involuntary) ও ইচ্ছা-চলিত (Volitional)। ইহা জড়জগতে কিরূপে আপন প্রভাব বিস্তার করে, তৎসম্বন্ধে একজন ইংরেজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন :—

অগ্রে আমরা ইচ্ছা করি। অতঃপর ঐচ্ছিক স্নায়ুর অভ্যন্তরস্থ তাড়িত আলোড়িত হয়; আলোড়িত তাড়িত রক্তসঞ্চালনকারিণী ধমনীকে প্রকম্পিত করে; প্রকম্পিত ধমনী মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত

করে; সঙ্কুচিত মাংসপেশী বাহু উত্তোলন করে; উত্তোলিত বাহু অবশেষে ঈপ্সিত বস্তু আনয়ন করে।"

পদার্থের কিরন্ত অবস্থায় আবিষ্কর্ত্তা, ক্রুকস্ সাহেব এই ইচ্ছা শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় বলিয়াছেন—"মানবের এমন একটী শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে বিনা স্পর্শে কঠিন বস্তুর ভার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; না ছুঁইয়া কোন জিনিস নড়ান যাইতে পারে; না ধরিয়া ভারী জিনিস শূন্যে ঝুলান যাইতে পারে এবং প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত শব্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে।"

ফলতঃ অন্তর্জ্জাগতিক শক্তি সমূহের মধ্যে ইচ্ছাকেই অধিস্বামিনী-রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক ইহারই প্রভাবে জ্ঞানাহরণ ও কর্ম্মানুষ্ঠানে রত। ইহারই আদেশে স্মৃতিশক্তি সঞ্চালিত ও বুদ্ধিবৃত্তি সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সঙ্গতি-সন্ধানে নিয়োজিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ইচ্ছার দাসী; ইচ্ছার আদেশেই পরিচালিত ও পরিশাসিত। ইন্দ্রিয়গণ যখন শ্রেয়ঃ পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়-পথ আশ্রয় করে, তখন অন্তর-নিহিত শুভসংস্কাররূপ প্রস্তররাশি নিক্ষিপ্ত করিয়া কে তাহাদের গতি সংরুদ্ধ করে? রূপরসাদি বাহ্য-সৌন্দর্য্য যখন মোহন সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অন্তরাত্মাকে দাসত্বের বদ্ধ করিতে প্রয়াসী হয়, তখন কে বিবেক-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার অনিত্যের বন্ধন উন্মোচনে প্রবৃত্ত হয়? অহঙ্কারের অনুসঙ্গিনী জুগুপ্সা, যখন সাধু ব্যক্তির সাধু সংকল্পের উপরে দুরভিসন্ধির কালিমা সংমিশ্রিত করে, তখন কে অনুতাপের গভীর নির্ঘোষে প্রাণকে প্রকম্পিত ও সন্ত্রাসিত করিয়া তৎপ্রবৃত্তির শুভ সংকোচন করে? আর কেই বা উদীয়মান প্রবৃত্তির তমসাচ্ছন্ন প্রদেশে জ্ঞানের শুভ্র কিরণজাল বিকিরণ করে?

ইচ্ছাশক্তির ব্যাপ্তি ও বেগের বিষয় চিন্তা করিলে মন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়। জড়পদার্থের ব্যাপকতা আর কত ? আধ ছটাক জলযান বাষ্প, আধ ছটাক প্লাটিনম্ অপেক্ষা সার্দ্ধ দুই লক্ষগুণ অধিক পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকিতে পারে ; বিদ্যুৎ এক সেকেণ্ডে চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে ; আলোক কম্পন এক মুহূর্ত্তে এক লক্ষ ক্রোশ অতিবাহন করিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি প্রপঞ্চশীলতায় যেন জলযানের ব্যাপ্তি, এবং ক্ষিপ্রকারিতায় যেন আলোক-কম্পন ও বিদ্যুদ্বেগকেও পরাস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহা এক মুহূর্ত্তে মনকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পরিভ্রমণ করাইতে পারে। এক মুহূর্ত্তে তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি-শিখরের তরুণ অরুণের তরল-কাঞ্চন-কিরণ-শোভা সন্দর্শন করাইয়া, দ্যুলোকবিলম্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কৌমুদী-তরঙ্গ-ভঙ্গের সৌন্দর্য্য-উন্মাদে নিমগ্ন করিতে পারে। উহা এক মুহূর্ত্তে সংসারানল-সন্তপ্ত প্রবৃত্তি-প্রজুষ্ট প্রাণকে নিখিল প্রপঞ্চের আসক্তি-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া দেশ-কালাতীত সমশ্রুবান্ সত্তার হৃদয়-মোহনকারী পূর্ণ পবিত্রতার সৌন্দর্য্য বিলীন করিতে পারে। উহার ব্যাপ্তির কথা কি আর কহিব ? এমন ইন্দ্রিয়বোধ নাই, এমন প্রত্যক্ষ নাই, এমন অনুমান এমন উপলব্ধি নাই, যাহার মূলে উহাকে আদি কারণরূপে নির্ণীত করা না যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, মানবেচ্ছা সর্ব্বার্থসাধিনী। মানুষের অভিলষনীয় এমন কিছু নাই, যাহা উহার করায়ত্ত নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ উহারই অধিকৃত সম্পদ্।

আবার অন্তদিকে দেখিতে গেলে, উহার ন্যায় ভীষণ বৈরী আর দ্বিতীয় সম্ভবে না। ভূমণ্ডলে যত সমরানল প্রজ্জলিত হইয়াছে, যত রোমহর্ষণ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে, নর-রুধির-ধারায় যত সমরপ্রাঙ্গণ প্লাবিত হইয়াছে, তন্মূলে আমরা উহারই অব্যর্থ সন্ধান

ও ফলোপধায়িনী চেষ্টার চিহ্ন দেখিতে পাই। ভ্রমগুণে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ন্যায় মহাবীর বোধ হয় আর জন্মে নাই। সিজর, হানিবল, ও আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি বীরগণের প্রতিপত্তি প্রসারণের পথ, তাঁহাদিগের অভিভাবক ও অপরাপর ব্যক্তিগণ অনাবৃত করিয়া যান। কিন্তু নেপোলিয়নের পক্ষে সেইরূপ সুযোগ সম্ভাবিত হয় নাই। ইনি সামান্য বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একমাত্র ইচ্ছা-শক্তি-সঞ্চালনেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ইউরোপখণ্ডে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। কি স্থিরনিশ্চয়তা, কি ধ্রুবেচ্ছতা, কি বুদ্ধি-পরিচালনা, কি বহুজাতির প্রতিকূলে শক্তি-সঞ্চালন ইত্যাদি বিষয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও জিগীষাবৃত্তির সমধিক প্রবলতা হেতু ইঁহার জীবনে কি শোচনীয় পরিণামই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল!

ইচ্ছাশক্তির সমীচীন স্বাধীনতা সম্ভাবিত কি না, এ কূটপ্রশ্ন লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে যুগ-যুগান্তর হইতে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ ইচ্ছাশক্তির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্বীকার করিয়াও উহাকে স্বর্ণশৃঙ্খলপরিহিতা পিঞ্জররুদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় পরাধীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই :—জাগতিক পদার্থের ন্যায় ইচ্ছাশক্তিও কার্য্য-কারণ-তত্ত্বের অধীন। প্রবৃত্তি যেমন প্রতিকূল কারণে সঙ্কুচিত এবং অনুকূল কারণে প্রসারিত হয়, ইচ্ছাশক্তির আকুঞ্চন-প্রসারণও তদ্রূপ নিয়ম-তন্ত্রের অধীন। পরন্তু, ইহাদের প্রতিযোগিগণ বলেন, ইচ্ছা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার অতীত। অনুকূল বা প্রতিকূল কারণ, ইহাকে কেন্দ্র-ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ নহে। ইহা সম্মানের কারণ সত্ত্বেও মানুষকে প্রহৃষ্ট করে না এবং অপমানের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তঃকরণকে বিষাদে বিষণ্ণ করে না। ইহা, বিজয়ীর

জয়োল্লাসে, বালকের সুধাময় হাস্যে, শোক দুঃখের নিদারুণ কশাঘাতে, প্রণয়াস্পদের সুখময় প্রেমালিঙ্গনে অন্তঃকরণকে সমভাবাপন্ন করিয়া রাখিতে পারে। এই ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতাই মানব মহত্বের প্রধানতম কারণ। স্বাধীনতা আছে বলিয়াই মানুষের অন্তরে গভীর দায়িত্ব বোধ বর্ত্তমান। ইহার ঐকান্তিক অসদ্ভাব হইলে, মনুষ্যে আর প্রস্তরে কোনই ইতর-বিশেষ থাকিত না।

ফলতঃ এই ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসকারী ব্যক্তিগণই পর্ব্বত-সমান বাধাবিঘ্নকে বজ্রবলে বিদূরিত করিয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়েন। এই জীবন্ত বিশ্বাসের প্রবল পরাক্রমেই ফোষ্টার সাহেব কলিকাতা হইতে সুদূর সেণ্টপিটার্স্বর্গ নগরে স্থলপথে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জীবন্ত-বিশ্বাসই নেপোলিয়নকে নীহার-মণ্ডিত আল্পস্ পর্ব্বতের সঙ্কীর্ণ বর্ত্মভেদ করিয়া অষ্ট্রীয়া-সমরে বিজয়-নিশান উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ করিয়াছিল। গ্যারিবল্ডীর-পরোপকার স্পৃহা, ও ম্যাটসিনীর স্বদেশ-প্রাণতার মূলেও আমরা উহারই সজীব প্রভাব সন্দর্শন করি। এই তীব্র সংবেগশালিনী ইচ্ছাশক্তিই একদিন ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনীবৃত্তি বিস্ফুরিত করিয়া প্রাচীন ভারতে প্রবল পরাক্রমে কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগণ, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ, সোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ, গোবিন্দ ভগবৎপাদাচার্য্য গোবিন্দনায়ক, চর্ব্বটি, কপিল, ব্যালি, কাপালি, কন্দলায়ন প্রভৃতি সিদ্ধগণের প্রাণকে পরম-পুরুষার্থ-সাধন-মন্দিরে সিদ্ধাসনে সমাসীন করিয়াছিল। রাজর্ষি অম্বরীষ, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি পর্ব্বত প্রভৃতি পরম ভক্তগণ, এই ইচ্ছাশক্তির প্রবলত্ব সত্বাতেই অনন্তশীর্ষা প্রবৃত্তির মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, সেই অতীন্দ্রিয় সুন্দরের অনবদ্য মহিমা পরমানন্দে পরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যে কোনও ধর্ম্মই বল, ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য অকাট্য বা অখণ্ড সুখ, শাস্ত্রকারেরা এই অখণ্ড সুখকে ব্রহ্মানন্দ বা অব্যয় পরমানন্দ এই গৌর-বান্বিত সংজ্ঞায় সম্মানিত করিয়াছেন। বেদান্তীদিগের মতে অভাবের পূরণের নাম সুখ, নৈয়ায়িকদিগের মতে অভাবের নাশ বা বিনাশের নাম সুখ। ন্যায় ও দর্শনে ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া এই মহাপ্রভেদ!! অভাব পূরণের বৃত্তির নামই চেষ্টা, কিন্তু "নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয়" ব্যক্তিই ন্যায়শাস্ত্রে যথার্থ পরব্রহ্মের উপাসক ও যথার্থ ব্রহ্মানন্দের ভোগী। নৈয়ায়িকের মত পরিস্ফুটতর ও সুন্দরতর বলিয়া বোধ হয়। অভাবের (Demands) যত হ্রাসতা হয়, ততই চেষ্টার হ্রাসতা হয়, চেষ্টার হ্রাসতায় দুঃখের অবসাদের হ্রাসতা হয়, চেষ্টার হ্রাসতায় মনুষ্য কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানকে আশ্রয় করে এবং তত্ত্বজ্ঞানের পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়। পবিত্রতা, সাধুতা, সরলতা, সৌজন্যতা, ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণ, সুতরাং এইগুলির অভাবে ধর্ম্মসাধন হয় না, এই গুলির পরিণতি (Culture) জন্য প্রবলা ইচ্ছাশক্তি বা সংযম সামর্থ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। সংযত পুরুষই "পুরুষ ব্যাঘ্র", যাঁহার সংযম-সামর্থ্য-জন্মিয়াছে তিনিই ধার্ম্মিক। এই সংযম সামর্থ্য বা ইচ্ছা-শক্তিই সকল সুখ, সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। হিন্দুর এই সংযম সামর্থ্য জগতের ইতিহাসে প্রবাদ বাক্য রূপে প্রথিত; আবার কি সংযম সামর্থ্যে ভারতকে উন্নত দেখিতে পাইব? ধর্ম্মবলই প্রকৃত বল, সংযম সামর্থ্যই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপাদান। এই সামর্থ্য হইতে সকল সামর্থ উদ্ভুত হয়,ইহা ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির বিধায়িকা। ভাই হিন্দু! আইস আমরা আবার আমাদের প্রাচীন আর্য্য পিতৃ পুরুষদিগের ন্যায় সংযম-সামর্থ্য শিক্ষা করিয়া ইচ্ছাশক্তি বলে ইহলোকে সংসারকে আনন্দাগারে পরিণত করি এবং পরলোকে অব্যয়

অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া সেই "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পরমানন্দ ভোগ করি।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বাবা ব্রহ্মানন্দ।

মধ্যভারত প্রদেশে আসীরগড় নামে এক প্রসিদ্ধ, প্রাচীন ও প্রশস্ত দুর্গ আছে, এই দুর্গ অনেক বৎসর কাল ব্যাপিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, এক্ষণে বৃটিশরাজ ইহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী ও অধিকর্ত্তা। বড় বড় রাজা ও নবাবেরা রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডযোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, এই দুর্গে কারারুদ্ধ হয়েন। আসীরগড় (Asseergarh) পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। এই পাহাড়ের তলদেশে, ময়দানের উপরে, ছোট বনের পার্শ্বে, এক হিন্দু সাধু অবস্থান করিতেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দের "ধুনীতে" চব্বিশ ঘণ্টাই সমভাবে আগুন জ্বলিত। এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাসম্পন্ন সাধু বনের ভিতর হইতে বড় বড় বিষাক্ত সর্প ধরিয়া আনিয়া, তাহাদের বিষপান করিতেন, ছোট ছোট চিতা বাঘ ধরিয়া আনিয়া ধুনীর পার্শ্বে বসাইয়া রাখিতেন, বিপুলবপু বৃষদিগের পা ধরিয়া শূন্যে উঠাইতে পারিতেন এবং অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থ মহীরুহের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অবলীলাক্রমে ভূমিতলে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পথিকবর্গকে চমৎকৃত করিতেন। বর্ষার জলে, মাঘের শীতে অথবা জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাঁহাকে কেহ উদ্বেলিত হইতে দেখে নাই।

তিনি কখন প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে দাঁড়াইয়া তপশ্চারণ করিতেন, কখন তিনি চারি ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া বেদাবৃত্তি করিতেন, কখন বা পাহাড়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পক্ষাধিক কাল পর্য্যন্ত অদৃশ্য থাকিতেন। দুর্গ মধ্যে যে সকল ইংরাজ সেনা থাকিত তাহাদের কাপ্তেন ও কর্ণেলেরা বাবা ব্রহ্মানন্দকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার ধূনীর কেবল ভস্ম ব্যবহার করিয়া অনেক গোরা সৈনিক উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বাবা ব্রহ্মানন্দের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া নানা স্থান হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল, ব্রহ্মানন্দ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আসিরগড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। গোয়ালিয়র প্রদেশে মন্দেশ্বর নামে একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর আছে, ইহার চারিদিকে পাথরের উচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে ক্ষুদ্র নদী। এই নদীর ধারে একটি তিন্তিড়ি (তেঁতুল) বৃক্ষ ছিল (উহা এখনও আছে) এই বৃক্ষের তলে সাধুজী উপবেশন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একখানি ব্যাঘ্র চর্ম্ম, লৌহ নির্ম্মিত একটী যষ্ঠি এবং মৃত মানুষের মাথার খুলী নির্ম্মিত একটি জলপাত্র ছিল। মন্দেশ্বরের অপর নাম "মন্‌সোর" (Man-Saur) এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, ইহা ইণ্ডিয়ান মিড্‌লাণ্ড্‌ রেলওয়ে লাইনের উপরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে সহর দেড় মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। মন্দেশ্বরের অধিবাসীরা বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত পরম বৈষ্ণব। সহরের হিন্দু ও জৈন সকলেই নিরামিষাশী। প্রধান প্রধান লোক মাত্রেই আমিষ ভক্ষণের সম্পূর্ণ বিরোধী, অধিক কি, নদীতে কেহ মাছ ধরিলে তাহাকেও শাস্তি দিবার জন্য ইহাদের একটা দেশীয় আইন আছে। এখানে মৎস্য বা মাংস

কেহ খায়না এবং প্রকাশ্য ভাবে কেহ তাহা বিক্রয়ও করিতে পারে না। সুরাপানেরও দোষ এখানে নাই বলিলেই হয়। আমি যে সাধুর কথা লিখিতেছি, ইনি ঘোরতর তান্ত্রিক, সুতরাং মদ্যপান এবং মৎস্য ও মাংস ভক্ষণে ইনি অতিশয় অভ্যস্ত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন গাঁজা, আফিং, চরশ, সিদ্ধি এবং তামাকু প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। আহার করিতে বসিলে একজন প্রকাণ্ড পঞ্জাবী পালোয়ানের দুই বেলার খোরাক তিনি এক বেলাতেই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতেন, অথচ কোনও দিনে কোনও দ্রব্যেরই তাঁহার অভাব ছিল না। শাস্ত্রকারেরা বলেন, "মহাপুরুষদিগের কি কখনও অভাব থাকে? যিনি প্রকৃত মহাপুরুষীয় পথে পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কোনও বিষয়ে বাস্তবিক আসক্তি নাই, তাঁহার প্রকাশ্য আসক্তি প্রকৃত আসক্তি নহে, ইহা পদ্মপত্রে বারির ন্যায় নির্লিপ্তিব্যঞ্জক ভাব মাত্র।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দেশ্বরের ছোটনদীর ধারে তিন্তিড়ি বৃক্ষের তলে বাবা ব্রহ্মানন্দ একাকী থাকিতেন, তাঁহার সেখানে আগমনের কথা কেহ জানিত না। নদীর ধারে লোকের বসতি ছিল না, (এখনও নাই) সুতরাং লোকের যাতায়াত প্রায়ই দেখা যাইত না। নদীতে কদাপি কেহ স্নান করিতে আসিলে বাবাকে দেখিতে পাইত বটে, কিন্তু তাঁহাকে সুরাপান ও মাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়া দর্শকগণ ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া লইত এবং তাঁহাকে ম্লেচ্ছাচারী ইতর লোক ভাবিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিত না। ক্রমে ক্রমে সহরের লোক জানিতে পারিল, একজন গৈরিকবসনধারী সাধু নদীর ধারে মাংস পাক করে, মড়ার মাথার খুলীতে মদ খায় এবং নদীর মাছ ধরিয়া মারে। নগরের লোকেরা সাধুর নিকটে আসিয়া বলিল, "তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাও, নতুবা লাঠি দ্বারা তোমার মাথা ভাঙ্গিয়া দিব। আমাদের

সহরে বা সহরের ধারে এরূপ স্লেচ্ছকাণ্ড কখনও হয় নাই; যাহা হউক, তুমি অদ্যই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর, নতুবা তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইবে।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া নগরের লোকেরা চলিয়া গেল এবং মনে মনে ভাবিল, বুঝি অদ্যই সাধু এস্থান হইতে পলাইয়া যাইবে; কিন্তু এক সপ্তাহকাল অতীত হইয়া গেল, তবুও সাধুজী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না। এইরূপে কয়েকবার ভয়প্রদর্শন ও তিরস্কার করা হইয়াছিল, কিন্তু বাবা ব্রহ্মানন্দজী সে সকল কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। অতঃপর রাজার কর্ম্মচারী ও সৈনিকেরা, মহাজন ও সওদাগরেরা, নগরের প্রধান প্রধান লোকেরা বাঁশের লাঠি ও বড় বড় ইট হাতে লইয়া তেঁতুল গাছের নিকটে উপস্থিত হইল। সেদিন কোথা হইতে কতকগুলি "অঘোরী" তান্ত্রিক সাধু বাবা ব্রহ্মানন্দের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গাছের তলে একটা পাঁঠা কাটিয়া তাহার মাংস পাক করতঃ ভক্ষণ করিতেছিলেন। কয়েক বোতল মদ ছিল, কয়েক প্রকার মৎস্য সহযোগে প্রস্তুত তরকারীও ছিল, তদ্ভিন্ন প্রচুর পরিমাণে ছাগমাংস তৈয়ার করা হইয়াছিল। বাবা ব্রহ্মানন্দ এবং ঐ সাধুগণ মাংসাদি ভক্ষণ এবং মদিরা পান করিতেছেন, এমন সময়ে নগরের লোকেরা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতীব কটুভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমার প্রতি তোমাদের খুব আক্রোশ দেখিতেছি! তোমরা এত ক্রুদ্ধ হইলে কেন?" লোকেরা কহিল, "তোমাদের স্লেচ্ছাচার দেখিয়া আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তোমরা নগরকে অপবিত্র করিয়াছ এবং তুমিই ইহাদের দলকর্ত্তা। তোমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তুমি স্লেচ্ছাচার পরিত্যাগ কর নাই। অদ্য আমরা লাঠি দ্বারা নিশ্চয় তোমার মাথা ভাঙ্গিব।"

যে সময়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময়ে মৃতমনুষ্যের মস্তক (skull) নির্ম্মিত পাত্র মধ্যে মদিরা রাখিয়া মাংসসহ ব্রহ্মানন্দ পান করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে একটা বড় হাঁড়িতে হাত পূরিয়া মাংস তুলিয়া খাইতেছিলেন। নিকটে অনেক অস্থি পতিত ছিল এবং দেশীয় সুরার উগ্র দুর্গন্ধে বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নগর হইতে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের দলপতিকে সম্বোধন করিয়া সাধুজী কহিলেন, "বৎস! তুমি আমাকে ম্লেচ্ছাচারী বলিতেছ কেন? আমার ম্লেচ্ছাচার কোথায় দেখিয়াছ?" দলপতি অতি ঘৃণিত ভাবে বলিল, "তুমি এখনও মদিরা পান করিতেছ, আর সপলাণ্ডু মাংস ভক্ষণ করিতেছ, তথাপি ম্লেচ্ছাচার স্বীকার করিতেছ না? তোমার মত নির্লজ্জ মানুষ আর কখন দেখি নাই, তুমি ঘোরতর মিথ্যাবাদী।" বাবা ব্রহ্মানন্দ এবারে রোষকষায়িত-লোচনে এবং অতি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি মিথ্যাবাদী নহি, কিন্তু যদি তোমরা এই মুহূর্ত্তে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হও তাহা হইলে এই সাধুরা তোমাদের নাক কাণ কাটিয়া দিবে। তোমরা বলিতেছ, আমরা মদিরা পান এবং মাংস ভক্ষণ করিতেছি; এখন দেখ, আমাদের গুরু মহারাজা আমাদিগকে কি কি দ্রব্য খাইতে দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি নরকপালপাত্রে মদিরার বোতল হইতে যাহা ঢালিতে লাগিলেন,— অতি বিশুদ্ধ শুভ্র নির্জ্জল দুগ্ধ! বটবৃক্ষের কোমলপল্লব ছিন্ন করিলে যেরূপ শুভ্র দুগ্ধবৎ পদার্থ বহির্গত হয়, বোতলগুলির জলীয় পদার্থ (সুরা) যেন কোনও ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে পরিষ্কার দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়াছে; যে কয়েকটা বোতল মদিরায় পূর্ণ ছিল, সে কয়েকটা বোতলের সুরা এবং যে সকল বোতল খালি হইয়াছিল, তাহার মধ্য-স্থিত বায়ুও ক্রমাগত নির্ম্মল দুগ্ধরূপে নির্গত হইতে লাগিল। অতঃপর

সপলাণ্ড মাংসের হাড়ীতে হাত দিয়া যাহা উত্তোলন করিতে লাগিলেন, দর্শকগণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিল, তাহা নানা জাতীয় অতি মনোহর সুগন্ধিপূর্ণ প্রসূনগুচ্ছ!!! প্রথমে স্বর্ণচম্পক, তাহার পরে জবাকুসুম, তাহার পরে গোলাপ, তদনন্তর মল্লিকা, জুঁই, কবরী, টগর প্রভৃতি রাশি রাশি পুষ্প নির্গত হইতে লাগিল। সৌগন্ধে বৃক্ষ, লতা, নদীর জল, বায়ু, আকাশ, পরিপূর্ণ হইল এবং দর্শকগণ মাতিয়া উঠিল, যেন সে সময়ে সে স্থানে অসংখ্য পুষ্পোদ্যানের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমুদয় হাঁড়ী এবং সমুদয় বোতল ভাঙ্গিয়া দেখাইলেন, কোথাও মাংস বা মদিরা কেহই দেখিতে পাইল না। যে স্থানে কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ধেনোমদ, ছাগলের মাংস, মধ্যভারতের বড় বড় পেঁয়াজ এবং রসুনের উগ্র গন্ধে জীবকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সেখানে আতর, গোলাপজল, চন্দন এবং ফুলের গন্ধে স্বর্গবাস বলিয়া লোকের ভ্রম হইতে লাগিল। যে কয়েক খানা অস্থি ইতিপূর্ব্বে হাঁড়ীর পার্শ্বে পড়িয়াছিল, কেবল সেই কয়েক খানা হাড় পড়িয়া রহিল, তদ্ভিন্ন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের চিহ্নও লক্ষিত হইল না। বাবা কহিলেন, "দুগ্ধ পান করিবার অথবা পুষ্পের সুঘ্রাণ লইবার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আইস।" এই কথা বলিয়া সাধুদিগের সহিত একত্রে বাবা ব্রহ্মানন্দ সুমধুর সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত-ধ্বনিতে আকাশ পাতাল মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। নগরের লোকেরা এতক্ষণ অত্যন্ত ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এবারে আস্তে আস্তে সেই মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ধূলাবলুণ্ঠিত হইল। ধূলি-ধূসরিত হইয়া অতি ভক্তি ও বিনীত-ভাবে তাহারা বলিতে লাগিল, "মহানুভব! আমরা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মায়াময় সংসারী জীব, এই জন্য আপনাকে চিনিতে পারি নাই, জ্ঞানচক্ষু

উন্মীলিত না হইলে মহাপুরুষদিগকে চিনিয়া লওয়া সংসারী মানুষের পক্ষে অসাধ্য। আপনি এক্ষণে আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, এবং প্রসন্ন হইয়া আপনার এই অধম দাসদিগের অসংখ্য অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" বাবা ব্রহ্মানন্দ হাসিয়া উঠিলেন, সেই মধুর হাসিতে নগরবাসিদিগের ভয়-বিহ্বল চিত্ত প্রফুল্ল হইল। অতঃপর নগরের এবং দূরস্থ পল্লীসমূহের অসংখ্য নরনারী আসিয়া বাবার গলে মনোহর ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া এবং সুরম্য পাল্কীতে বসাইয়া, নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, ঢাক ঢোল, খোল করতাল শঙ্খ প্রভৃতির মহা বাদ্যধ্বনির মধ্যে, মহা ধূমধাম সহকারে বাবাকে সহর মধ্যে লইয়া গেলেন। চারিদিকে মহাধূম উঠিল, সহরে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিয়া গেল। অতি অল্পদিবস মধ্যে নগরের লোকেরা চাঁদা তুলিয়া মন্দেশ্বরের নদীতটে বাবার তেঁতুল গাছের সম্মুখে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, ঐ আশ্রম এখনও বিদ্যমান, বাবা ব্রহ্মানন্দ এখনও জীবিত, আশ্রমনির্ম্মাণকারী মিস্ত্রী ও মজুরগণের অধিকাংশ একখনও মরে নাই, এবং চাঁদাদাতা লোকদিগের মধ্যে বহু সংখ্যক হিন্দু ভদ্রলোক আজিও বর্ত্তমান।*

মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে করিতে মিস্ত্রীরা দেখিল, ইট

* আমি মন্দেশ্বরে গিয়া সহস্র সহস্র লোকের মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। মন্দেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া গোয়ালিয়র নগরে আসিয়া সেখানকার বহুসংখ্যক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদস্থ, ধার্ম্মিক লোকের মুখেও এ কথা শুনিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন গোয়ালিয়র মহারাজার পরিবারভুক্ত অনেক লোকে এ কথা বলিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত। কয়েকজন পাদ্রী সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "এই মহাপুরুষ বাস্তবিক অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন।"

ফুরাইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, "কাজ বন্ধ করিও না, হাত চালাইতে থাক, হাত চালাইলেই ইট পাইবে, ইট যথেষ্ট আছে।" মিস্ত্রীদের মুখে শুনিয়াছি, সেই স্বল্প সংখ্যক অবশিষ্ট ইটের মধ্য হইতে তাহারা যে পরিমাণে ইট আনিত, আবার সেই পরিমাণেই ইট তথায় জমিয়া থাকিত, যেন কুবেরের ভাণ্ডার, কিছুতেই ইট ফুরাইতেছে না!! মিস্ত্রীরা অবাক হইয়া কাজ করিত, আর বলিত, "ইনি মানুষ নহেন, মানুষাকারে দেবতা!" নির্ম্মাণের উপকরণাদি সংগৃহীত হইবার অল্প দিবস পরে, গোয়ালিয়রের ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন, এরূপ সামান্য সংখ্যক ইষ্টকে এত বড় মন্দির ও এত বড় আশ্রম নির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইতে অসম্ভবতর। তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন, "সাহেবজী! তোমাদের লেখাপড়া আর আমাদের লেখাপড়া স্বতন্ত্র; তোমাদের লেখাপড়া মানুষের বিজ্ঞানের সঙ্গে, আর আমাদের লেখাপড়া ভগবানের কৃপার সঙ্গে সম্পর্কীভূত; তোমরা বিজ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিয়া কাঁটার সমতা দেখিয়া কত হিসাব করিয়া, অঙ্ক কসিয়া কাজ কর, কিন্তু আমরা এসকল জানিও না, বুঝিও না, করিও না; আমরা কেবল গুরুচরণ ভরসা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হই।"

অনেক দিন হইল, আমি যখন মন্দেশ্বরে গিয়াছিলাম, তখন গ্রীষ্মকাল। নগরের ভিতরে কয়েকদিন ছিলাম, নগরবাসীরা বাবা ব্রহ্মানন্দের অলৌকিক ক্ষমতার অনেক কথা আমাকে শুনাইয়াছিল। প্রধান প্রধান সর্দ্দার জায়গিরদার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মভীরু লোকেরা বাবা ব্রহ্মানন্দের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও গুণের কথা আমাকে শুনাইত। মুসলমানেরাও ইঁহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিত। হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয়ের নিকটে যাহা শুনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে অধিকতর আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাবা ব্রহ্মানন্দ কাহারাও নিকটে

কখনও কিছু ভিক্ষা করেন নাই, কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া টাকা কড়ি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। কোনও ব্যাঙ্ক বা ব্যক্তির নিকটে তাঁহার টাকা জমা ছিল না, কাহারও নিকটে তিনি ঋণী হয়েন নাই, কাহারও নিকট হইতে রেজেষ্ট্রী পত্র, মণিঅর্ডার বা নগদ টাকা আসিত না, আশ্রমেও একটি পয়সা জমা থাকিতে কেহ কখন দেখে নাই, অথচ বাবা ব্রহ্মানন্দের প্রতি মাসে রাশি রাশি টাকা খরচ হইত, খরচের টাকা কোথা হইতে আসে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারে নাই; বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমাগত অনুসন্ধানেও ইহার অবধারণ হয় নাই। কখনও কখনও এক দিনেই পাঁচশত টাকা খরচ হইয়া যাইত। সম্বৎসর সমভাবে টাকা কড়ি খুব খরচ হইত, বহুবৎসরকাল ব্যাপিয়া এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এই খরচের ভাঁটা নাই, বরং জোয়ার আছে। অথচ টাকা কোথা হইতে আইসে, এত বৎসর মধ্যেও কেহ তাহা জানিল না। আমি যখন মন্দেশ্বরে গিয়াছিলাম, তখন বাবার নিত্য ব্যয় যাহা ছিল, তাহার মোটামুটি তালিকা এইরূপঃ—

[প্রতিদিনের গড়ে খরচ]

গাঁজা	...	...	।০
ভাঙ (সিদ্ধি)	...	...	৵০
আফিম্	...	...	॥০
চরস	...	...	।০
মদিরা	...	...	১॥০
তামাকু	...	...	৵০
একটা মহিষের খোরাক		...	।০

দুইটা গরুর খোরাক	...	||০
নয়টা পক্ষীর খোরাক	...	।৶০
দুইটা চাকরের বেতন	...	।/০
ভাণ্ডারীর বেতন ...	...	।০
পাচক ব্রাহ্মণের বেতন	...	।০
দাসীর বেতন ...	...	/১৫
যোগানন্দ নামক শিষ্যের প্রতিদিনের ব্যয়		।৶০
বাজার ইত্যাদি ...	...	২৷৴০
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অতিথি, সাধু, সন্ন্যাসী...		
প্রভৃতির জন্য ব্যয় ...	...	১৲
অনাথ দরিদ্র অন্ধ প্রভৃতির জন্য	...	||৴০
ভাগবত পাঠক ব্রাহ্মণের বেতন	...	।৶০
রামায়ণ পাঠক ব্রাহ্মণের বেতন	...	।৴০
শিবমন্দিরের পুরোহিতের বেতন	...	।০
মন্দিরের খরচ ...	...	||/০
গাভী ও মহিষের রাখালের জন্য	...	||০
সঙ্কীর্ত্তনকারীদিগের জন্য	...	||০
অন্যান্য খুচরা খরচ ...	...	৸০

অর্থাৎ মাসে গড়ে প্রায় চারি শত টাকা!! অথচ কোন দিন কেহ চারিটি পয়সা আসিতেও দেখে নাই বা শুনে নাই। পঞ্চাশ জন সাধু একত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেও তিনি অন্ন দিতে কাতর হয়েন নাই; কেবল অন্ন নহে, অসংখ্য ব্রাহ্মণ সাধু এবং দরিদ্রকে তিনি বস্ত্র, গাড়ী ভাড়া এবং কম্বল দান করিয়াছেন। অসংখ্য পীড়িত ব্যক্তিকে তিনি দুগ্ধ, ফল মূল, ইত্যাদি দান করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। এক এক

সময়ে তিনি হাজার ব্রাহ্মণকে ও কাঙ্গালীকে ভোজন করাইয়াছেন ; কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি অলৌকিক শক্তি !!

মন্দির ও আশ্রম নির্ম্মিত হইবার কয়েক মাস পরে, মন্দেশ্বরের এক মহাধনবান শেঠের বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারের উদ্যোগ করা হইয়াছে ; পাক সমাপ্ত ; ব্রাহ্মণেরাও কদলীপত্রের সম্মুখে দলে দলে বসিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমন সময়ে কর্ম্মকর্ত্তা অতি ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন ; ভাদ্রমাস, বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘটা করিয়া মেঘের উদয় ও প্রবল শীতল বায়ুর সঞ্চার প্রভৃতি দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা বৃষ্টি অনিবার্য্য স্থির করিলেন। বসিবার অন্যস্থান নাই, আহার্য্য দ্রব্যও প্রস্তুত, এদিকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এমন মেঘ! কর্ম্মকর্ত্তা ভাবিল, "অহো, আমি কি হতভাগ্য, আমার মাতৃশ্রাদ্ধক্রিয়া বুঝি পণ্ড হইল! এই বহুসংখ্যক ক্ষুধিত ও পিপাসিত ব্রাহ্মণদিগকে নিরাশ করিলে ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষাও অধিকতর পাপের ভাগী হইতে হইবে।" বাবা ব্রহ্মানন্দ এই ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তিনি ঠিক এই সময়ে আগমন করায় শেঠজি তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা, আপনি রক্ষা না করিলে এই মহাবিপদে দাসের রক্ষার আর উপায় নাই। আকাশে মেঘ দেখুন। আকাশের দিকে ব্রহ্মানন্দ চাহিলেন, সে চাহনিতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল ; ছয় মিনিট পরে বলিলেন, "ভয় নাই, ব্রাহ্মণদিগকে আহার করিতে বল, নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াও।" ভক্তশ্রেষ্ঠ অভয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগকে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দ নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনবান শেঠের ভোজে "রাজ-ভোগ" প্রস্তুত হইয়াছিল, তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া তাঁহারা

ভোজন করিতে লাগিলেন। এক বিন্দুও বৃষ্টি পতিত হইল না, মেঘ যেন আকাশে আটকিয়া রহিল। ভোজন সমাপনান্তে, দক্ষিণা ও তাম্বুল লইয়া, ব্রাহ্মণেরা গৃহাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিলে, বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কাহারও ভোজন বাকী আছে?" শেঠ কহিলেন, "আর কিছু বাকী নাই।" আকাশের দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে মহাপুরুষ কহিলেন, "আব্ তেরী খুসী; যো মেরাদা হো সো করো" অর্থাৎ "রে আকাশ! এখন তোর্ যাহা ইচ্ছা হয় কর্।" দেখিতে দেখিতে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; পাঠকমহাশয়েরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সেই বৃষ্টি ও বাদল চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত সমভাবে চলিয়াছিল, কেহ সূর্য্যদেবকে ১৪ দিন পর্য্যন্ত দেখে নাই। লোকে বলিল, "এই মহাপুরুষের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! অলৌকিক শক্তি!"

নগরের ভিতরে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া আমি বাবা ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে গেলাম এবং তাঁহারই অনুগ্রহাত্মক প্রস্তাবে প্রায় দুই সপ্তাহকাল তাঁহার পবিত্র আশ্রমে পরম সুখে যাপন করিলাম। ব্রহ্মানন্দের এই সময়ে হিংগলাজ তীর্থ গমনের ইচ্ছা ছিল, আমি বোম্বাই গমনোদ্যত ছিলাম, সুতরাং বোম্বাই পর্য্যন্ত উভয়ে একত্রে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। সূর্য্যাস্তের কিছু পরে আমরা উভয়ে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিলাম। সম্মুখের ঘাট পার হইয়া গেলে অনেক বিলম্ব হয়, নদীর ধারে ধারে অন্য একটা ঘাট পার হইলে ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হইতে পারে এই ভাবিয়া আমরা সেই ঘাটের দিকে যাইতে লাগিলাম। আকাশে চন্দ্র ও তারকা উঠিয়াছে; অল্প আলো এবং অল্প অন্ধকার এই উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যে রং হয়, সেই রংএ প্রকৃতিসুন্দরী শোভা পাইতে-

ছিলেন। যাইতে যাইতে একটা মহাবিস্তৃত শ্মশানে নরকপাল, মানবাস্থি, ভগ্ন কলস, দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড, ছিন্নকন্থা এবং কয়েকটা শিবা ও সারমেয় দেখিলাম। সেই অন্ধকারে সেই বিকট শ্মশানের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া বাবা ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "এটা কি? দেখুন, দেখুন এটা কি?" আমি সেই মহা শ্মশানের দিকে অন্ধকার ভেদ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, রোমাঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে দেহ কাঁপিতে লাগিল, আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলাম। যখন আমার অচেতন দেহে চেতনার সঞ্চার হইল, তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম, আমি মন্দেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনে বাবা ব্রহ্মানন্দের উরুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসিলেন, "শরীর কেমন?" আমি কহিলাম, "আপনি কি আমাকে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশান হইতে এখানে আনিয়াছেন?" তিনি হাসিলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না। শ্মশান হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনে আসার প্রহেলিকাময়ী ঘটনা এখনও প্রহেলিকাবৎ অভেদ্য হইয়া রহিয়াছে। শ্মশানে যাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিব না। রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার আমাকে বলিয়াছিলেন, "শ্মশান মধ্যে বাবা ব্রহ্মানন্দকে রজনীতে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া অনেকে কথোপকথন করিতে শুনিয়াছে অথচ শ্মশানে অপর কেহ দৃষ্ট হয় নাই।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ইটের বই।

পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের উৎপত্তি, উন্নতি ও উদ্বৃত্তির কৌতুক-কর বিবরণমালা, অতীব মনোনিবেশ সহকারে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে, জ্যামিতির সংজ্ঞার ন্যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া প্রমাণীত হয় যে, স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের অনুশীলন এবং শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত জগতের কোন জাতিই উন্নতির পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই। ফ্রান্স দেশের সীন্ (Seine) নামক সুন্দর নদবরের উপকূলস্থিত দরিদ্র পর্ণকুটীরে প্রায় পঞ্চত্রিংশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া, যে মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্মা (Monseiur Reabox) পৃথিবীর প্রাচীন সাহিত্যের আদি, উৎপত্তি উন্নতি, স্থিতি এবং বিস্তৃতির বিচিত্র ইতিহাস আলোচনা করতঃ ধরাধামে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, মৃত্যুর তিন সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, মৃতপ্রায় সমাজকে, পদানত জাতিকে, অধঃপতিত মানবকে এবং ধর্ম্মবিহীন আত্মাকে পুনর্জীবিত, জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতায় মন্ত্রপূঃত করিতে হইলে, স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। একখানি নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক দর্পণকে মুখমণ্ডলের সম্মুখে অবস্থাপন করিলে যেমন তাহাতে স্বকীয় প্রতিকৃতি অতি পরিষ্কাররূপে দর্শন করিতে সক্ষম হওয়া যায়, স্বদেশীয় সাহিত্য-মুকুরে সেইরূপে স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ এবং স্বজাতির আকৃতি, প্রকৃতি, প্রতিকৃতি, উন্নতি, উৎপত্তি, অবনতি, অবয়তি, ঈক্ষা, বিভিক্ষা প্রভৃতির সম্যক পরিচয়

লাভে অতি সহজে সমর্থ হওয়া যায়। বাস্তবিক আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নামক ত্রিতাপহরণ করিবার জন্য সাহিত্যই আমাদের প্রধান সহায়। এই জন্যই জাতীয় ভাষার আলোচনায় সভ্যজাতি সতত সমুৎসুক; এই জন্যই সংগীতাচার্য্য নিধু বাবু গাইতেন—

"নানা দেশে নানা ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পুরে কি আশা?

এই জন্যই মহাত্মা রামমোহন রায় বলিতেন, "বাঙ্গালায় মা বলিলে মনে যে মাধুর্য্য হয়, ইংরাজিতে Mother বলিলে তেমন হয় কি?" এই জন্যই মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স অষ্টাবিংশ প্রকার ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াও বলিয়াছিলেন, "আমার মাতৃভাষা ইংরাজির আলোচনায় আমি যে আমোদ ও আনন্দ উপভোগ করি, তাহা অন্য কোনও ভাষাতে প্রাপ্ত হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" মাইকেল মধুসূদন বলিতেন, "আমি যতগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, তাহার সমুদায়ের একত্রিত মূল্য, আমার মাতৃভাষা বাঙ্গালা অপেক্ষা শতগুণে ন্যূনতর।" এই ভাষাই ইউরোপীয় মাইকেলকে ভারতীয় মাইকেল করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ, মানব-সমাজশরীরে সাহিত্য যেন নাড়ীবৎ অবস্থান করিতেছে; মানবের দেহস্থিত নাড়ীতে যেমন তাহার ধাতু (Pulse) বাঁধা থাকে, সমাজ-শরীরের সাহিত্য-নাড়ীতে জাতির ধাতুও সেইরূপ বাঁধা রহিয়াছে।

পৃথিবীর প্রাক্কাল হইতে মানবজাতি স্বকীয় মনোভাব অভিব্যক্ত করিবার জন্য যে সকল কৌতুককর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তন্মধ্যে

লিখন (writing), পঠন (Reading) এবং কথন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যাহা কিছু রসনার অধিকার ভুক্ত, তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে স্থিরতা নাই, কিন্তু যাহা কিছু লেখনীর আয়ত্বাধীন, তাহা বংশপরম্পরায় স্থির থাকিয়া চিরস্থায়ীরূপে পরিণত হইতে পারে এই জন্যই চিত্রণ (painting), খোদন (Engraving), অশাঢ়ণ (lithographing). হিরোগ্লিফ্ (Hieroglyphs), ক্রমোগ্রাফ্ (Chromograph), মিউকোগ্রাফ্, উইকোগ্রীফ্ প্রভৃতি প্রণালী অনুসারে লিখিবার প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুর অপৌরুষের শ্রুতিশাস্ত্রে, মুসলমানের কোরাণে এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলে শব্দ "ব্রহ্ম" বলিয়া অভিহিত; যদি লিখন-প্রণালীর সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে শব্দের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হওয়া কঠিনতর অপেক্ষা কঠিনতম হইয়া উঠিত, এই জন্যই বেদান্ত বলিয়াছেন—

"ঈক্ষতে ন'াশব্দং

[বেদান্তসূত্র]

লেখনী সহায়ে লিখিত এই শব্দমালা সংক্ষিপ্ত বা বিশদ কিম্বা বিক্ষিপ্ত বা একত্রিতরূপে সংগৃহীত হইলেই পুস্তকের প্রথম উৎপত্তি হয়; পুস্তকের প্রচার দ্বারাই সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয় এবং সেই পবিত্র সাহিত্য অবশেষে নানা উপাধিতে অভিহিত হইয়া জাতির মর্য্যাদা, গৌরব, শক্তি, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতির সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া পূজনীয় হইয়া উঠে। এই জন্যই প্রাচীন পুস্তককে রক্ষা করা সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের একটা স্বাভাবিকী ইচ্ছা; এই জন্যই ব্রহ্মস্বরূপ শব্দ-মালাকে একত্রিত করিয়া পুস্তকাদির প্রণয়ন করা প্রাচীন জাতির পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। তাঁহাদের লিখিত বা সংগৃহীত শব্দ-মালা অবশেষে পুস্তক,

গ্রন্থ, পুঁথি, বই, বুক্, বিব্লিয়স্, কেতাব, কল্‌মা, নিয়োশ্, নিমশ্, কেরেফা. তক্‌তাই, ইজিফান্ প্রভৃতি একশত সপ্তবিংশাধিক উপাধিতে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা করা অত্যন্ত আনন্দ, আমোদ ও কৌতুকের বিষয়। মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সেই ভাবটীকে বংশপরম্পরায় রক্ষা করিবার জন্য কত প্রকার অদ্ভুত পুস্তকাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অদ্যকার এই কৌতুক-কর প্রবন্ধে এইরূপ একখানি অত্যদ্ভুত গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আমা-দের উদ্দেশ্য।

ভূর্জ্জ পত্রে, তাল পত্রে, তমাল পত্রে, মেষ চর্ম্মে অথবা কাগজে লিখিত কিম্বা মুদ্রিত পুস্তক অনেকে দেখিয়াছেন, পড়িয়াছেন, অথবা শুনিয়াছেন, কিন্তু ইটের বই কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কেবল 'আগা গোড়া' ইট!—গাছের পাতা নহে, বৃক্ষের বল্কল নহে, ভেড়ার পার্চমেণ্ট নহে, কিম্বা দেশী বা বিলাতী কাগজ নহে—কেবল আগা গোড়া ইট! এমন অদ্ভুত পুস্তকের বিবরণ কখনও কাহারও শ্রুতি-গোচর হইয়াছে কি? পুরাকাল হইতে সাহিত্যের অধুনাতন অত্যু-ন্নতির কাল পর্য্যন্ত লেখকেরা যে সকল বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া আসি-য়াছেন, এই অপূর্ব্ব পুস্তকে তাহার একটী অক্ষরও ব্যবহৃত হয় নাই; মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য লেখকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল মসী বা লেখনীর সহায়তায় লিপি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তদনুরূপ কোনও মসী বা লেখনী এই অদ্ভুত পুস্তকের লিখন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই; পুস্তকের পত্রাঙ্ক দিবার জন্য সকল দেশে, সকল সমাজ এবং সকল ভাষায় গণিত শাস্ত্রের ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা ব্যবহার করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু এই অদ্ভুত গ্রন্থে তৎপরিবর্ত্তে পাতায় পাতায় ক্রমান্বয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতির চিত্রাঙ্কন দ্বারা

পত্রসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ; সাহিত্যামোদী সুধীগণ বলিতে পারেন কি, এই অত্যাশ্চর্য্য পুস্তকের অস্তিত্ব কোথায় ?

মুদ্রিত বা হস্তলিখিত পুস্তক পাঠ করিতে করিতে কাগজের পাতাগুলি ক্রমান্বয়ে উল্টাইয়া লইতে হয় ; আমাদের প্রস্তাবশির্ষোক্ত অপূর্ব্ব পুস্তক পাঠ করিতে হইলে ক্রমান্বয়ে ইটের পর ইট, তাহার পর ইট উল্টাইয়া লইতে হইবে ; কখনও কখনও রাশি রাশি ইষ্টক উল্টাইতে উল্টাইতে পাঠকের ক্ষীণ হস্ত ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠে, সুতরাং নিকটে কোনও সহযোগী পাঠক কিম্বা কোনও বলবান মজুর উপস্থিত না থাকিলে পাঠককে পরিক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় ; কখনও বা রাশিকৃত ইষ্টক সমাবৃত স্তূপের মধ্যে উপবেশন বা দণ্ডায়মান হইয়া পাঠককে পঠন-ক্রিয়া সমাপন করিতে হয় ; এই অত্যাশ্চর্য্য পুস্তকের আকৃতি, অক্ষর, ভাষা ও ভাব দেখিলে সাহিত্য-জগতের ধুরন্ধরগণ কিম্বা প্রত্নতত্ত্বসমাজের প্রাড়বিবেকগণ গালে হাত দিয়া 'কাশী যাই কি মক্কা যাই, ভাবিয়া আকুল হইবেন। প্রস্তাব শীর্ষোক্ত ইটের বই জগতে অপূর্ব্ব পদার্থ—এক অভিনব আশ্চর্য্য আবিষ্কার ! ! সাহিত্য-জগতে এমন অদ্ভুত গ্রন্থ আর আছে কি ?

যাঁহারা লাইব্রেরী সাজাইতে ভালবাসেন, এই অদ্ভুত গ্রন্থের এক অধ্যায়তে তাঁহাদের লাইব্রেরীকে এক বিপুল বপুর পুস্তকালয়রূপে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে। মিশরের হাইরোগ্লীফ্ কিম্বা কিউ-ফার কুফ্রা অথবা পোলাণ্ডের সোবিস্কি অক্ষর হইতেও এই 'ইষ্টক-নির্ম্মিত পুস্তকের' অক্ষর অধিকতর কৌতুকাবহ। কৌতুকের আরও কারণ এই যে, সকল সভ্য সমাজেই লেখকেরা স্বহস্তে লিপিকার্য্য সমাপন করেন, অথবা সময় বিশেষে নিযুক্ত লেখককে নিকটে বসাইয়া বর্ণিতব্য বিষয়ের বর্ণনা করিতে থাকেন এবং লেখক তাহা

লিখিয়া লইতে থাকে ; কিন্তু এই ইটের বইয়ের লিখনকার্য্য নিরক্ষর কুলি বা মজুর বা মিস্ত্রীর দ্বারা সম্পন্ন হয় ; যিনি গ্রন্থের প্রণেতা বা প্রকাশক, গ্রন্থের লিখনকার্য্যের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই ; এখনকার কালে মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর-সংযোজকগণ (Compositors) গ্রন্থকারের গ্রন্থসমূহ "কম্পোজ" করিয়া দেন বটে, কিন্তু কম্পোজিটারের বর্ণমালায় জ্ঞান আছে, ভাষার উপর যৎকিঞ্চিৎ অধিকারও থাকে, কিন্তু ইটের বইয়ের লিপিকর ভাষা বুঝে না, রচনা বুঝে না, বিষয় বুঝে না, অক্ষরের নাম জানে না, অথচ সেই ব্যক্তিই এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের অপূর্ব্ব লেখক ! ! এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থের বিস্ময়াত্মক বিবরণ পাঠ করিতে কাহার কৌতূহল না জন্মে ?

স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সঙ্কল্পে যে সকল সাহিত্যামোদী সৎপুরুষেরা অতীব অধ্যবসায়, অত্যন্ত অনুসন্ধান, অতিশয় অনুরাগ এবং নিতান্ত সাবধানতার সহিত হস্ত, মন ও মস্তিষ্ক পরিচালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নিকট এ কথা অবিদিত নাই যে, কেবল হংসবংশ ধ্বংস করিয়া "কুইল্" বা কলমের দ্বারায় পৃথিবীর ৪৬১ প্রকার ভাষার বর্ণমালা লিখিত হয় নাই।* কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি নানা উপাদানে লেখনী নির্ম্মাণ করিয়া জগতের লেখকেরা লিপিকার্য্য সমাপন করিয়াছেন ; 'ইটের বই'য়ে ইহাদের কোনও প্রকারেরই লেখনী ব্যবহৃত হয় নাই। সাহিত্য-জগতের সহিত যে সকল পণ্ডিতের দীর্ঘকালব্যাপী সম্বন্ধ আছে, অথবা

* ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা গভীর গবেষণা এবং বহুকাল-ব্যাপী আলোচনা দ্বারা স্থির করিলেন যে, বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সভ্য সমাজে ৪৬১ প্রকার ভাষা বর্ত্তমান আছে। ইহার অধিক সংখ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু ৪৬১ প্রকার মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বহুবর্ষকাল ব্যাপিয়া যাঁহারা প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের নিকট মসীর ইতিহাস এখনও অশ্রুত, অজ্ঞাত এবং অপঠিত। পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত লেখনকার যত প্রকার মসী ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, সকলে তাহাদের নাম বা উপকরণগুলি শ্রবণ বা দর্শন করিয়াছেন কি? প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত 'ইটের বইয়ের লিখনকার্য্যে কি প্রকারের মসী ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয়ীকরণ জন্য আমাদিগকে মসীর ইতিহাস আড়োলন করিতে হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলাম, জগতে যত প্রকার মসী ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে, 'ইটের বই'য়ে তাহাদের একটীও ব্যবহৃত হয় নাই। অনেক দিনের অনুসন্ধানে আমরা ৫০ প্রকার মসীর আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি; এই সকল মসী কোনও না কোনও সময়ে লিখনকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলির ব্যবহার এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সকল মসীর বিবরণ অতীব কৌতুকাবহ, প্রস্তাবের বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল কথার এখানে প্রসঙ্গ না করিয়া কেবল ইটের বই সম্বন্ধে যাহা লিখিবার আছে, তাহা লিখিয়া যাইব।

যে তুরস্কের নামে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ হিংসায়, ঘৃণায়, ক্রোধে এবং কখনও কখনও ভয় ও লজ্জায় ভিন্নমনা হইয়া পড়েন, সেই তুরস্কের শাসিত ও অধিকৃত সুবিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে প্রাচীন কালের অসংখ্য পণ্ডিতের আবাসভূমি ছিল। আসিরিয়া (Assyria) এবং আল্‌জিজিরা নামক দুইটি ক্ষুদ্র দেশের মধ্যবর্ত্তী মেশোপোটেমিয়া (Mesopotamia) নামক বিখ্যাত বিভাগে বাবিলন (Babylon) নামক অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ মহানগর এখনও বিভববিহীন হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রীকপণ্ডিত হিরোদোতসের সময়ে এই সহরের এক এক দিক সার্দ্ধসপ্ত ক্রোশ দীর্ঘ ছিল, এখনও ইহার

প্রাচীরের উচ্চতা ২০০ শত কিউবীক্ ফিট্। খ্রীষ্টীয় ২২৩২ পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হয়; বাইবেলের (Genesis) নামক পুস্তকের দশম অধ্যায়ে "শীনার" জাতিদিগের ইহা আবাসভূমি বলিয়া ইহার বর্ণনা আছে। বাবিলনের 'নেবো' নামক দেবতার পরমপ্রিয় নরপতি নেবোকড্-নেজার (Nebochadnezzar) এখানে বহুকাল রাজত্ব করিয়া খ্রীষ্টের ৫৬১ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করেন। পারস্যের সাইরশ্ (Cyrus) এবং গ্রীশের আলেক্জন্দর, (সেকেন্দর সা) এইখানেই ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। বাবিলন শব্দের অর্থ "ঈশ্বরের দ্বারদেশ," সুতরাং পুরাকাল হইতে ইহা পবিত্র বলিয়া অনেক জাতির নিকটে প্রসিদ্ধ। মেশোপোটেমিয়া বিভাগের আসিরিয়া প্রদেশস্থিত বাবিলন নগরে এই অদ্ভুত ইটের বই দেখিতে পাওয়া যায়। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বয়ক্রম ছয় সহস্র বৎসর। খ্রীষ্ট জন্মগ্রহণের চারি সহস্র পূর্ব্বে ইহা প্রণীত হইয়াছিল; তদপেক্ষা ইহার বয়স আরও অধিক কিনা, জানা যায় নাই।

পরিব্রাজকেরা যখন সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ইহাকে গ্রন্থ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। ঐ গ্রন্থের অক্ষর যে কোনও ভাষার অক্ষর অথবা ইহার কোন অর্থ বা উচ্চারণ আছে, কিম্বা ইহা যে কোনও বর্ণমালার আদি, কেহই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ইহার কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্পেনদেশীয় কোনও প্রাজ্ঞ পরিব্রাজক ইহা আবিষ্কার করেন।* ক্রমে ক্রমে তের খানি ইটের বইয়ের আবিষ্কার

---

* "They had been seen by travellers, but no one seems to have dreamed that these strange marks could have any meaning. It was a Spanish ambassador, who, on a visit to Persepolis in 1618, first conjectured that those signs must be

হয়। আকারে ও প্রয়োজনীয়তায় ইহাদের মধ্যে যেখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহারই বিশেষ ও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। অপরাপরগুলি পুস্তিকা, এই খানিই প্রকৃত পুস্তক বা গ্রন্থ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আসিরিয়গণ সূর্য্যোপাসক ছিল, এই সৌরগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আদিতম শাস্ত্রের নাম "অন্তক্" (Antock)। ইহা তাহাদের বেদ বলিলেই হয়। প্রস্তাব-শীর্ষোক্ত ইটের বইখানি এই আসীরিয় বেদ অথবা অন্তক। যে ভূমিখণ্ডে এই অন্তক শাস্ত্র অবস্থিত, তাহার দীর্ঘতা ১/৪র্থ মাইল, প্রশস্ততা প্রায় তদ্রূপ; প্রকৃত পক্ষে ঐ ভূমি সমচতুষ্কোণ square। ঐ ভূমিখণ্ডের উপরে মোটা অর্থাৎ মসৃণ লোহার বহু সংখ্যক পাৎ সমূহ প্রসারিত আছে, তাহা খণ্ড খণ্ড হইলেও লৌহের শৃঙ্খল দ্বারা পরস্পর সংযোজিত আছে; ঐ শৃঙ্খলের সংযোগস্থল সমূহ এত সুকৌশলে অথচ সুদৃঢ়রূপে অবস্থিত যে, সহজে তাহা চিনিয়া উঠা ভার। পাতের সংখ্যা অধিক নহে, মোটে নয়টী; ইহাতেই বুঝুন, পাতগুলি কত বড় বড় আকারের। ভূমির উপরে লোহার পাৎগুলি প্রসারিত থাকায়, পাতের উপরিস্থিত ইষ্টক সমূহ কোনও উপায়েই নষ্ট বা জীর্ণ বা ক্ষয়গ্রস্ত হইতে পায় না। ঐ পাৎসমন্বিত ভূমিখণ্ডের নাম "কুরীদা" বহুবচনে কুরীদন্। এই কুরীদার উপরে এক এক খানি করিয়া অতি প্রকাণ্ড ইষ্টক প্রসারিত আছে; ইটের উপরে ইট, ইটের উপরে ইট, তাহার উপরে ইট, এই রূপে চতুর্দ্দিকে ইট সাজান। প্রাচীরাদি প্রস্তুত করিতে হইলে ইটের

---

characters in some unknown language, and he had a line of them copied. Through the labours of successive scholars the characters have been deciphered, and numerous books have been translated."
—Assyria" by Sayce p. 99.

উপরে ইট বসাইয়া মশালা দিতে হয়, কিন্তু এস্থলে মশালা দেওয়া হয় না, সুতরাং যখনই ইচ্ছা ইট তোলা যায়, আবার বসান যায়। ইট-গুলি ছোট বড় নাই; শত হউক, সহস্র হউক, লক্ষ হউক, সংখ্যায় যতই হউক না, সকল ইটগুলি আকারে সমতুল্য হওয়া চাই। এই-রূপে ক্রমাগত ইট্ সাজাইয়া গেলে যখন সাজান শেষ হয়, তখন ইহার আকারও "কুরীদা'র আকারের মত হইয়া থাকে, শোভার জন্য কেন্দ্রস্থলে অথবা ঠিক মধ্যস্থলে ষড়কোণ বিশিষ্ট খুব স্থূল স্তম্ভ এবং ঐ স্তম্ভের উপরে ধনুর্ব্বাণাকৃতি একটা মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। অন্তকের-উচ্চতা কলিকাতার গড়ের মনুমেণ্ট (monument) হইতে কম হইবে না; স্তম্ভের পরিধি মনুমেণ্টের পরিধির প্রায় সমতুল্য। কিঞ্চিৎ কম হইলে হইতে পারে; ধনুর্ব্বাণাকৃতি ইট তাহাদের সূর্য্য-দেবতার মূর্ত্তি ইহার উচ্চতা ২৬ হস্ত। সমুদয়ে এক প্রকাণ্ড পদার্থ; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সকল ইটের গাত্রে 'অন্তকের' কবিতা আছে; এক খানি ইটের দুই পৃষ্ঠা পড়িয়া পরে পরে অপর ইটখানির দুই পৃষ্ঠা পড়িতে হইবে; এইরূপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ক্রমান্বয়ে ইটগুলি পড়িয়া যাইতে হইবে। প্রথম ইষ্টকে কোনও চিহ্ন নাই, দ্বিতীয় ইষ্টকে সূর্য্যের, তৃতীয় ইষ্টকে চন্দ্রের, তৃতীয় ইষ্টকে 'অরুণা' নক্ষত্রের, চতুর্থ ইষ্টকে গাড়ু পক্ষীর, পঞ্চম ইষ্টকে মৎস্যের, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকল ইটের উপরে ছবি আছে; ছবিগুলি উপরিভাগে বড় বড় আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য, অর্থে ১, চন্দ্র অর্থে ২, অরুণা নক্ষত্র অর্থে ৩, গাড়ু পক্ষী অর্থে ৪, মৎস্য অর্থে ৫ ইত্যাদি। আসিরিয়ার সৌরদের বিশ্বাস, সৃষ্টিপ্রকরণে প্রথমে সূর্য্য, তৎপরে চন্দ্র, তাহার পরে অরুণা, তদন্তর গাড়ু, তাহার পরে মৎস্য ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়; সুতরাং

ইটের বইয়ের পাতা ঠিক করিয়া লওয়া কঠিন হয় না। 'অস্তক পুস্তকে কত ইট আছে, এখনও তাহার সংখ্যা হয় নাই, কিন্তু এপর্য্যন্ত এক-খানিও ইট নষ্ট হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অতি যত্নে রক্ষিত আছে। গ্রন্থের শ্লোকসমূহ ছন্দোবন্দে বিরাজিত, কিন্তু ছন্দ বলিলে এখনকার কাব্যছন্দের কবিতা মত দেখা যায় না. কোরাণের "আয়ে-তের" মত অদ্ভুত কবিতাময় গদ্য মত দেখায়। কোরাণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের কবিতা শুনিলে পাঠকের মনে অস্তকের কবিতা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হইতে পারে। কোরাণের গদ্যময় কবিতা এই—

আল্হাম্ দোলিল্লাহো রব্বিউল্ আলমীন্।
বিস্মোল্লা আল্রহমা নীর রহীম্।
মালিকে ইয়ামুদ্দীন্।
ইয়াকা ন বুদো ইয়াকা নস্তাইন্।
ইহ দিনশ্ সরাতীল্ মুস্তকীমা।
সরাতীম্ লজীনা অনাআম্তা আলেহিম্।
গয়েব উল মুক্‌হুবে আলেহীম্।
বলদ্ দোয়াল্ লীণ।

অস্তকের কবিতা ঐরূপ। শব্দ সমূহের উচ্চারণ য়িহুদীদিগের হিব্রুভাষার ন্যায়; অক্ষরগুলি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে (পারস্য ভাষার ন্যায়) লিখিতে হয়। ইট্ গুলি মাটীর, কিন্তু দগ্ধ ইট্; ইট গুলি চতুষ্কোণ, বর্ণ লাল। সকল ইটের আকার প্রায় সমতুল্য। অক্ষরের আকার ধনুকের ন্যায়; বর্ণমালা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সকল অক্ষরই ধনুর আকার বিশিষ্ট; সহজে একটা অক্ষর হইতে অন্য অক্ষরকে বিভিন্ন করা যায় না, অথচ সকল অক্ষরই ভিন্ন ভিন্ন।

দুঃখের বিষয়, চিত্র দিয়া আমরা অক্ষরের আকৃতি দেখাইতে পারিলাম না। সাধারণতঃ ইংরাজী পুস্তকের ছাপা T অক্ষরের আকৃতির মত। অতিকষ্টে কবিতাগুলি পাঠ করা যায়, কারণ ইহাদের ভাষায় Punctuaion নাই। প্রাচীন গ্রীক ভাষায় মাথু, মার্ক প্রভৃতির New Testament (বাইবেল) স্থিত Gospel সমূহের কবিতা যেরূপ punctuation শূন্য হইয়া লিখিত হইয়াছিল, ইহাও তদ্রূপ; নমুনা স্বরূপ, মনে কর, 'Death was met by him with calmness and resignation" এইটী লিখিতে এইরূপে লিখিত হইবে—

"Deathwasmetbyhimwithcalmnessandresignation."

দেখিলেন, শব্দসমূহ কেমন ঘন ঘন ভাবে সংযোজিত, মধ্যে কোথাও বিচ্ছেদ বা ব্যবধান নাই। বাঙ্গালা ভাষায় নমুনা দেখুন। মনে কর, "বসন্তের বিমান-বিহারী বিহঙ্গ-বর্গের বিনোদ কলরব" এইটী 'অন্তকের' অক্ষরে লিখিতে হইলে এইরূপ হইবে—

"বসনতেরবিমানবিহারীবিহঙ্গবর্গেরবিনোদকলরব"

তাহাদের ভাষায় যুক্তাক্ষর নাই, তাহাতেই 'বিহঙ্গ' শব্দ বিহন্‌গ লেখা হইয়াছে। অক্ষরের নাম 'বীর্শী'; বিরশ্‌ অর্থে আসীরিয়ার ভাষায় তীর বা বাণ (arrow) বুঝায়। ইংরাজীতে ইহার নাম cuneiform characters। কাঁচা ইটের উপরে সর্‌হু নামক মৃগের শৃঙ্গের দ্বারায় অক্ষর খোদিত হয়, তদন্তর ঐ ইট অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গায়ে "নোবাইন্দী" মসী দ্বারা রং করা হইয়া থাকে। বলদের অস্থী হইতে চর্ব্বির ন্যায় পদার্থে নিমরুদ্‌ দেশীয় 'জেরো' নামক লতার রস মিশাইয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে স্থাপন পূর্ব্বক যে ধূসর বর্ণের গাঢ়্‌ এবং চিরস্থায়ী মসী প্রস্তুত হয়, তাহার নাম নোবাইন্দী। কিউফা, বশোরা, বোগদাদ, মোশুল, উরফা, আলজিজিরা, নিনেভা প্রভৃতি স্থানের দক্ষ মিস্ত্রিগণ আসিয়া ঐ অক্ষর খোদে; তাহারা অক্ষরের নাম উচ্চারণ জানে না,

অন্ত ইটের নমুনা দেখিয়া অক্ষর খোদন করে; মিস্ত্রিদের পক্ষে অক্ষরের নাম জানা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। অস্তক শাস্ত্র ৪১ অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহা অতীব বৃহৎ গ্রন্থ। কোনও পর্টুগীজ্ পরিব্রাজকের প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে অস্তকের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কতকগুলি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজি হইতে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার নমুনা দেওয়া গেল—

"তদনন্তর শিউরিদশের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, পবিত্র আশুর স্থর্য্যের উপাসনা করিলেন। শিউরিদশের শোণিত মন্দিরে আনীত হইলে আকাশের নক্ষত্র সমূহ দিবসে উদিত হইল; প্রধান পুরোহিত একটী নক্ষত্রকে স্পর্শ করিলেন; ঐ নক্ষত্রের কিরণমালা একটী সুবর্ণ পাত্রে বদ্ধ করিয়া আনীত হইয়াছিল; ঐ কিরণ হইতে শত শত দেবতার জন্ম হইয়াছে। হে কিরণ! তুমি আমাদের সহায় স্বরূপ হও; হে কিরণ! তুমি আমাদের জ্যোতিস্বরূপ হও; হে কিরণ! তুমি আমাদের জয়স্বরূপ হও; হে কিরণ! তুমি আমাদের ভোগস্বরূপ হও;" ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রবাদ আছে, আশুর (Assur) নামক মহাপুরুষ আসিরিয়া দেশের স্থাপনকর্ত্তা। অস্তক নামক শাস্ত্র সকল সময়ে খোলা থাকে না; তুরস্কের বড় বড় আকারের মূল্যবান কার্পেট দ্বারা আবৃত থাকে; বৎসরে তিন বার ইহা অনাবৃত করিয়া সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়। প্রধান পুরোহিত আসিয়া জানুয়ারির শেষে এবং জুন মাসের শেষে এবং অক্টোবর মাসের শেষে ইহা দেখাইয়া দেন। জুন মাসে, বৃষ্টি না হইলে, ইহা তিন দিন খোলা থাকে, স্থর্য্যের কিরণ এবং চন্দ্রের কিরণ স্পর্শ করান ইহাদের উদ্দেশ্ত। জানুয়ারি এবং অক্টোবর মাসে কয়েক ঘণ্টা মাত্র খোলা থাকে। গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের

শেষে 'সবর্' শব্দ লেখা আছে, এই সবর্ শব্দ হিন্দুর 'ইতি' বা 'তথাস্তু' এবং মুসলমানের "আমীন্," য়িহুদীর "শোলা" এবং খ্রীষ্টানের Amen তুল্য। আসিরা দেশে এখন বহুসংখ্যক খ্রীষ্টানের বাস, কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীন আসিরীয় মতের সৌরদিগের নিকটে ইটের বই এখনও মহা পবিত্র এবং মহাশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া পূজ্য। তাহাদের বিশ্বাস, এই অস্তক মানুষের হাতের তৈয়ারী নহে। অনেকে বলে, ইহার স্পর্শে রোগ, শোক, পাপ তাপ পলাইয়া যায়।

অপর ইটের বই সম্বন্ধে আচার্য্য সেস্ সাহেব (Sayce)) তাঁহার বৃহদাকার গ্রন্থে ইংরাজি ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই অনুবাদ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। "বাবিলনের প্রাচীন অধিবাসীরা ত্রিশূলের মত কলমে এবং তীরধনুর মত অক্ষরে কাঁচা ইষ্টকের উপরে তাহাদের পুস্তকাদি খোদিত করিত। ঐ ইট পোড়াইলে লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিত। এই জন্য ইংরাজিতে ইহার নাম Cuneiform writing; নেবুকড্‌নেজার প্রভৃতি সম্রাটগণ প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে, সুবর্ণের ত্রিশূলাকারে লেখনী নির্ম্মাণ করিয়া উপহার দিতেন। কোন কোন কলমের আকার বন্দুকের মত ছিল। তুরস্কের কৌঞ্জিক (Kounjik) নামক রাজকীয় পুস্তাকালয়ে একখানি পুস্তক ছিল, তাহা ঐ কলমের সহায়ে খোদিত হইয়াছিল। আশুরবাণি এবং বৈরোঁ নামক পুরুষদিগের চেষ্টায় ঐ পুস্তক পরিশেষে সোনার পাতার উপরে খোদিত হয়। খ্রীষ্টের ৩৮০০ বৎসর পূর্ব্বে Cuneiform অক্ষরে প্রচলন ছিল, খ্রীষ্টের জন্মের ৬৫ বৎসর পরেও ইহার ব্যবহার শুনা গিয়াছে, কিন্তু চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে হইতে এবম্প্রকার অক্ষরের প্রচলন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

সাসারামের রোজা। *

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের তত্ত্বাবধানে মোগলসরাই হইতে গয়া পর্য্যন্ত যে নূতন লৌহবর্ম্ম প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মধ্যদেশে সাসারাম অন্যতম ষ্টেশন। রেলওয়ে-প্রাঙ্গণ হইতে (পদব্রজে) সাসারাম নগর প্রায় পঞ্চদশ মিনিটের পথ। এই প্রাচীন নগরের চারিদিক বিন্ধ্যগিরির শাখামালায় পরিবেষ্টিত। বেহার প্রদেশের অন্তর্গত সাসারাম নগর, আরা (সাহাবাদ) জেলার একটি মহকুমা এবং স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। কোন্ সময়ে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা সহজে স্থির করা যায় না, কিন্তু মুসলমান শাসনকালে ইহা ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির আবাস ছিল, একথা স্পষ্টতঃ জানিতে পরা যায়। শেখ্ বদ্রুদ্দীন হয়দার্ নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক তাঁহার "বেয়াণ এ তারিখ এ হিন্দ্" নামক সুবৃহৎ পারস্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—"সাসারামে ক্ষুধিত, পিপাসিত, বিবস্ত্র, দরিদ্র বা ভিক্ষুকের বাস নাই; এখানে প্রত্যেক অধিবাসীর গৃহ ধন ও ধান্যে ভরা আছে; প্রত্যেক গৃহকে পণ্ডিতের ও মৌলবীর আশ্রম বলা যাইতে পারে।" কবিবর কালিদাস ধারানগরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন "অথ ধারানগরে কোঽপি মূর্খ ন নিবসতি" অর্থাৎ ধারানগরে একটি মূর্খও বাস করে না; সাসারামের প্রশংসায় মুসলমানেরা ঠিক তাহাই লিখিয়াছেন। আর একজন ইশলামীয় গ্রন্থকার বলেন, "নগরের প্রায় সর্ব্বত্রই নানা

* সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের কবরের উপরে যে সমাধিগৃহ নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম "রোজা"। ধর্ম্মাপরায়ণ মুসলমানদিগের সমাধিগৃহকে "দরগা" বলে।

বিদ্যার চর্চ্চা হইয়া থাকে, নগরের প্রত্যেক অংশই সদ্বিদ্বানের আশ্রমে পরিপূর্ণ এবং হিন্দু ও মুসলমান এতদুভয়ে পরম সুখে ও শান্তিতে এখানে বাস করে।" * কলিকাতা হইতে সাসারাম ৪০৬ মাইল দূরে অবস্থিত এবং হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সাসারামের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৫৲ টাকা মাত্র। নানা কারণে প্রাচীন সাসারাম প্রসিদ্ধ, কিন্তু বর্ত্তমানকালে "রোজা" ভিন্ন এখানে দেখিবার আর কিছুই নাই। আগ্রার তাজমহল, বিজাপুরের মশ্‌জিদ্‌ এবং নিজামাধিকৃত গুলবর্গার সমাধি ভিন্ন ভারতবর্ষে এত বড় রোজা আর নাই। এই জগদ্বিখ্যাত রোজা দর্শন করিবার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্‌গানিস্থান, গজ্‌নী, বোগ্‌দাদ্‌, পারস্য প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতেও ভ্রমণকারীরা সাসারামে আগমন করিয়া থাকেন। 'রোজা' ও 'দর্‌গা' মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। বেহার প্রদেশে সাসারামের রোজা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মুসলমান জাতির ইহা এক অদ্ভুত কীর্ত্তি!

মুসলমান শাসনকালে, ভারতবর্ষে যে সকল ব্যক্তি সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পাঠান বংশ এবং "সূর" সম্প্রদায় ভুক্ত প্রসিদ্ধ সের সাহ অন্যতম। ইহাঁর পিতা জৌনপুরের রাজার অধীনে জায়গীরদার ছিলেন। কণোজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া পাঠান সের খাঁ "সের সাহ" নাম ধারণ পূর্ব্বক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্‌-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় এবং অমিত সাহসবলে সের সাহ অতি সামান্য অবস্থা হইতে সম্রাট্‌ পদবীতে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আফগানদিগের আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্জাবের ঝেলম

* পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, হিন্দু শাসনকালে সাসারাম, জৌনপুরের রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল।

নদতটে রোটাশ্ দুর্গ, সের সাহের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি; গৌড় হইতে রোটাশ পর্য্যন্ত সেরসাহ, অতি পরিষ্কার ও প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দুই ধারের রমণীয় বৃক্ষশ্রেণী, সুন্দর সরোবর, গভীর কূপ এবং মনোহর পান্থশালা সমূহ পাঠানদিগের প্রজাহিতৈষীতার চিরস্থায়ী নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান আছে। সাসারামের রমণীয় রোজা, এই সের সাহের অমর কীর্ত্তি। সের সাহ নানা শাস্ত্রে, বিদ্যায় ও নানা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা, পারস্য, আরব্য, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য ও অধিকার লাভ করিয়া তৎকালীয় পণ্ডিতসমাজের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। বাবর, আকবর ও তৈমুরলঙ্গ ব্যতীত এত বড় বিদ্বান সম্রাট্ ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে আর কেহই ছিল না; জনৈক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "Shersha was the Mightiest man of his time." সের সাহ কেবল পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহা নহে, সাহস ও বলবত্তাতেও তিনি অজেয় এবং অতুলনীয় ছিলেন, তাঁহার সময়ে তাঁহার মত বলবান লোক আর দ্বিতীয় পাওয়া যাইত না। তাঁহার প্রকৃত নাম ফকির উদ্দীন সের খাঁ; সের সা তাঁহার উপাধি মাত্র। সের সাহের পিতা সাসারামে বসতিবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এজন্য সাসারামের প্রতি সের সাহের খুব অনুরাগ ছিল; প্রতি বৎসর দুই তিন বার তিনি দিল্লী হইতে সাসারামে আগমন করিতেন। সাসারামকে তিনি "দার্-উল্ সুলতানৎ" অর্থাৎ ভারতের প্রকৃত রাজধানী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সাসারাম নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়, ইহা তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং ঐ স্থানেই তাঁহার সমাধি হয়, এই উদ্দেশে তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, এই জন্য সাসারামে তিনি নিজের সমাধি (রোজা) নির্ম্মাণ করিয়া

গিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাসারামে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। কালিঞ্জরের যুদ্ধে রাজা কীর্ত্তিসিংহের বন্দুকের গুলিতে সের সাহ আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তথা হইতে তাঁহার শবদেহ সাসারামে আনীত হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিল।

রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নগরের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে রোজার অত্যুচ্চ সুবৃহৎ "গম্বুজ" দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি প্রশস্ত ও পুরাতন সরোবরের মধ্যে এই রোজা প্রতিষ্ঠিত। ডশন্ (Dawson) নামে ইংরাজ ভ্রমণকারী ও ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, "আমি যখন সাসারামে গিয়াছিলাম, তখন এই সরোবর এক মাইলের অধিক দীর্ঘ ছিল" এক্ষণে ইহার দীর্ঘ কমিয়া গিয়াছে। অমৃতসহরের শিখদিগের গুরুদরবার (Golden Temple) এইরূপেই অবস্থিত, কিন্তু অমৃত সহরের মন্দির অপেক্ষা এই রোজা অধিকতর উচ্চ ও বৃহৎ। এই সরোবরের চারিদিকে অনেক সুন্দর ও প্রশস্ত ঘাট ছিল, এখন তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান আছে, কোন কোন স্থানে নূতন ঘাট প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। সরোবরে বস্ত্র ধৌত করা, কিম্বা স্নান করার অনুমতি নাই, কেবল একটি ঘাটে স্ত্রীলোকেরা সামান্য সংখ্যায় সায়াহ্নে মুখ হাত ধুইতে পারে, এই ঘাট একজন মুসলমান সন্ন্যাসিনী (ফকিরণী) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন, সাসারাম যে জেলার অন্তর্গত, সেই জিলার জগদীশপুর নামক গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা কুমার সিংহের জন্ম হয়; ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বেহারের ইংরাজ রমণীরা একজন মাত্র বৃটীশ পুরুষের সহিত অতি গোপনে সাসারামাভিমুখে পলায়ন করেন, কুমারসিংহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সাসারামে এই সরোবরের পার্শ্বে তাহাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র প্রয়োগ

করেন। মোটে ১ জন ইংরাজ পুরুষ এবং ১৬ জন বৃটীশ রমণী ছিলেন, ইহাঁরা অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া, কুমারসিংহের অনেক সেনাকে নিহত করিয়া, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। একজন মুসলমান সন্ন্যাসিনী এই অসাধারণ বৃটীশ বীরত্বের দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এমনই বিস্মিত হইয়াছিল যে। ঐ সরোবরের এক পার্শ্বে একটি ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন, ঐ ঘাটের নাম "গদর্ ঘাট" (Mutiny Ghat), উর্দ্দূ ভাষায় গদর্ অর্থে বিদ্রোহ। সরোবরের চারিদিকে কোনও কোনও স্থানে নেমাজের জন্য মুসলমানদিগের দর্গা আছে, পুকুরে বড় বড় মৎস্য খুব প্রচুর; মৎস্যখাদকেরা বলেন, এই মৎস্য খুব সুস্বাদু। অনেকে তীর, তোপ, কুঠার, বড়িশা প্রভৃতি দ্বারা মৎস্য মারে। রোজায় যাইবার জন্য পুকুরের মধ্যে প্রশস্ত পথ আছে, সেই পথ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে উচ্চ সিঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সিঁড়ি দিয়া রোজায় উঠিতে হয়। উঠিবার পরে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন সমুদয় পুষ্করিণীর চারিধারে পুরাকালে সুদৃঢ় মৃন্ময় গড় ছিল, তাহার ভগ্নচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। রোজার চতুপার্শ্বে অতি উচ্চ, অতি দৃঢ় এবং অতি প্রশস্ত ও সুন্দর প্রস্তরের বেষ্টন বা দেওয়াল আছে, ইহা দেখিলে আগ্রার কিল্লার দেওয়ালকে স্মরণ হয়। রোজার চারি পার্শ্বে দুই তবক্ বারাণ্ডা এবং দুই তবক্ "নিগাই" আছে; রোজা খুব উচ্চ। ভিতরে প্রবেশ করিলে প্রথমেই পারাবত, চটুই, বাঁদুর প্রভৃতির চীৎকারে বিরক্ত হইতে হয়; বহুকাল হইতে রোজার গম্বুজের ভিতরে ভিতরে এই সকল পাখিরা বাস করিয়া আছে। রোজার দেওয়ালে কোরাণ খোদিত ছিল, অনেক স্থানে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে অতি মনোহর কারুকার্য্য এখনও দৃষ্ট হয়। রোজার গাঁথুনীর

পরিচয়, লেখনীর বর্ণনায় দেওয়া যায় না। ইহা স্বচক্ষে সম্যক দর্শন না করিলে কৌতুহল মিটে না। গম্বুজটি তিন অংশে বিভক্ত, এক্ষণে দুইটি অংশ বর্ত্তমান, তৃতীয় অংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালের একটি পার্শ্বে "সংগ্-এ-জব্ব্র্" নামক পিঙ্গল বর্ণের প্রস্তরে সের সাহের বিরচিত একটি পারস্য শ্লোক খোদিত আছে, তাহার অর্থ এই—"সম্রাটের কেহই অধীন নহে, কিন্তু মৃত্যুর সকলই অধীন, অতএব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও; ইহকালে মিছামিছি জীবন কাটাইলে, পর কালে কি হইবে, তাহার সম্বাদ রাখ কি? আমি তৃণাপেক্ষাও লঘু, মহাপাপী অপেক্ষাও অধম; হে মহম্মদ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

রোজার চারিদিকে চারিটি প্রস্তর-নির্ম্মিত দর্ওয়াজা আছে। অনেক দিন ভালরূপে সংস্কার (মেরামত) না হওয়ায় দরওয়াজার অবস্থা ভাল নহে। সুখের বিষয় এই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রোজার সংস্কার জন্য প্রতিবৎসর কিছু কিছু টাকা দিতেছেন। খ্রীষ্টীয় ১৮৮২ অব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার প্রথম সংস্করণ হয়। প্রথম দ্বারের দেওয়ালের বামপার্শ্বের একটি বৃহৎ প্রস্তরে ইংরাজি অক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে—

This Renowned Mausoleum
Was Erected
By
Emperor Fakiruddin Sher Shah who died in 1545 A. D. and was buried herein.
Repaired by the
Govt. of Bengal
In 1882.

During the Viceroyalty of Lord Ripon.

Sir Rivers Thompson

Lt. Governor of Bengal.

সাসারামের রোজার স্থান অতি নির্জ্জন, ইহার প্রাঙ্গণ অতি সুন্দর এবং ইহার অভ্যন্তর অতীব গাম্ভীর্য্য ব্যঞ্জক। সাধক ও ভক্তদিগের এই রূপ স্থান সাধনের উপযুক্ত।

সের সাহের রোজার একটু দূরে সের সাহের সহোদরের রোজা আছে, ঐ রোজা এই রোজা হইতে স্বতন্ত্র এবং আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। হোসেন সুর সা (সের সাহের ভ্রাতা) ইহাতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ইহা একটি উদ্যান মধ্যে অবস্থিত, ঐ উদ্যানের চারি পার্শ্বে দেওয়াল। সুর সাহের রোজা, সের সাহের রোজার ন্যায় সুদৃঢ় হইলেও তত সুরম্য নহে বলিলেই হয়, মধ্যে মধ্যে দুই একটি নিম্ব বা আম্র বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোজার পার্শ্বে একটি ছোট মশ্‌জিদ্‌ আছে, তাহাতে কতকগুলি মুসল্‌মান মোল্লা ও ফকির বাস করেন। ইহার ধারে একটি ছোট পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। হোসেন খাঁ সদাই বলিতেন, সত্য ব্যবহার দ্বারা দুষ্টের সংশোধন ও দমন করিবে, কিন্তু তাঁহার এই অভিমতি শেষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; তিনি এক সময়ে কতকগুলি দুষ্ট লোকের হিতসাধন করিতে গিয়া গুরুতর রূপে আঘাতিত হয়েন, এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, "সতের সহিত অসৎ ব্যবহার যেমন দূষনীয় অসতের সহিত সৎব্যবহারও তেমনি অবাঞ্ছনীয়।" হোশেন সুর সাহ এই রোজা মধ্যে সমাধিস্থ হয়েন, তাঁহার রোজার দেওয়ালের পার্শ্বে, ঠিক এ অর্থে নিম্নলিখিত পারস্য-শ্লোক খোদা আছে—

"নেকোই বাবদা গর্দন্ চুণা নশৎ।
কেবদ্ কর্দন্ বজায়ে নেকু মর্দ্দা॥"

এই শ্লোক, ইরাণের মহাকবি সেখ সাদি প্রণীত "গোলেস্তা" কাব্য হইতে হোশেন স্থর সাহের বন্ধুরা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"হিন্দু" শব্দ-তত্ত্ব।

হিন্দু এই ক্ষুদ্র শব্দ লইয়া নানা স্থানে, নানা সময়ে, নানা শ্রেণীর লোকের দ্বারা ঘোরতর আন্দোলন ও আলোড়ন হইয়া গিয়াছে। সার উইলিয়ম জোন্স, আচার্য্য মূর এবং কলিকাতা নগরীর আসিয়াটিক সোসাইটি নাম্নী ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রত্নতত্ত্ব-সভার সুযোগ্য সংস্থাপয়িতা শ্রীল শ্রীযুক্ত বিদোৎসাহী ওয়ারেণ হেষ্টিংস হইতে আরম্ভ করিয়া "আরিয়া" বা 'আর্য্য'সমাজের প্রবর্ত্তক শ্রীল শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতী পর্য্যন্ত, হিন্দুশব্দ লইয়া তর্ক বিতর্ক, বাদ প্রতিবাদ অথবা তণ্ডা বিতণ্ডা করিতে কেহই বাকি রাখেন নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল আন্দোলন ও আলোড়নের পূর্ব্বে "হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে সাধারণের যে সঙ্কীর্ণ জ্ঞান ছিল, ইহার বহুকাল পরেও সেই জ্ঞান-সঙ্কীর্ণতার কিঞ্চিন্মাত্রও বিপ্রকর্ষণ বা সম্প্রসারণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রায় পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে পঞ্জাব দেশান্তর্গত পাতিয়ালা নামক প্রসিদ্ধ মিত্ররাজ্যের নরাধিপতি অশেষ সদ্‌গুণসমালঙ্কৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর স্বকীয় রাজপ্রাসাদে নানা দেশ এবং নানা দিক্ হইতে প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া "হিন্দু" শব্দের

সংজ্ঞা, উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, ভাষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; প্রায় এক সপ্তাহকালব্যাপী শুষ্ক তর্কবিতর্কের পর দেখা গেল, সভাগৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে পণ্ডিত পুরুষদিগের "হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে যে সংস্কার ও বিশ্বাস ছিল, সভা হইতে বহির্গত হইয়া সেই অপূর্ব্ব সংস্কার ও ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই। পঞ্জাব প্রদেশে যখন পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় "হিন্দু শব্দ হীনত্ব-ব্যঞ্জক এবং তজ্জন্য ইহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য" প্রভৃতি উত্তেজনায় হিন্দু সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া হিন্দু নাম পরিত্যাগের পরামর্শ করিতে-ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে "হিন্দু নাম মহত্ত্বব্যঞ্জক সুতরাং এই পবিত্র নাম সর্ব্বথা অপরিহার্য্য," এই ভাবে মেদিনীপুর ইংরাজি স্কুলের তদানী-ন্তন সুযোগ্য শিক্ষক এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের স্বনামখ্যাত সভাপতি শ্রদ্ধেয় বাবু রাজনারায়ণ বসু মহোদয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু মেলায়" এক মনোমোহিনী বক্তৃতা করেন। ঐ বাঙ্গালা বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত ইংরাজি মর্ম্ম, বৃটনের বিশ্বব্যাপী "টাইম্‌স্" পত্রে সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তদনন্তর 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক পুস্তকা-কারে উহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় নিরপেক্ষ সুলেখক এবং বহুদর্শী ও বিচক্ষণ বিচারক সে কালের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে খুব কম দেখা যায়, কিন্তু রাজনারায়ণ বাবু এত বড় পণ্ডিত হইয়াও তাঁহার সুদীর্ঘ এবং হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতায় হিন্দু-শব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও মীমাংসাই করেন নাই। আচার্য্য মোক্ষমূলরের ন্যায় জ্ঞান, বিজ্ঞান, চিন্তা, সভ্যতা প্রভৃতির আলোকে আলোকিত প্রাজ্ঞপুরুষেরাও প্রতীচ্য দেশে বসিয়া হিন্দু-শব্দের অনেক প্রকার অর্থ করিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, হিন্দুশব্দ পূর্ব্বে যেরূপ অর্থব্যঞ্জক ছিল এখনও সেই

অর্থেরই ব্যঞ্জকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং "যমুনা লহরী" প্রণেতার মধুর ভাষায় বলিতে হয়—"হে হিন্দুশব্দ! তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে"; কিন্তু তথাপি এই ভ্রমান্ধকারের মধ্য হইতে সদর্থের আলোকে "হিন্দু" শব্দকে আনয়ন করা প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

হিন্দুশব্দ সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভ্রম সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ভ্রমের সর্ব্বপ্রধান কারণ এই যে, হিন্দুশব্দ লইয়া যাঁহারা আন্দোলন ও আলোড়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ পুরুষই যাবনিক ভাষায় অনভিজ্ঞ। কেবল ইংরাজি বা সংস্কৃত ভাষায় অধিকার থাকিলে, হিন্দুশব্দ রহস্যের উদ্ভেদ করা অতীব কঠিন। য়িহুদীদিগের ইব্রিয় বা হিব্রু ভাষায় অধিকার না থাকিলে হিন্দুশব্দের অর্থ করা দুরূহ।

নৈয়ায়িকেরা বলেন—"অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, কিন্তু ভাব হইতে অভাবের উৎপত্তি নহে।" কেন যে অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি হয় তাহার প্রশস্ত কারণ আছে; "যঃ ক্রয়েৎ স ন পশ্যেৎ যো পশ্যেৎ স ন ক্রয়েৎ" দৃষ্টান্ত দ্বারা ন্যায় শাস্ত্রে অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি সূত্রের মীমাংসা করা হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত অনধিগম্য হইবে বলিয়া আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। 'ঈশ্বর মানুষ নহেন তজ্জন্য তিনি অমানুষিক"—ইহাতে মনুষ্যত্বের অভাব বশতঃ অমানুষত্ব আসিয়া পড়িতেছে। এই অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি সূত্র দ্বারা হিন্দুর "অভাবত্ব" ও "ভাবত্ব" জানিতে পারিলে হিন্দুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রমতে, "তুমি কি নহ, তাহা জানিতে পারিলে, তুমি কি তাহা বলা যাইতে পারে।"

আমরা জানি, মনুষ্য মাত্রেই প্রাণী, কিন্তু প্রাণী মাত্রেই মনুষ্য নহে

প্রাণী মাত্রেই যে মনুষ্য নহে, ইহা না জানিলে, মনুষ্য "মনুষ্য" ভিন্ন অন্য জীব নহে, ইহা জানিতে পারা যায় না। হিন্দু শব্দের আন্দোলক ও ব্যাখ্যাকারীদিগের ইহাই ভুল, এই এক ভুল হইতে ক্রমে ক্রমে বহু ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। ভুলের সংখ্যা এত অধিক যে, "যাহার সর্ব্বগায়ে ব্যথা, তাহার ঔষধ দিব কোথা"—এই প্রবাদের সর্ব্বদা স্মরণ হয়। দুই একটি ভ্রম হইলে আশু তাহার সংশোধন করা যাইত, কিন্তু বহুভুলের সম্যক সংশোধন কোথায়? তথাপি কতকগুলি গুরুতর ভুলের সংশোধন করিতে আমরা বিনয় সহকারে অগ্রসর হইতেছি, অগ্রে এই ভুলগুলির সংশোধন না হইলে "হিন্দু" শব্দের প্রকৃত অর্থের নিরাকরণ হওয়া কঠিন।

প্রথম ভুল।

অনেকেই বলেন, "মুসলমানেরা ভারতভূমে রাজ্যবিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে পাঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিতে প্রয়াসী হইয়া "আটকে" সিন্ধুনদতটে উপনীত হয়েন। এই সিন্ধু হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি, কারণ স অক্ষর পারস্য ভাষায় হ বলিয়া উচ্চারিত হয়।" ইহার প্রমাণ স্থলে তাঁহারা এই দৃষ্টান্ত দেখান যে, "সপ্তাহ" শব্দ পারস্য ভাষায় হপ্তা বা হপ্তাহ বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ইহাঁদের এই অভিমতি এবং দৃষ্টান্ত এতদূর হাস্যরসোৎপাদক যে, বলা যায় না। যাঁহারা পারস্য ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে এই যুক্তি নিতান্তই অপদার্থ, কারণ ইহা একেবারেই ভিত্তিশূন্য এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পারস্য ভাষায় শীণ ষীণ সোয়াদ এবং সে অর্থাৎ শ ষ স স এই চারিটি আছে। এই ভাষার তিন সহস্র বা চারি সহস্র পুস্তক যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলেও

কোথাও শ ষ স স এই চারি অক্ষর হ বলিয়া উচ্চারিত হইয়াছে, ইহা কেহই দেখাইতে পারিবেন না"। প্রমাণ—

"তো গোয়েদ্‌কে হরাকস্‌কে দর্‌
রন্‌জে তাব্‌।
দোয়ায়ে কুনদ্‌ মন্‌ কুনম্‌ মুশ্‌ৎজাব্‌।"
(সেকেন্দর নামা)

এই প্রসিদ্ধ পারস্য শ্লোকে শ এবং স ঠিক তাহাদের আদি উচ্চারণেই উচ্চারিত হয়, "হ" বলিয়া উচ্চারিত হয় না, তাহা হইলে "হরাকস্‌কে" হরাকহকে এবং "মুশ্‌ৎজাব্‌" মুহৎজাব্‌ হইয়া যাইত, কিন্তু তাহা হয় নাই—হয় না এবং হইতে পারে না; কারণ পারস্য ভাষায় "হ" একটি স্বতন্ত্র অক্ষর, এই ভাষায় কেবল একটি হ নহে, "হাম্‌জা" এবং "হে" এই দুইটি হ (H) বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুতরাং বর্ণমালার কোনও অক্ষরকে হ বলিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই। ফ্রেঞ্চ ভাষায় ট নাই এবং চ নাই, এই জন্য ইংরাজি "That" "Put" "But" শব্দগুলিকে দ্যাৎ পুৎ, বৎ বলিয়া উচ্চারণ করিতে হয় এবং সেই জন্য "চন্দননগর" শন্দননগর এবং "Chateau" শাতো বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। আরবী ভাষায় চ নাই সুতরাং চৌকব্‌ শব্দ কৌকব্‌ বলিয়া উচ্চারণ করা হইয়া থাকে; ইংরাজিতে দ নাই সুতরাং দামোদর শব্দকে ডামোডর বলা হয়; এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, বর্ণমালার অক্ষরের অভাব থাকিলে শব্দান্তরের সহযোগে উচ্চারণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু পারস্য ভাষার বর্ণমালা ফ্রেঞ্চ বা ইংরাজি বর্ণমালা নহে; ইহাতে স স্থানে হ বলিবার অথবা হ স্থানে স বলিবার আদৌ আবশ্যকতা নাই। আর একটি প্রমাণ দেখুন—

হবিবে খোদা আস্‌রফ্‌ এ আম্বিয়া।
কেয়ার্শে মজিদষ্‌ বুয়দ্‌ মুৎতেকা॥
(পান্দেনামা)।

এই শ্লোকে শ ষ স এই তিনটিই রহিয়াছে এবং তিনটির কোনটিই হ বলিয়া উচ্চারিত হয় না। আরও দুই একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক শুনুন—

করিমা ববক্‌শা বর্‌ হালেমা।
কে অস্তম্‌ আঁষিরে কমন্‌ দে হাওয়া। ১

রাহে রাশ্‌ৎ বেরো অগর্‌ চে দূরশ্‌ৎ।
জন্‌ বেওয়া মকুন অগর্‌ চে হুরস্‌ৎ॥ ২

সা! কারে মা সা! ফিক্‌রে মা,
সা! আজারে মা।
কার্‌সাজে কারে মা, সা! দর্‌ কারে মা॥ ৩

উপরিউদ্ধৃত তিনটি শ্লোককে যতগুলি শ ষ স আছে তাহাদের একটিও হ হয় না; কেবল এই শ্লোকগুলিতে হয় না তাহা বলিতেছি না, কোনও পারস্য শ্লোকেই তাহা হয় নাই এবং হয় না ও হইতে পারে না, হইলে ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়, কারণ এরূপ ব্যবহার পারস্য ভাষার সাধারণ বা অসাধারণ নিয়ম নহে। তৃতীয় শ্লোকে কতকগুলি স দেখিতে পাইবেন, ইহাদের একটিও হ হইতে পারে না। এইরূপে বহু শ্লোক অথবা পারস্য ভাষার সমুদয় গ্রন্থগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, পারস্যে "স" হ হয় না অথবা "হ" স হয় না। সপ্তাহকে হপ্তা বলিয়া যে যুক্তি দেখান হয়, সে যুক্তির কথা আমরা পরে উত্থাপন করিব। এখন বুঝা গেল, সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশে বা বিপরীত উচ্চারণে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি হয় নাই।

দ্বিতীয় ভুল।

কেহ কেহ বলেন, পারস্য ভাষায় কেবল স স্থানে হ হয়, এমন নহে; হ স্থানেও স হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য যুক্তি! কি অদ্ভুত বিচার! আন্দোলনকারী এক নিশ্বাসে বলিতে চাহেন, স স্থানে হ হয়, আবার দ্বিতীয় নিশ্বাসে বলিতে কুণ্ঠিত নহেন যে, হ স্থানে স হইয়া থাকে। যদি মোটেই স নাই, তাহা হইলে হ স্থানে স কেমনে আসিতে পারে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফ্রেঞ্চ ভাষায় ট নাই এইজন্য That দ্যাৎ হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া কি কোন শব্দ আবার দ্যাট্ বলিয়া উচ্চারিত হইতে পারে? পারসী ভাষায় "হ্" হ উচ্চারিত হয়, "হ্" স হয় না। প্রমাণ—

হর্চে বুয়দ্ দর্ জাঁহা শন্তে পর বর্দ্দিগার।
(গোলেস্তা)

এই শ্লোকে "হর্চে" শব্দ সর্চে বলিয়া উচ্চারিত অথবা "জাঁহা" শব্দ জাঁসা বলিয়া উচ্চারিত হয় না। আকবরের শাসনকালে তাঁহার সভায় ফৈজি নামে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি ছিলেন, এই ফৈজি গদ্যে এবং পদ্যে সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন। রামায়ণের স্থানবিশেষ লেখা আছে "(তদনন্তর) বৃক্ষতলে উপবেশন পূর্ব্বক অত্যন্ত মনোদুঃখের সহিত শ্রীরামচন্দ্র মহারাজা বলিলেন, হায়! হায়! হায় জানকী! (তোমার বিহনে) প্রত্যেক (তরু) পত্র, প্রত্যেক পশু, প্রত্যেক জলচর জীব" ইত্যাদি; ইহারই অনুবাদ করিতে গিয়া ফৈজী লিখিতেছেন—

"দর্ বালায়ে দরখ্ৎ নীশান্দা কুনী বাআফ্‌শোশ্ বশিয়ার্ ও বথুবী মহারাজা শিরি রামচন্দর্ গোফ্ৎ, অ্যায়! আয়! হা! হা! হা জানকী! হর্ বর্গ্, হর্ হেওয়ান্, হর্ হিক্মৎ" ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়! এই অনুবাদে 'হ' অক্ষরের ছড়াছড়ি দেখিলেন কি? বলুন দেখি, এই হ গুলি স, উচ্চারিত হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ হয় কি না? সম্পূর্ণ অর্থশূন্য বাক্যাবলীর সৃষ্টি হয় কি না? সুতরাং আন্দোলনকারীদিগের দ্বিতীয় সংস্কার ভ্রমাত্মক।

তৃতীয় ভুল।

কেহ কেহ বলেন, "পারস্য ভাষায় স অক্ষর হ না হইলেও সিন্ধুশব্দ হইতে হিন্দুশব্দের যে উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।" কিন্তু কেন "হইয়াছে" তাহার কোনও যুক্তি বা প্রমাণ আছে কি? অথবা "হইয়াছে" শব্দটি কেবল কল্পনারাজ্যের ব্যাকরণ হইতে উদ্ভূত? প্রকৃত কথা এই, পঞ্জাবের নদবিশেষ সিন্ধু হইতে হিন্দুশব্দের উদ্ভব হয় নাই। প্রমাণ——মুসলমান শাস্ত্র। মুসলমান ধর্ম্ম এবং মুসলমান জাতির অতি প্রাচীন নিয়ম অনুসারে জল অনুসারে স্থলের নাম অথবা স্থল অনুসারে জলের নামকরণ করিবার বিধি নাই, এই জন্য কোনও নদ, নদী, সরোবর, কূপ বা সমুদ্রানুসারে কোনও দেশ, গ্রাম, নগর বা প্রদেশের নামকরণ করা হয় নাই। হদিশ্ সরিফ্ নামক একখানি প্রাচীন আরব্যগ্রন্থ আছে, তাহা মুসলমান সমাজে কোরাণের মত মাননীয়; মুসলমানের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বরের এবং মহম্মদের যে সকল বাক্য কোরাণ সরিফে সংগৃহীত হয় নাই, হদিশ্ সরিফে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ হদিশ্ সরিফের একটি গল্পের মধ্যস্থলে লিখিত আছে—"বিবি ফতিমা তাঁহার পিতা মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করায়, হজ্‌রৎ আলেসেলাম রসুলেল্লা মহম্মদ সাহেব আজ্ঞা করিলেন যে, জল অনুসারে স্থলের (দেশের) নামকরণ করা আমাদের (প্রাচীন কোরিব জাতি-দিগের) নিয়ম নহে।" ইত্যাদি। মহম্মদের জীবনচরিতে মূর সাহেব

লিখিতেছেন—"(তদনন্তর) তাঁহারা সেই প্রাচীন স্থানে পুনরাগমন করিলে, ঐ স্থানের পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডের নামকরণের আবশ্যকতা হইল, তাহাতে তিনি (মহম্মদ) স্পষ্টই বলিলেন, আবে জুম্ জুম্ হইতে ইহার নামকরণ হইতে পারে না, কারণ কূপ (জল) হইতে নামকরণ করা নিয়ম নাই।" (Muir's Life of Mahomet). কলিকাতা হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারপতি মিষ্টর জষ্টিস আমির আলি বাহাদুর তাঁহার জগদ্বিখ্যাত মহম্মদ চরিত্রে লিখিয়াছেন, "জল হইতে তাঁহারা (মুসলমানেরা) নামকরণ করিয়া কোনও দেশকে প্রসিদ্ধ করেন নাই।" (Spirit of Islam—By Mr. Justice Amir Ali). তদ্ভিন্ন মুসলমানদিগের ভূগোলে এরূপ উদাহরণ আমরা পড়ি নাই। সুতরাং সিন্ধু নদ হইতে এত বড় দেশের নাম হইয়াছে ইহাও সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। এখন বুঝা গেল, আন্দোলনকারীদিগের তৃতীয় যুক্তি ভ্রমাত্মিকা। তবে একথা স্বীকার করি, সমগ্র মুসলমান-সাহিত্যে দুইটি মাত্র—কেবলমাত্র দুইটি শব্দ আছে যদ্দ্বারা জল দ্বারা স্থলের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়, সেই শব্দটির নাম "দোয়াব" (Doab), ইহারই গ্রীক নাম Delta, দোয়াব শব্দ—দো+আব এইরূপে নিষ্পন্ন, দো অর্থে দুই এবং আব অর্থে জল। আর একটী শব্দের নাম পঞ্জাব অর্থাৎ পাঁচটি জল (নদ)। এখানে কথা এই যে, দোয়াব অর্থে দুইটি জলের মধ্যবর্ত্তী ভূমিখণ্ড বুঝা যায়, মধ্যবর্ত্তী দেশ বা নগর বুঝায় না। "পঞ্জাব" শব্দ দেশবাচক, জাতি বা ধর্ম্ম-বাচক নহে; পঞ্জাব শব্দ অচৈতন্য বাচক নপুংসক, জীববাচক পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ নহে। পঞ্জাব, সমগ্র ভারতবর্ষের বা হিন্দুধর্ম্ম পালনকারী সমগ্র নরজাতির পরিচায়ক নহে, তদ্ভিন্ন "পঞ্জাব" নাম প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের তৈয়ারি নহে, হিন্দুদের পঞ্চনদ শব্দের ইহা পারস্য

অনুবাদ মাত্র। সুতরাং সিন্ধু নদ হইতে হিন্দুজাতির নামকরণ সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

চতুর্থ ভুল।

যাঁহারা ব্যাকরণ অনুসারে সিন্ধু শব্দ হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি বলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত এই যে, সপ্তাহ শব্দ পারস্যে হপ্তা বলিয়া উচ্চারিত হয়; ইহা সম্পূর্ণ বালকত্বের পরিচায়ক। আন্দোলনকারী মহাশয়েরা আন্দোলনের উষ্ণতায় বোধ হয় ইহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন যে, সংস্কৃত এবং পারস্য, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। সপ্তাহ এবং হপ্তা (বা সপ্তাহ) এই দুইটি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, ইহাদের একটি সংস্কৃত, অপরটি পারস্য; সাত দিনের সমষ্টি কালকে সংস্কৃতে সপ্তাহ এবং পারস্যে হপ্তা কহা হইয়া থাকে; যেমন সপ্তাহ একটি সংস্কৃত শব্দ তেমনি হপ্তা একটি পারস্য শব্দ, সুতরাং সপ্তাহ শব্দের হপ্তা অথবা হপ্তা শব্দের সপ্তাহ রূপে উচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সংস্কৃত সপ্তাহ শব্দ পারস্যে হপ্তা বলিয়া উচ্চারিত হয় না, হপ্তা একটি স্বতন্ত্র ভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দ। যেমন———

"হপ্তাশদ্ হপ্তাদ্ কলব্ দিদম্।"

(মোলানা রোমী)

এখন বুঝিলেন কি, সপ্তাহ শব্দ পারস্যে হপ্তা বলিয়া উচ্চারিত হয় না?

পঞ্চম ভুল।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দু শব্দ হিন্দ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহাঁদের মতে "হিন্দ্ শব্দের অর্থ কালো (কৃষ্ণবর্ণ)" পারস্য বা আরব্য ব্যাকরণ অনুসারে হিন্দ্ শব্দ হইতে হিন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হয় না এবং হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দ্ অর্থে কালো (কৃষ্ণ) নহে। ইংরাজিতে

যাহাকে Chemistry এবং বাঙ্গালায় যাহাকে রসায়ন শাস্ত্র বলে, পারস্যে তাহাকে "কিমিয়া" বলা হইয়া থাকে। এই কিমিয়া গ্রন্থাদিতে পারস্য ভাষার সকল প্রকার রংএর নাম ও উপকরণ লেখা আছে, এলেম্-এ-মন্তিক গ্রন্থাদিতেও দৃষ্টান্ত জন্য নানা রংয়ের বিবরণ দেখা যায়। পারস্য ভাষায় শ্বেত বর্ণের নাম সফেদ্, পীতবর্ণের নাম জর্দা, হরিদ্রা বর্ণের নাম জর্‌রী, লোহিত বর্ণের নাম সুরথ্, ধূসর বর্ণের খাকি, সবুজ বর্ণের নাম সব্‌জ্, নীলবর্ণের নাম আশ্‌মনী এবং কৃষ্ণ (কালো) বর্ণের নাম "সেয়া"। পারস্য ভাষায় এই সেয়া শব্দ ভিন্ন কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক আর কোনও শব্দ নাই, এই শব্দই আপামর প্রসিদ্ধ এবং কথোপকথনে ও গ্রন্থাদিতে ইহাই পুরাকাল হইতে প্রচলিত। পারস্য "সেয়াপোষ," "সেয়ালিবাশ্," "সেয়াহি" প্রভৃতি ইহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সুতরাং হিন্দ্ শব্দ কৃষ্ণত্ব ব্যঞ্জক নহে এবং হিন্দ্ শব্দ হইতে হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হয় নাই।

ষষ্ঠ ভুল।

কেহ কেহ বলেন, "হীনতা বুঝায় বলিয়া হিন্দু নাম মুসলমানেরা প্রয়োগ করিয়াছে, অথবা হিন্দু নাম হীনত্বব্যঞ্জক।" ইত্যাদি। হিন্দু শব্দে হ্ অক্ষরের উত্তর হ্রস্ব ইকার আছে, হীন শব্দের হ অক্ষরের উত্তর দীর্ঘ ঈ রহিয়াছে, তবে মিলিল কেমনে? হিন্দু শব্দের অভ্যন্তরে এমন কোনও প্রকৃতি বা প্রত্যয় নাই যদ্দ্বারা হীনতা বুঝাইতে পারে, সুতরাং আন্দোলনকারীদিগের এই যুক্তি কাল্পনিক। পারস্য ভাষায় হিন্দ্ শব্দ হীনত্বব্যঞ্জক হয় না।

সপ্তম ভুল।

কেহ কেহ বলেন—"তুরস্ক ভাষায় হিন্দা নামে এক শব্দ আছে তাহার অর্থ কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসী। এই হিন্দা শব্দ হইতে হিন্দু শব্দ

উদ্ভূত হইয়াছে।” বাস্তবিক তুরস্ক ভাষায় হিন্দা শব্দ আছে এবং সেই শব্দের অর্থ যদিও কাফের্ নহে, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ Foreigner, Stranger—বিদেশী,উর্মী, অপরিচিত, অজ্ঞাত প্রভৃতি বুঝাইতে পারে। তাহা হইলেও আন্দোলনকারীদিগের যুক্তি স্থির থাকিতেছে না। কারণ—প্রথমতঃ হিন্দা শব্দে হীন বা কাফের বুঝায় না। দ্বিতীয়তঃ হিন্দা শব্দে অবিশ্বাসী বুঝায় না। তৃতীয়তঃ তুরস্কেরা প্রথমে ভারতবর্ষ জয় করিতে আইসে নাই, অন্য দেশের মুসলমানেরা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। চতুর্থতঃ, যাহারা সর্ব্বপ্রথম ভারতাক্রমণকারী তাহাদের সহিত তুরস্কদের সম্পর্ক খুব কম ছিল, বিশেষতঃ ভাষার সম্বন্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। পঞ্চমতঃ হিন্দা শব্দ হইতে কোনও উপায়েই হিন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হয় না। ষষ্ঠতঃ মুসলমান আক্রমণকারীদিগের বহু পূর্ব্বে গ্রীক, রোমান, য়িহুদী, আসিরিয়ান, বাবিলোনিয়ান, মিশরী প্রভৃতি জাতিদিগের নিকটে ভারত খুব সুপরিচিত ছিল, আরব্য ব্যবসায়ীরাও এখানে যাতায়াত করিত, সুতরাং “অপরিচিত দেশ” বলিয়া আখ্যাত করিবার কোনও কারণ নাই। ভারতের বিশেষ সমাচার সংগ্রহ না করিয়া যবন এ দেশে আসে নাই; সুতরাং হিন্দা শব্দ হইতে হিন্দু নাম হইয়াছে এ কথা বলা অযৌক্তিক। সপ্তমত' হিন্দু জাতির সাহস, বীর্য্যবত্তা, স্বদেশহিতৈষীতা, স্বধর্ম্মপরায়ণতা, রাজভক্তি প্রভৃতি দর্শন করিয়া মুসলমানেরা এতাদৃশ আশ্চর্য্য ও সন্তোষলাভ করিয়াছিল যে, তাহারা হিন্দুদিগকে কোনও নীচ উপাধিতে অভিহিত ‘করে নাই, সুতরাং হীনত্ব-ব্যঞ্জক কোনও শব্দ হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি নহে।

অষ্টম ভুল।

অনেকে হিন্দ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন না, তথাপি বলিতে সাহস

করেন যে, "হিন্‌দ শব্দ হীনত্ব, নীচত্ব, কৃষ্ণত্ব, মলিনত্ব প্রভৃতি অপগুণের পরিচায়ক।" বাস্তবিক, পারস্য ভাষায় হিন্‌দ শব্দ কোনও গুণ বা ধর্ম্মের পরিচায়ক নহে, ইহা দেশের পরিচায়ক; হিন্‌দ শব্দ হইতে হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হয় নাই, India শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে বলেন, গ্রীকদিগের Indicus শব্দ হইতে India শব্দের উৎপত্তি, এ কথাও ভ্রমাত্মক, তাহা পরে বুঝাইব। হিন্‌দ অর্থে হীনত্ব বুঝায় না, ভারতবর্ষ বুঝায়; কেন ভারতবর্ষ বুঝায়, তাহাও পরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। হিন্‌দ অর্থে ভারতবর্ষ বুঝায়, ইহা সাধারণ কথা; সামান্য উর্দ্দু বা পারস্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা জ্ঞাত আছেন। প্রমাণ "সেতার—এ—হিন্‌দ্" (অর্থ ভারত-নক্ষত্র The Star of India), "তাজিরাৎ—এ—হিন্‌দ" (অর্থ ফৌজদারী আইন The Indian Penal Code), কৈশর—এ—হিন্‌দ (The Ceaser Emperor—of India), আহেল্—এ—হিন্‌দ (অর্থ ভারতবাসী) ইত্যাদি। এখন বুঝা গেল, হিন্‌দ শব্দ ইণ্ডিয়াবাচক, হীনত্ব বা মলিনত্ব বাচক নহে।

আর ভুল দেখাইতে ইচ্ছা করি না। প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। যাহা কিছু প্রয়োজনীয় কথা তাহা বলিয়াছি। কেবল একটা কথা বলিবার বাকী আছে, প্রাচীন বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে "হিন্দু" শব্দ আছে কি না? উত্তর—"নাই।" কিন্তু বেদের কিছু পরকালীন বা সমসাময়িক শাস্ত্রে "হিন্দু" শব্দ আছে।

"হিন্দু" শব্দ সম্বন্ধে আমি সাধারণতঃ আটটি ভুলের কথা উল্লেখ করিয়াছি; আরও অনেক ভুলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধকে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করা শোভা পায় না, এজন্য সমুদয় ভুলগুলির উল্লেখ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি পূর্ব্বে

দেখাইয়াছি, পরস্যভাষায় শ ষ স স এই চারিটি বর্ত্তমান, সুতরাং স স্থানে হ অথবা হ স্থানে স হওয়ার কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমি ইহাতে দেখাইয়াছি যে, সংস্কৃত সপ্তাহ এবং পারস্য হপ্তা শব্দ একার্থবাচক শব্দ হই-লেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন শব্দ, পারস্যভাষায় হপ্তা শব্দ মৌলিক এবং রূঢ়ি শব্দ, সুতরাং সংস্কৃত "সপ্তাহ" শব্দকে অপভ্রংশে হপ্তা করিবার আদৌ আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃতভাষায় 'শিব' শব্দ আছে, য়িহুদীদের ইব্রিয় (Hebrew) ভাষাতেও শিব শব্দ আছে; হিন্দুজাতির মধ্যে শিব শব্দ, ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে পারে, য়িহুদীদের মধ্যেও তাহাই।* হিন্দু-দের শিবশব্দ তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ইহা দেখান যায়, কিন্তু সকল ধাতুরই অর্থ মঙ্গল বা কল্যাণ;—"শিবম্" কল্যাণম্, মঙ্গলম্ ইত্যাদি। য়িহুদীদিগের 'শিব' শব্দ 'শূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন; উভয় ভাষার শিব শব্দ একার্থবাচক হইলেও এক ধাতুবাচক নহে। কারণ, হিব্রুভাষায় শূ অর্থে লোহিতবর্ণ। য়িহুদী, আর্ম্মেণি, সারাকীণ প্রভৃতি জাতিরা লোহিতবর্ণকে মহাপবিত্রতা এবং মহা কল্যাণের চিহ্ন বলিয়া গণ্য করেন, এইজন্য শূ ধাতু হইতে উৎপন্ন শিব শব্দ ঈশ্বর-অর্থবাচক। এইজন্য য়িহুদী ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ঈশ্বর অগ্নির মত লাল (লোহিত)। প্রমাণ—"Our God is a consuming fire" অর্থাৎ আমাদের ঈশ্বর প্রজ্বলিত বৈশ্বানর। ইহা য়িহুদীবংশাবতংস মহাত্মা সাধুপলের উক্তি। (বাইবেলের New Testment অংশের

---

* বাইবেলের New Testament অংশের The Acts of the Apostles নামক পুস্তকের উনবিংশ অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোক পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। "And there were seven sons of one Sceva, a Jew." ইত্যাদি। ইংরাজীতে য়িহুদীদের 'শিব' শব্দ Sceva রূপে লিখিত হয়, কিন্তু উচ্চারণে "শিব" হয়। শিবনামে য়িহুদীদের এক মহাবীরও ছিলেন।

Thd Hebrews গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোক দেখুন।) "The Lord appeared unto him (Moses) in a flame of fire." অর্থাৎ "মুশার সম্মুখে প্রভু (ভগবান) অগ্নিশিখামধ্যে আবির্ভূত হইলেন।" (বাইবেলের Old Testament অংশের Exodus পুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের ২য় শ্লোক দেখুন।) এখন বলুন দেখি, সংস্কৃতের "শিব" এবং য়িহুদীদের "শিব" কি একই শব্দ? ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কি ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ধাতুমূলক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ নহে? তবে কেমন করিয়া সপ্তাহ ও হপ্তা শব্দ এক বলিতে সাহসী হইতেছেন? এখন প্রশ্ন এই, তবে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পারস্যভাষায় হিন্দ্ শব্দ ভারতবর্ষ-বাচক শব্দ, যথা—তাজিরাত-এ-হিন্দ্, সেতার-এ-হিনদ্, কৌকব-এ-হিন্দ্, তামর্-এ-হিন্দ্ * ইত্যাদি। এই হিন্দ্ শব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এক্ষণে আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত, এই আলোচনায় হিন্দুশব্দের প্রকৃত অর্থ নিষ্পন্ন হইবে। আর এক কথা প্রথম হইতে বলিয়া রাখা ভাল, পারস্য ব্যাকরণানুসারে হিন্দুশব্দ নিষ্পন্ন হয় না সুতরাং "হিন্দু" পারস্য শব্দ নহে। এই কথার উপর তর্ক চলে না; পারস্য ভাষায় অধিকার থাকিলে আমাদের নিষ্পত্তি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। "হিন্দু" শব্দ যে পারস্য শব্দ নহে, ইহার প্রমাণ দিয়াছি, আরও প্রমাণ পরে দিব।

এক্ষণে কতকগুলি প্রশ্ন ধার্য্য করিয়া রাখা উচিত, সেই প্রশ্নমত নিষ্পত্তি হইলে বুঝিবার এবং বুঝাইবার উপায় আরও সরল এবং সুখকর হইয়া উঠিতে পারে।

---

* ইংরাজী Tamarind পারস্য তামর্-এ-হিন্দ্ শব্দের অবিকল রূপান্তর। হিন্দ্ অর্থে ভারতবর্ষ, তামর্ অর্থে অম্ল, "এ সম্বন্ধবাচক; অর্থাৎ ভারতের অম্ল।

প্রশ্ন।

১ম। হিন্দু শব্দ প্রথমে কোন্ গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে?

২য়। হিন্দু শব্দ সর্ব্বপ্রথমে কাহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হয়?

৩য়। "হিন্দু" শব্দের বয়ঃক্রম কত?

৪র্থ। কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে হিন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে?

৫ম। গ্রীক ও মুসলমানদিগের সহিত "হিন্দু" শব্দের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না?

৬ষ্ঠ। হিন্দু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

৭ম। ঐ অর্থ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, সমাজ বা জাতীয় গৌরবের পরিপোষক কি না?

৮ম। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও হিন্দু রাজা "হিন্দু" নাম ব্যবহার করিয়াছেন কি না?

৯ম। বেদে হিন্দু শব্দ আছে কি না?

১০ম। আর্য্য শব্দের সহিত হিন্দু শব্দের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

এই সকল প্রশ্ন বা "ইস্যুর" যদি ঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হওয়া যায়, তাহা হইলে আমার পক্ষে "ডিক্রী" একথা নিশ্চয়। যে সকল প্রশ্ন ধার্য্য করা গিয়াছে, তাহারই উত্তর দিতে আরম্ভ করিলাম; ডিক্রী বা "রায়" অবশ্য পাঠক-হাকিমের হাতে।

মহাবীর মহম্মদ, খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চশত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের প্রায় সার্দ্ধেক শত বৎসর পরে ভারতে মুসলমানের আগমন ও আক্রমণ। হিন্দু শব্দ যদি মুসলমানের তৈয়ারি শব্দ হয়, তাহা হইলে এই শব্দের বয়ক্রম দ্বাদশ শত বৎসরের অধিক নহে, কিন্তু পাঠক মহাশয় ইহা শুনিয়া বোধ হয় আশ্চর্য্য হইবেন যে, খৃষ্ট জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু শব্দ বর্ত্তমান ছিল। জিজ্ঞাস্য

এই যে, তবে কি বেদের মধ্যে এই শব্দ ছিল? উত্তর "না"। হিন্দু শাস্ত্রে ছিল না, মুসলমান বা বৌদ্ধ শাস্ত্রেও নয়! তবে কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে পাঠক মহাশয়কে একটা নূতন কথা শুনাইব। যে পার্শী জাতিকে হিন্দুরা এক্ষণে ম্লেচ্ছ মধ্যেই গণ্য করিয়া রাখিয়াছেন, সেই পার্শীকদিগের প্রাচীনতম অগ্নি-উপাসনাকারী ঋষি বা মনীষীগণ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের সেই অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ জেন্দাবস্তা গ্রন্থে ইহা (অর্থাৎ হিন্দুশব্দের প্রাথমিক রূপ) ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু য়িহুদীদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট মধ্যেও হন্দ্ শব্দ পাওয়া যায়; এবং বেদের যেমন নিরুক্ত ব্যাকরণানুসারে অনেক বৈদিক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তেমনি এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থেরও বৈয়াকরণিকদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে হিন্দু শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যখন পার্শী এবং য়িহুদী এই উভয় জাতির গ্রন্থেই উহা পাওয়া যাইতেছে, তখন দেখা উচিত, ইহাদের মধ্যে কোন্ গ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর? জেন্দাবস্তা এবং ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট এতদুভয় গ্রন্থ যে সমসাময়িক নহে, তাহা অনেকবর্ষকাল ব্যাপিয়া মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। * ইংরাজ খৃষ্টানেরা বলেন, য়িহুদীদের পুরাতন টেষ্টামেণ্ট খৃষ্টজন্মের ৫ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সংগৃহীত হয়; জেন্দাবস্তা সম্বন্ধে খৃষ্টানেরা যাহাই বলুন, পার্শীক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন "Our Zendavesta is as ancient as the Creation; it is as old as the Sun or the Moon," জেন্দাবস্তা হইতে ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ যে নবীন, তাহার কয়েকটি প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। প্রমাণ—

---

* এ কথার প্রমাণ জন্য কাহারও উক্তি উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। প্রত্যেক বাইবেলের Chronology মধ্যে ইহা লেখা আছে। খৃষ্টের পঞ্চ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জগতের সৃষ্টি ইহাই খৃষ্টানের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া Old Testament গ্রন্থকে ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন।—

১ম।—য়িহুদীদের শাস্ত্র হিব্রুভাষায় লিখিত, পার্শীদের শাস্ত্র জেন্দভাষায় লিখিত। জেন্দভাষা, হিব্রুভাষা হইতে প্রাচীনতর। হিব্রু বা ইব্রীয় ভাষা অনার্য্য সেমেটিকদিগের এবং চাল্ডিকদিগের ভাষার সমসাময়িক; জেন্দভাষা আর্য্য-পার্শীদিগের ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্মিলিত।

২য়।—ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের বর্ণিত অনেক স্থান নবীন; এই নবীন স্থান বা অরণ্য সমূহের, জেন্দাবস্তা প্রচারকালে, অস্তিত্ব ছিল না।

৩য়।—ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে সভ্যজনোচিত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, আচার্য্য হল (Hall's "Essays on the Parsis") এবং সমাজতত্ত্ববিদ মালাবারী (B. M. Malabari, Esqr.) তাঁহার গুজরাটি ভাষায় বিরচিত পার্শীসমাজ নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, প্রাচীন পার্শীকজাতির মধ্যে মনুর আর্ষ বিবাহের মত সভ্যবিবাহপ্রথা ছিল না। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজে যে সকল বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, জেন্দাবস্তায় তাহার বর্ণনা আছে।

৪র্থ।—অগ্নি-উপসনা পৃথিবীর অতি প্রাচীন জাতির প্রাচীন উপাসনা মধ্যে গণ্য। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট যখন প্রচারিত হয়, তখন অগ্নি-উপাসনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, জেন্দাবস্তার সময়ে ইহার বহুল প্রচার ছিল।

৫ম।—জেন্দাবস্তায় য়িহুদী শব্দ বা য়িহুদী জাতির উল্লেখ নাই, ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থের অন্যূন নয়টী স্থানে পার্শীর উল্লেখ আছে।

৬ষ্ঠ।—পার্শীকেরা য়িহুদীদেশ ও য়িহুদী জাতিকে জয় করিয়া তদ্দেশে অনেক দিন রাজত্ব করেন, ইহা বাইবেলের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। য়িহুদীদের কেহ প্রাচীন পারস্যদেশে বা পার্শী জাতিকে

জয় করে নাই। পার্শীক রাজারা যখন য়িহুদী দেশে আইনজারী করেন, তখন য়িহুদী জাতির নিজের আইন ছিল না। (বাইবেলের Kings এবং Solomon নামক গ্রন্থে ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে।)

৭ম।—ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে লেখা আছে, প্রাচীন য়িহুদী জাতির মতে Laws of the Parsis are unalterable (অর্থাৎ) "আমাদের রাজন্যবর্গের (পার্শীদিগের) আইন পরিবর্ত্তনশীল নহে।" পার্শীদের আইন কেন পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে না অথবা পরিবর্ত্তনশীল করা উচিত নহে, তাহার উত্তর বাইবেলেই পাওয়া যায়। য়িহুদীদিগের বিশ্বাস ছিল, মানুষ মরিলে তাহার প্রেতাত্মা মনুষ্যসমাজে ফিরিয়া আসিয়া কথা কহিতে পারে। যদি রাজার প্রবর্ত্তিত আইন তাঁহার মৃত্যুর পরে অন্য কোনও রাজা অথবা প্রজাসমিতি বদ্‌লাইয়া লয়, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির ভ্রমণশীল আত্মা, পরিবর্ত্তনকারীর উপরে প্রতিহিংসা লইবেন। * এখন দেখুন, মৃত ব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধে জেন্দাবস্তায় কি লেখা আছে। বর্ত্তমান ইংরাজি বর্ষের প্রথমে যখন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মিঃ গোবিন্দ রাণাডে ভবলীলা সম্বরণ করেন, তখন কলিকাতার 'বেঙ্গলি' নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের বোম্বাইস্থ খ্যাতনামা পার্শী সংবাদদাতা মিষ্টার ডি, ই, বাচা মহাশয় ঐ পত্রে রাণাডে মহাশয়ের মৃত্যুর উপলক্ষে এক সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। শ্রীযুক্ত বাচা মহাশয় পার্শী শাস্ত্রে খুব পণ্ডিত; তাঁহার প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'মৃত ব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধে এইরূপে নানা দেশে নানা সম্প্রদায়ের লোক মধ্যে নানা প্রকার মত ও বিশ্বাস শুনিতে পাওয়া

* য়িহুদীদের যে এই বিশ্বাস ছিল এবং তাহাদের মনুষ্যমাত্রেয় মৃত আত্মা ফিরিয়া আসিতে পারে, এই উক্তি, ইঙ্গিত মাত্রে আমরা বাইবেলের অন্ততঃ চারিটি স্থল হইতে দেখাইতে পারি। বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত হইলাম।

যায়। প্রাচীন পার্শীক জাতি বাস্তবিক মৃত মনুষ্য এবং তাহার আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। জেন্দাবস্তার সময় অতি প্রাচীন, সেই অতি প্রাচীন সময়ে আত্মা সম্বন্ধে মানুষে অধিক অনুসন্ধান করে নাই এবং করিতে পারেও নাই। অগ্নির উপাসনাকারী প্রাচীন পার্শীকেরা আত্মাতত্ব বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে অজ্ঞ ছিলেন অথবা কোনও অভি-মতি প্রকাশ করেন নাই। জেন্দাবস্তের পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থে আত্মা সম্বন্ধে অনেক বিশ্বাস ও মতের কথা শুনা যায়"—ইত্যাদি।

এতক্ষণ যাহা লিখিয়া ও দেখাইয়া আসিলাম, তাহাতে প্রতিপন্ন হইল, পার্শীদের জেন্দাবস্তা গ্রন্থ য়িহুদীদের বাইবেল হইতে প্রাচীনতর।

পার্শীকদিগের জেন্দাবস্তা গ্রন্থে কি ভাবে এবং কোন্ স্থানে ঐ হিন্দুশব্দ ব্যবহৃত আছে, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক। জেন্দাবস্তা জেন্দভাষায় লিখিত, এই সসেমিরের ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত নাই; দুই একজন ভাষাবিদ্ বাঙ্গালী এই ভাষায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধিকার রাখিতেন; তাঁহারাও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজী অনুবাদই আমাদের পক্ষে "অধম তারণ" স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালা আরও সহজ এবং সুখপাঠ্য হইতে পারে, এই জন্য একজন বঙ্গীয়া লেখিকার রচনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া উহার আভাষ দেখাই-তেছি। বাঙ্গালা ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতী" পত্রিকায়, ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী, বি, এ, মহাশয়া "হিন্দু ও নিগর" নামে একটী সুন্দর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লেখেন। সম্পা-দিকা মহাশয়ার প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িনী লেখিকা লিখিতেছেন,— "হিন্দুশব্দ সংস্কৃত সিন্ধুশব্দ হইতে উৎপন্ন নহে। বহু প্রাচীনকবি ওমর

খৈয়ামেও উহা ঐ অর্থে পাওয়া যায়। জেন্দাবস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের সমসাময়িক, তাহাতে হিন্দুশব্দ একবার উল্লিখিত হইয়াছে। হারোবেরেজেতি (আলবোর্জ্জ) পর্ব্বতের সন্নিকটে প্রথম ঐর্য্যান বয়েজো (আর্য্যনিবাস) ছিল। ক্রমে অহুরমজ্দ্ ষোলটি নগরের সৃষ্টি করেন, তাহার পঞ্চদশতমের নাম হপ্তহিন্দব, বেদে ইহাই সপ্তসিন্ধবঃ। জেন্দ তীরইয়াস্তে পর্ব্বত বিশেষের নাম স্বরূপ আর একবার ঐ হিন্দবশব্দ পাওয়া যায়, এবং অনুমান হয়, উহা আধুনিক হিন্দ্‌কুশের প্রজনিতা। * * বহুপরস্তন বৈয়াকরণিকেরা ঐ মূল অর্থ অব্যবহারে বিস্মৃত হইয়া স্যন্দ্ ধাতুর উত্তর ঔনাদিক উ প্রত্যয় করিয়া কোনরূপে জোড়াতাড়া দিয়া সমুদ্রার্থ বোধক সিন্ধু.শব্দ যে নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের একটি কারিগরী মাত্র।" ইত্যাদি। এই কথা সম্পূর্ণ নূতন; লেখিকার এই উক্তি বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। বাঙ্গালীদিগের প্রত্নতত্ত্বসমাজে একথা আমি আর কখন শুনিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এখন বুঝিলেন কি, হিন্দশব্দ যাবনিক নহে, মুসলমান ইহার প্রজনিতা নহে? সর্ব্বপ্রথমে সেই অতি প্রাচীন ও পবিত্র জেন্দাবস্তা গ্রন্থে হিন্দুশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ বেদের সমসাময়িক। প্রাচীন পার্শীকেরা অগ্নিহোত্রী (অগ্নির উপাসক) ছিলেন। তাঁহারা প্রাচীন আর্য্য।

কেবল এইটুকু দেখিলে বা দেখাইলেই যে শেষ হইল তাহা নহে; আমি এতক্ষণ দেখাইলাম—অঙ্কুর; তাহার পরে দেখাইব অঙ্কুরোৎপন্ন বৃক্ষ এবং তদনন্তর দেখাইব বৃক্ষের ফল। আমি এতক্ষণ দেখাইলাম—সম্প্রসারণ, এইবার দেখাইব—বিপ্রকর্ষণ। হিন্দুশব্দের ক্রমিক উন্নতি ও পরিণতির ইতিবৃত্ত দেখাইয়া ইহার শব্দাবর্ত্তনবাদ (Phylological Evolution) আলোচনা করিব। তাহা হইলেই পথ পরি-

ষ্কার হইল। আমরা পার্শীকদিগের জেন্দাবস্তা লইয়াই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম, এক্ষণে সেই প্রাচীন য়িহুদী জাতির ওল্ডটেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ লইয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করি; কারণ য়িহুদীদের প্রাচীন শাস্ত্রে হিন্দ কথা পাওয়া যাইতেছে।

বাইবেলের পাঠক মহাশয়গণ বোধ হয় অবগত আছেন যে, য়িহুদীদের "মুষস" (Law) নামক ধর্ম্মশাস্ত্র ইংরাজিতে ওল্ড্‌ টেষ্টা-মেণ্ট নামে প্রসিদ্ধ, এই শাস্ত্রের অভ্যন্তরে ৩৯ খানি গ্রন্থ নিহিত। প্রথম পুস্তকের নাম জেনেসিস, শেষ পুস্তকের নাম মালেকেহি। এই পুস্তকাবলীর সপ্তদশ সংখ্যক পুস্তকের নাম The Book of Esther, হিব্রুভাষায় ইহার সংজ্ঞা আজ্‌থুর, এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ইংরাজি অনুবাদ এইরূপ—

"Now it came to pass in the days of Ahasuerus, this is Ahasuerus which reigned, from *India* even unto Ethiopia, over an hundred and seven and twenty provinces : ইত্যাদি। Esther, Ch. I., Verse I.

পুরাতন ইংরাজিতে, বাইবেল অনুবাদকার লিখিতেছেন, "আহা-শুরেস রাজা ইণ্ডিয়া হইতে ইথিয়োপিয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।" ইত্যাদি। এখন দেখা উচিত, এই "ইণ্ডিয়া" শব্দ কোন্ অর্থবাচক? বলা বাহুল্য, ঐ অনুবাদ মূল হিব্রুভাষার অনুবাদ। মূল হিব্রু শব্দ-গুলির কথা আমরা পরে বলিব। এই সময়ে একটা কথার মীমাংসা করিয়া রাখা উচিত। একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, য়িহুদীদিগের ওল্ড্‌ টেষ্টামেণ্ট শাস্ত্র, মুসলমান ধর্ম্ম অথবা মুসলমান শাস্ত্র কিম্বা মুসলমান ভাষা বা সাহিত্যের কিম্বা তাহাদের জাতির সৃষ্টি হইবার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত

হইয়াছিল। বেদ বা জেন্দাবস্তা হইতে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট আধুনিক হইলেও এই গ্রন্থ পৃথিবীর অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন, এই গ্রন্থ যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হয় * যখন য়িহুদীদের গ্রন্থে ইণ্ডিয়া শব্দ রহিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে লিখিত জেন্দাবস্তা গ্রন্থে হিন্দব শব্দ রহিয়াছে এবং তাহা হইলে মুসলমানেরা ইণ্ডিয়া শব্দের জন্মদাতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু মূল হিব্রু গ্রন্থে শব্দটা ইণ্ডিয়া (India) নহে; মূলে যে শব্দটা আছে, তাহারই অনুবাদ করিতে গিয়া অনুবাদক ইণ্ডিয়া (India) লিখিয়াছেন। এখন, আসুন, সেই মূল শব্দটার অন্বেষণ করি। Esther গ্রন্থ য়িহুদীদের ইব্রিয় (Hebrew) ভাষায় লিখিত, সেই মূল শ্লোকে যে শব্দটা আছে, তাহার নাম

"হন্দ্"

হিব্রুভাষায় হন্দ্ শব্দের অর্থ বিক্রম, তেজ, গৌরব, বিভব, প্রজ্ঞা, শক্তি, প্রভাব, ইত্যাদি। প্রমাণ—

১। "The Lord is my *strength.*" *Psalms.* XVIII. 2.

এই ইংরাজিটুকু হিব্রু শ্লোকের অনুবাদ। মূল টুকু এই—

"জেহোবা হন্দ মাশা।"

২। "Behold ! The Mountains declare the glory of God."
Psalms.

মূল হিব্রু শ্লোক—"নোমায়েষ্ কোহো জেহোবা হন্দ্।"

---

* খৃষ্টানদিগের মতে পৃথিবীর সৃষ্টি, খৃষ্টের জন্মগ্রহণের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা সকল বিষয়েই ঐ একটা নির্দ্দিষ্ট কালকে লক্ষ্য করিয়া গণনা শেষ করেন। হিন্দু বা পার্শীরা তাহা করেন না, হিন্দুমতে সৃষ্টি অনাদি অথবা বহুসহস্র বর্ষকাল পূর্ব্ববর্ত্তী।

এতদ্ভিন্ন যে কোনও ইব্রীয় অভিধান অথবা Anglo Hebrew Lexicography পড়িয়া দেখিতে পারেন। আর প্রমাণের আবশ্যক নাই।

এই সাম (Psalms) পুস্তক বাইবেলের অংশ, য়িহুদীরা ইহাকে "জব্বুরে দায়ুদ" বলিয়া থাকেন। আমরা মূল হিব্রু হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন বুঝা গেল, Esther পুস্তকোক্ত হন্দ্ অর্থে শক্তি, গৌরব প্রভৃতি বুঝাইতেছে। Esther গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের অর্থ, তাহা হইলে এইরূপ হওয়া উচিত—"আহাস্যুরেস্ রাজা হন্দ্ (শক্তি) হইতে ইথিয়োপিয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।" ইংরাজিতে যেমন অনেক সময়ে গুণবাচক শব্দকে কেবল তাহার গুণের উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায়, সেইরূপে য়িহুদী ভাষায় গুণের উল্লেখে গুণবাচক স্থান বা মনুষ্যের অর্থ বুঝা যায়। "হন্দ্ হইতে রাজত্ব করেন," অর্থে "হন্দ্ (শক্তি বিশিষ্ট) রাজ্য হইতে রাজত্ব করেন" বুঝিতে হইবে। প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে গেলে, প্রবন্ধ আরও দীর্ঘ হইবে, সুতরাং প্রমাণ দিলাম না। ইংরাজিতে Zululand না বলিলে জুলুদের দেশ বুঝায় না, উর্দ্দূতে "কবরস্থান" না বলিলে কবরভূমি বুঝায় না, কিন্তু হিব্রুভাষায় হন্দ্ বলিলে হন্দ্ (বিক্রম) যুক্ত স্থানকে বুঝায়। (যাঁহারা সামান্য আয়াসে সামান্য হিব্রু শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা Dr. Haigue's Anglo Hebrew Grammar পড়িয়া দেখুন।)

য়িহুদীরা গ্রীক জাতি হইতে প্রাচীন; গ্রীকেরা নিজে তাহা স্বীকার করেন। মূল New Testament গ্রন্থ গ্রীক ভাষায় লিখিত, তাহাই গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। উক্ত শাস্ত্রের The Acts of the Apostles গ্রন্থের ২৮টি অধ্যায় মধ্যে প্রসিদ্ধ খৃষ্টীয় বক্তা সাধু পলের অনেক বক্তৃতায় একথার অকাট্য প্রমাণ আছে এবং তদ্ভিন্ন ইউ-

য়োপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। গ্রীকদিগের গ্রন্থে য়িহুদীদের অনেক কথা আছে, কিন্তু য়িহুদীদের গ্রন্থে গ্রীকের কথা কম দেখা যায়। মিগাস্থিনীশ গ্রীকদিগের একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক। ইনি লিখিয়াছেন "য়িহুদী প্রভৃতি জাতিরা পার্শীকদিগের নিকটে জ্ঞান ও শিক্ষা এবং ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে ধন ও প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে।" ঐতিহাসিক গিবনের "রোমরাজ্যের অধঃপতন" নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি ইতিহাসে একথা বহুল প্রমাণ সহকারে অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। য়িহুদীরা ভারতে বাণিজ্য করিয়া খুব ধনবান হইয়াছিল, ইহা তাহাদের নিজের লিখিত ইতিহাস বর্ণিত আছে। রাজা দায়ুদের (David) পুত্র প্রসিদ্ধ সোলেমানের (King Solomon) জগদ্বিখ্যাত দেবালয় বহুলক্ষ লোকের পরিশ্রমে এবং বহুলক্ষ স্থবর্ণমুদ্রা ব্যয়ে য়িহুদীদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য ভারতবর্ষ হইতে নানা প্রকারের কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি গিয়াছিল এবং উহার স্থসজ্জীকরণ জন্য ভারতবর্ষীয় রাজারা নানা প্রকারের মূল্যবান দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন। য়িহুদীরা প্রাচীনকাল হইতে স্থদক্ষ সওদাগর বলিয়া বিখ্যাত। থটাক্লুশ নামে জনৈক বহুদর্শী গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষের বিক্রম ও গৌরব দেখিয়াই য়িহুদীরা ঐ দেশকে (ভারতবর্ষকে) হন্দ্ বলিয়া ডাকিত; ঐ নাম আসিয়ার অনেক দেশে অনেক কাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল।"*

হন্দ্ শব্দ যখন ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট পুস্তকে স্পষ্টতঃ পাওয়া গিয়াছে, তখন অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? ভারতবর্ষকে "হন্দ্" বলিয়া

* Thetiscles quoted by Aikman in the Chamber's Journal, 1866. Vol. XXXI.

য়িহুদীরা ডাকিত, একথা যখন তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে, তখন অন্য গ্রন্থকে প্রমাণ স্বরূপে দেখান বাহুল্য মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, য়িহুদীরা এই হন্দ্ শব্দ কোথা হইতে পাইয়াছিল? উত্তর—পার্শীকদিগের নিকট হইতে অর্থাৎ জেন্দাবস্তা গ্রন্থ হইতে। প্রমাণঃ—

১। পার্শীকেরা অনেক বৎসর ব্যাপিয়া য়িহুদীদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্ব সময়ে য়িহুদী আদালতে জেন্দভাষা রাজভাষা ছিল, শিক্ষিত লোকেরা জেন্দভাষায় কথা কহিত; য়িহুদীরা পার্শীকদিগের মত ঠিক অগ্নি-উপাসক না থাকিলেও সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদির পূজা এবং আরাধনাকালে হোমক্রিয়া করিত, এখনও করে। তাহারা জেন্দাবস্তা পড়িত; য়িহুদী দেশে জেন্দাবস্তার প্রচলন ছিল। ইহার প্রমাণ দেখান যাইতে পারে। খৃষ্টানে হিন্দুতে যেরূপ বিচ্ছেদ, পার্শীক ও য়িহুদীতে সেরূপ বিচ্ছেদ ছিল না। সুতরাং পার্শীকদের হিন্দু বা হিন্দুব শব্দ, য়িহুদীদিগের নিকট পরিচিত থাকা অসম্ভব কেন?

২য়। অনেক দেশের, অনেক পর্ব্বতের, অনেক নদ নদীর নাম য়িহুদীরা জেন্দাবস্তা হইতে লইয়াছে। প্রমাণ—

জেন্দ ভাষা।	য়িহুদী ভাষা।
তারশশ্ (Taurus)	তরশ্
মোশ্জা	মৌশজা
মজ্দাহা	মেশায়া (Messiah)
কঃশা	কোশা
অরদ্জু	ইয়ারজউ

(Glossary of the Old Testament By Bishop Knox.

Published by the Church Missionary Society ; Salisbury square ; London)

এতদ্ভিন্ন "S. P. C. K. Press, Vepery. Madras" এই স্থানে সুলভে প্রাপ্য Hebrew Grammar (*Royal Edition*), Hebrew Vocabulary এবং Trilingual Dictionary of the Old Testament এই তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিলে আমাদের উক্তির অকাট্যতা বুঝিতে পারিবেন। পার্শীদের নিকট হইতে লইয়া হিন্দব শব্দ য়িহুদীরা ব্যবহার করিয়াছিল, ইহাতে বিচিত্রতা কি ?

৩য়। অনেকের বিশ্বাস ছিল, হিব্রুভাষা মৌলিক ভাষা, তাহা নহে ; ইহা জেন্দভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহা বুঝাইতে গেলে বা ইহার প্রমাণ দিতে গেলে, আবার একটা নূতন প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়, তাহা করিব না। জেন্দভাষা, হিব্রু ভাষার প্রসূতি, ইহা অখণ্ডনীয় সত্য। তবে জেন্দের হিন্দব, য়িহুদীদের হিব্রুভাষায় হন্দ্ রূপে ব্যবহৃত হইবার আশ্চর্য্যটা কি ?

জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হিন্দব শব্দ হন্দ্ হইল কেন ? ইকার এবং ব কোথায় উড়িয়া গেল ? ইহার সদুত্তর দিতেছি। পাঠক মহাশয় ! রাজপুতনার মাড়োয়ারী (কেঁয়ে) দিগের অথবা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আগর্‌ওয়ালা বেণেদিগের "মুণ্ডী" অক্ষর কখনও দেখিয়াছেন কি ? ইহাকে কেহ কেহ "কুঠিওয়ালী হরফ্" বলিয়া থাকেন। এই ভাষা বা অক্ষরে ইকার, আকার উকার প্রভৃতি নাই ; বাবা, বিবি, বোবা, বুবু, একই প্রকারে লেখা যায়, নিজের বুদ্ধি অনুসারে মানে বুঝিয়া লইতে হয়, এই জন্য অনেক সময়ে মামা মামি হইয়া যায়, পিসি পাশা হইয়া যায়, কেতাব কুতুব হইয়া যায়, এবং ঘড়া ঘোড়া হইয়া যায়। হিব্রু ভাষাও কতকটা তাহাই। এই

ভাষা দক্ষিণ দিক হইতে বামদিকে পড়িতে হয় এবং ইহার অপত্য আরব্য ও পৌত্র পারস্য ভাষাদ্বয়ে, যেরূপ বৈয়াকরণিকেরা কতকটা আকার ইকার উকার স্থির করিয়া লইয়াছেন, হিব্রু ভাষায় এখনও সেরূপ কিছুই হয় নাই। বর্ণমালায় স্বরবর্ণ দুই একটি মাত্র, তাহাও অপরিস্ফুট; সুতরাং চিহ্ন দিয়া, অনেক কথার উচ্চারণ বুঝাইতে হয়। এই জন্য ইকার অনেক স্থলে লোপ পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত *—

জেন্দ্ ভাষা।	হিব্রু ভাষা।
কিরিয়াদ্	করয়োয়দ্
শিকিনা	সকনা †
হিশিয়া	অশয়ঃ
হিজরদ্	য়জানুদ্
বিরজোদ্	বর্জাদ্

প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে হিব্রুভাষায় ইকার নাই, মৌলিক হিব্রুশব্দ না হইলে সম্পূর্ণ ইকার থাকে না; উচ্চারণে ইকার আসিলেও লেখায় ইকার থাকে না।

দৃষ্টান্ত——

হিব্রু উচ্চারণ।	হিব্রু লেখা।
জিহোবা	জহোবা

* আমরা পূর্ব্বে "শিব" (Sceva) শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। ইহা মৌলিক শব্দ অর্থাৎ খাস হিব্রুশব্দ বলিয়া ইহার পরিবর্তন হয় নাই, ভাষান্তর হইতে গৃহীত শব্দে স্বরবর্ণ খুব কমই দেখা যায়।

† ইহা হিব্রুভাষার একটি মহা প্রসিদ্ধ শব্দ, হিব্রুশাস্ত্র সমূহে ইহার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার আছে। ইহার অর্থ "The glory of God" জেন্দভাষায় শিকিনা ঐ অর্থে ব্যবহার হয়।

ইঞ্জিল্ *	অন্‌জল্।
ইশ্‌রাইল।	য়শ্‌রহিল।
ইজায়া।	আজায়া।
ইয়াকুব।	আকুব।
মরিয়ম্	মরম্।

সুতরাং জেন্দশব্দ "হিন্দব"র প্রথমে যে ইকার আছে, তাহা উড়িয়া যাইবার বিচিত্রতা কি? এখন আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, ব কোথায় গেল? সদুত্তর দিতেছি। ইব্রিয় (হিব্রু) ভাষায় ত, থ, দ, চ, ছ, ঝ, ড, এই কয়েক অক্ষরের উচ্চারণ আসিলে ব ফ এবং ওয়া অক্ষরের লোপ পাইবে।

দৃষ্টান্ত—

হিব্রু শব্দ।	উচ্চারণে লোপ।
তোবা	তোহা
অস্‌থুবা	অস্‌থুহা
সন্দব	সন্দ অথবা সন্‌দ্
গদব্	গদ্
দাউদব্	দাউদ্
আদাবা	আদাহা

তাহা হইলে ইব্রিয় ভাষায় পার্শীকদিগের প্রাচীন জেন্দাবস্তা গ্রন্থোক্ত সেই পবিত্র হিন্দব শব্দ "হনদ্" রূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ যাহা দেখা গেল, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে,

১। হিন্দু শব্দ প্রথমে জেন্দাবস্তা গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে।

* ইহা একটি প্রসিদ্ধ হিব্রু শব্দ। বাইবেলকে য়িহুদিয়া ইঞ্জিল বলে। জিহোবা শব্দের অর্থ—ঈশ্বর।

২। পার্শীকগণ ঐ শব্দের প্রজনিতা।

৩য়। য়িহুদীরা ঐ শব্দ জেন্দাবস্তা হইতে প্রাপ্ত হইয়া হন্‌দ্‌ শব্দে পরিণত করিয়াছে।

পাঠক মহাশয়, প্রবন্ধ শেষ হইতে বিলম্ব আছে, এখনও শব্দাবর্ত্তন বাকি রহিয়াছে।

য়িহুদীদিগের ভাষায় জেন্দাবস্তার হিন্দবঃ কি আকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা দেখান গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের সাহিত্যে এই হিন্দব.শব্দ কোন্ আকারে উপনীত হইয়াছিল, তাহাও একবার দেখা উচিত, কারণ ভারতবর্ষের নামের সহিত প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গ্রীক জাতির বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোধ করিয়া থাকেন। গ্রীকদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা ছিল একথা স্বীকার্য্য। প্রাচীন, উন্নত, শিক্ষিত, সভ্য, রাজনীতিকুশল, রাজ্যশাসনকারী গ্রীকেরা, ভারতের কোনও খবর না লইয়া—ভারতসম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া—এত বড় দেশে জয়পতাকা উড়াইতে আসিয়াছিল, একথা যে বলিবে, সে নিতান্ত বালকবুদ্ধির লোক। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রীকদিগের অভিজ্ঞতাবিষয়ে প্রমাণ বহুল গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে পথ দিয়া গ্রীকবীরেরা ভারতে আইসেন, সেই পথে এক পর্ব্বতের সন্নিকটে নানা কারণে তাঁহাদিগকে বিশ্রামলাভ করিতে হইয়াছিল। ঐ পথের বিবরণ তাঁহারা আহাসুরেস্ রাজার পুস্তকে পড়িয়াছিলেন, ঐ আহাসুরেসের পুত্রের নাম দরায়ুস (Darius) বাইবেলের (The Book of Daniel Ch. IX. Verse I দেখুন) তুষারাবৃত এবং অত্যুচ্চ গিরিমালা দর্শন করিয়া গ্রীকেরা জিজ্ঞাসা করিল, এই অটল অচলের নাম কি? সহচরেরা উত্তর দিল "ইহার নাম জানি না"। একজন পুরোহিত উত্তর করিলেন, "শুনিয়াছি, ইহার এক দিকে হন্‌দু

দেশের সীমা অপর দিকে ইথিয়োপীয়া রাজ্যের রাজনৈতিক সীমা।” এই ইথিয়োপীয়া রাজ্যের হিব্রুনাম Cush (কুশ)। প্রমাণ—Genesis গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক পড়ুন; “And the Name of the second river is Gihon : the same is it that Compasseth the whole of Ethiopia.” মূল হিব্রু শ্লোকে ইথিয়োপীয়া শব্দ নাই, কুশ শব্দ আছে। বাইবেলের টীকায় সর্ব্ববাদী-সম্মতিতে ইথিয়োপীয়ার অপর নাম ‘Cush’—বৃটীশ এবং ফরেণ বাই-বেল সোসাইটির 8 Vo. Brevier marg. Ref.বাইবেলপড়িলে, কিনা-রায় (margin) ঐ অর্থ দেখিতে পাইবেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ মতে “কোশ্” শব্দ নপুংসক নহে; য়িহুদীদের cush এবং গ্রীকদের cosh একই শব্দ; গ্রীক ভাষায় os বা osh অন্তক শব্দ পুংলিঙ্গ হয়; প্রমাণ—Adolphos; Herodotos; Theophilos; Prophetos; Fidos; Theos; Cosmiosh, ইত্যাদি। কেবল পুংলিঙ্গ নহে, চৈতন্যবিশিষ্ট পুংলিঙ্গ; রূপকে পুংলিঙ্গ নহে, চৈতন্যে পুংলিঙ্গ। তাহা হইলে cosh শব্দ পুংলিঙ্গ এবং চৈতন্যবিশিষ্ট পুংলিঙ্গ শব্দ; এখন দেখা যাউক, cosh শব্দের অর্থ কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহা ইথিয়োপীয়া রাজ্যের নাম। গ্রীক শব্দের যেখানে ওমেগা (omega) অক্ষর পূর্ব্বে এবং সিগমা (sigma) অক্ষর পরে থাকে, সেখানে ঐ শব্দকে গুণবাচক বুঝিতে হইবে, ইহাই গ্রীক ব্যাকরণের নিয়ম। তাহা হইলে কোশ শব্দও গুণবাচক হইতেছে। হিব্রু ভাষায় কুশ বা কোশ শব্দে অনেক অর্থ বুঝাইতে পারে; ‘সীমা” ইহার এইরূপ অর্থও হইতে পারে। য়িহুদীদের ভাষায় কোশ বা কুশ পর্ব্বতের নামও হইতে পারে, এই শব্দেরই অপভ্রংশ “কোঃ” এবং “কোহে”—আরব্য ও পারস্য ভাষায় যাহার অর্থ পর্ব্বত। হিন্দুকুশ তৎকালীয়

ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গের যে শেষ সীমা ছিল, তাহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। রঘুর দিগ্বিজয়ে, রাজা মানসিংহের বিজয়-বৃত্তান্তে, মহাভারতে গান্ধারীর বিবাহ বিবরণে, প্রাচীন ভূগোলে, হিন্দুকুশের দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে ভারতীয় রাজার অধিকার ছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে সমাগত প্রায় সকল প্রধান প্রধান রাজার উল্লেখ আছে; যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে সমাগত রাজন্যবর্গের বিবরণ পড়িয়াছি; কিন্তু হিন্দুকুশের পরবর্ত্তী রাজাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং হন্দ্ দেশের সীমা অথবা হন্দ্ দেশের সীমাজ্ঞাপক পর্ব্বত, এই অর্থে গ্রীকেরা ঐ পর্ব্বতকে "হন্দ্কোশ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহা বেশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ ভাষায় পর্ব্বত পুংলিঙ্গ এবং চৈতন্যবাচক।

বাঙ্গালায় যাহাকে থানা বলে, ইংরাজীতে তাহাকে পুলিশ ষ্টেশন বলে, এই পুলিশ শব্দ গ্রীক Polis শব্দ হইতে উৎপন্ন, অর্থ—"নগর"। হিন্দুকুশ পার হইয়া ভারতের যে নগরে প্রথমে গ্রীকেরা মল্লা নামক বীরপ্রধান জাতিকে পরাস্ত করেন, তাহার নাম হইল Polis Kai Handkosh. এই কাই শব্দ গ্রীকশব্দ, ইহাতে ক্যাপ্‌ডা, আলফা এবং আইয়োটা এই তিনটি অক্ষর আছে, এই তিনটি অক্ষর মিলাইলে ইহার "এবং" বা "ও" অর্থ হয়, অর্থাৎ পর্ব্বত ও নগর। এই হন্দ্‌-কোশ অপভ্রংশে গ্রীক ভাষায় Indikos রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, অনেক গ্রীক লেখকেরা "আন্দাকশ" লিখিয়া গিয়াছেন। এই Indikos শব্দ এক্ষণে বৃটিশরাজত্বকালে India নামে পরিচিত ও পরিণত হইয়াছে। এখন বুঝুন, জেন্দাবস্তার হিন্দব—হিন্দু ভাষায় হইল হন্দ্। হিব্রু ভাষায় হন্দ্——গ্রীক ভাষায় হইল Handkosh.

Indikos, Indios। গ্রীক ভাষার ইণ্ডিকশ্—ইংরেজি ভাষায় হইল INDIA!

এই খানেই কি শব্দাবর্ত্তনবাদের শেষ হইল? তাহা নহে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে, হিন্দুকুশ হইতে আটকনদের তীর পর্য্যন্ত যে ভাষাটি প্রচলিত, তাহার নাম পশ্‌তু (Pushtoo) ভাষা। পশ্‌তু ভাষা-ভাষী লোকদিগের আদিবসতি পারস্যদেশ; বোম্বাইয়ের পার্শীরা যেমন পারস্য হইতে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, আটক প্রান্তরের পশ্‌তু ভাষা-ভাষী লোকদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্য হইতে আসিয়া ঐ স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পশ্‌তু ভাষার সহিত পারস্য ভাষার খুব সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে ইহারা সকলে অগ্নির উপাসক ছিল; ভারতের এই পশ্‌তু ভাষা-ভাষী লোকেরাই—অর্থাৎ আবার সেই জেন্দাবস্তা মান্যকারী অগ্নির উপাসনাকারী পার্শীকদিগের বংশধরেরাই——হিন্দ্ বা হন্দ্ শব্দের উত্তর হ্রস্ব উ প্রয়োগ করিয়া হন্দু পদ তৈয়ার করিলেন। মাদ্রাজের তেলুগু ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে হ্রস্ব উ প্রত্যয় করিলে যেমন 'যুক্ত' বুঝায় (যথা নীরলু, চার্লু, কপলু ইত্যাদি), পশ্‌তু ভাষার ব্যাকরণে হন্দ্ হিন্দব হিন্দ্ শব্দের উত্তর হ্রস্ব উ প্রত্যয় করিলে "যুক্ত" বুঝায়। কিন্তু এই "যুক্ত" শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। হ্রস্ব উ প্রত্যয় হইলে হন্দ্ অর্থাৎ শক্তি, গৌরব, বিভব, প্রভাব ইত্যাদি মহিমাযুক্ত জাতি বুঝিতে হইবে, কারণ পশ্‌তু ব্যাকরণের এই উ "গুণবাচক জাতির বা গুণবাচক পুরুষের উত্তর প্রত্যয় হইয়া থাকে।" প্রাচীন আর্য্য-হিন্দু জাতির গৌরব, পবিত্রতা, বিভব, মহিমা প্রভৃতি দর্শন করিয়া পশ্‌তু ভাষাভাষীরা ঐ "উ" প্রত্যয় করিয়াছিল। পশতু ভাষায় হন্দ্ ও হন্দু শব্দ গৌরববাচক।

আমরা নিম্নে দুইটি পশতু শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা পাঠ করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

পুশ্‌রো লবোদে জন্ধীর কেজোয়ান্।
উরো উরো নন্ লাখিয়াল্ লদে জঙ্গেরে
হন্দু জেল্ ফাল্‌ফাল্‌গো॥ ১॥
দেবাট্ দেরন্ জু জরর্ উহে রম্।
কৎলেবে পম্বে দেশ্ তর্ গো
হন্দু এন্ সাঁ উরো॥ ২।

এখন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সকল ইসুগুলির যথাসাধ্য উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আর এককথা, পশতু ভাষা-ভাষীরা "হন্দু" পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়াছিল। শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বাবা নানকের সময়ে, গুরুমুখী ভাষায় হন্দু, শব্দ, পাঞ্জাবী সৈনিকদিগের দ্বারা হিন্দুশব্দে পরিণত হয়। পঞ্জাবের গুরুমুখী ব্যাকরণানুসারে এইরূপে পদসিদ্ধ হইয়া থাকে। নানকের পূর্ব্বে হিন্দব, সিন্ধব, হন্দ, অন্দশ্ হন্দু পর্য্যন্ত ছিল; হিন্দুবংশাবতংস শিখেরা শেষে হিন্দুশব্দ প্রচলন করিলেন; যাঁহারা বলেন, হিন্দু শব্দটা সীমাবদ্ধ, তাঁহারা বড়ই ভ্রান্ত; কোথায় পারস্য, কোথায় য়িহুদী দেশ, কোথায় গ্রীশ, কোথায় অহসুরসের রাজ্য! সর্ব্বত্রই সেই প্রাচীন হিন্দু নাম!

এখন বুঝা গেল, হিন্দুশব্দের তৈয়ারকারীগণের নাম য়িহুদী, ইহার পরিণতিকারকগণের নাম নানকসাহী এবং ইহার অর্থ—বিক্রমশালী, প্রভাবশালী ইত্যাদি। এখন বল দেখি, হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিতে চাহ কি? সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক জাকোলিয়েৎ (Jaquoliette) তাঁহার Krisna et la Christos নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"অসাধারণ বিক্রম এবং অসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্য ভারতবর্ষ তখন

পৃথিবীর আদরের স্থল ছিল।" যে হিন্দু জাতির সততা, সাধুতা, বীরত্ব, বিদ্যাবত্তা, প্রিয়ভাষণ, সুন্দর মূর্ত্তি, ধর্ম্মপরায়ণতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া য়িহুদী, পারস্যবাসী, গ্রীক ও রোমানগণ মোহিত হইয়াছিলেন, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা যে দেশকে স্বর্গভূমি বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের লোকেরা "কাফের্" "কদাকার" "পরস্বাপহারী" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছিল, ইহা কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? হিন্দু শব্দে কাফের্ বা কদাকার নহে, হিন্দু শব্দ গৌরব, গরিমা, বিক্রম, বীরত্ব ব্যঞ্জক; তবে কি হিন্দুনাম ছাড়িতে চাহ?

যে সুপবিত্র ও সদর্থক নাম স্মরণ করিলে আদর্শ চরিত্রের মানবকে সম্মুখে দেখিতে পাই, যে নাম স্মরণ করিলে মানসপটের সম্মুখে কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা প্রভৃতির সম্পূর্ণ আদর্শকে দেখিতে পাই, সে নাম ছাড়িতে কুণ্ঠিত হইব না কেন? যে হিন্দুনাম রাম, অর্জ্জুন, জনক, লক্ষ্মণ, কর্ণ, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতির গৌরবের কারণ, যাহা প্রাণশীতলকারী ব্রহ্মতত্ত্বের আকর, যাহা বিক্রম ও বিভবের খনি, সেই পবিত্র ও প্রশস্ত হিন্দুনাম আমাদের মাথার মণি, আমাদের দেশের গৌরব, আমাদের জাতির মহত্ত্বব্যঞ্জক, তাহাই এই অধঃপতিত, অর্দ্ধমৃত, পদানত ভারতীয় আর্য্যজাতির জাতীয়জীবনের পুনরুদ্দীপক। "হিন্দু" এই নাম উচ্চারণে ভগ্ন হৃদয়ে আশা আসে, ক্ষীণদেহে বলের সঞ্চার হয়, হৃদয়ে জাতীয় গৌরবের অভ্যুদয় হয় এবং আত্মায় ব্রহ্মানন্দ ভোগ করি। তবে এনাম ছাড়িব কেন?

বহুদিন পূর্ব্বে আলিগড়ের নবাব সৈয়দ আমেদ বাহাদুর মুসলমান জাতির শিক্ষা ও উন্নতি লইয়া যখন আন্দোলন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ মহামতি সার সর্দ্দার হৈয়ৎ খাঁ, সি, এস, আই, বাহাদুর হিন্দুশব্দ সম্বন্ধে এক বৃহতী সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, বন্ধু

বরের প্রকাশিত এক উর্দ্দু গ্রন্থ হইতে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। সর্দ্দার্ বাহাদুর বলিয়াছিলেন ;—"কিসি সক্স্ কো কাফের ইয়া মুল্হীদ্ কহনা আশ্রফীয়ৎ ইয়া লাজিমৎ নেহি হ্যায়। দর্ হকিকৎ ইশ্ দুনিয়ামে কোহি সক্স্ মুন্কীরে—মজুদী-এ-খোদা নেহী হ্যায়, ইশ্লিয়ে কিসিকো মুল্হীদ্ কহণা কিশ্তরে মোনাসীব্ হো সেক্তা? খশুশন্, আহেলেহিন্দ্ যো কে মজবে হিন্দুয়ানী কো পয়রবী কর্তেহ্যায় ওঃ সব্ মেরে পেয়ারে পাক্ পরবর্দীগার কো যিশ্তরে এবাদৎ কর্তে হ্যায় ইশীতরে হাম সবোঁ ভি করতে হ্যায়। আস্লিয়ৎ ইয়ে হ্যায় কে হিন্দু ইয়ে লকব ইয়া খেতাব ইয়া ইশম্ মে যো মানে হ্যায় ওঃ মানে উন্কে হেকারৎ কো লিয়ে নেহী হ্যায়, বল্কে ওহি লফ্জ্ মে উন্কা অস্রফীয়ৎ, লেয়াকৎ, ইমানদারী, তরিবতে সুলুক, খোদাপরস্তী, দিন্দারী বগায়র বখুবী তৌর পর মজুদ্ হ্যায়। ইসী ওয়াস্তে হিন্দু আলফাজ হকির নেহী হ্যায়, কেঁওকে সায়ের নে ফোরমায়া—

ইস্ক্ মামুবে যিস্ কি দিল হাঁসিল নেহি।
লাখোঁ মুমীণ হো, মগর্ ইমাণ মে কামিল নেহি॥
ইত্যাদি।"

অর্থাৎ সংক্ষেপতঃ, হিন্দুনামের অভ্যন্তরে হিন্দুজাতির উচ্চ সভ্যতা, যোগ্যতা, বিজ্ঞতা, ভদ্রতা, ধর্ম্মপরায়ণতা, বিক্রমশালীত্ব প্রভৃতি নিহিত রহিয়াছে; হিন্দুনাম ঘৃণাব্যঞ্জক নহে, ইহা হিন্দুজাতির গৌরবের উপাধি। রসিয়ার মাদাম্ বাভাট্স্কি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া বোম্বায়ে ইহলোক সম্বরণ করেন, মৃত্যুর সময়ে বলিয়াছিলেন, Blessed is the man who calleth himself Hindu অর্থাৎ ধন্য সেই পুরুষ, যিনি হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বউ কথা কও।

"Ye ask not and ye receive not; ask ye and it shall be given unto you."

New Testament.

জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন মেদিনীপুরের গোপগিরিতে একাকী উপবেশন করিয়া কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলাম। সেই নিভৃত স্থলে আমার সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে অথবা অল্প দূরে কোনও মনুষ্যের সমাগম ছিল না। গোপগিরির নির্জ্জন স্থান গম্ভীরতা ও নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ ছিল; অকস্মাৎ সেই সুন্দর গম্ভীরতা ও নিস্তব্ধতার ব্যতিক্রম ঘটিল। আমি অন্তর্জগৎ হইতে আবার বহির্জ্জগতে দৃষ্টিপাত করিলাম। শুনিলাম, অকস্মাৎ কে যেন শূন্য হইতে 'বউ কথা কও', 'বউ কথা কও' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। শূন্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অনন্ত নীল আকাশের কোলে উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, খেলিয়া খেলিয়া সুমধুর স্বরে একটী পাখী ডাকিতেছে, 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও'। পাখীর সুমধুর তানলয়-সমন্বিত ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া গেল, শ্রোতার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল, সেই নীল আকাশের কোলে স্বর্গের সুমধুর সংগীত-লহরী ছুটিল, এবং সেই বিমানবিহারী বিচিত্র বিহঙ্গ ক্লান্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিল, 'বউ কথা কও' 'বউ কথা কও।', হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল দেখি এই ক্ষুদ্র পাখী বউ কথা কও, বউ কথা কও বলিয়া কেন পুনঃ পুনঃ চিৎকার করে?" হৃদয় উত্তর দিল "এই বিমানবিহারী বিহঙ্গ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও চরিত্রে মহান্।

এই ক্ষুদ্র পাখী ভারতের বামাজাতির অন্যতম প্রধান শিক্ষক।” হৃদয়কে কহিলাম, “তবে কি ভারতরমণীবৃন্দকে বউ নামে সম্বোধন করিয়া এই বিচিত্র বিহঙ্গম ‘কথা কও’ ‘কথা কও’ বলিয়া মধুর ঝঙ্কার দিতেছে?” প্রশ্ন শুনিয়া হৃদয় যেন ঝটিতি উত্তর দিল, ‘হাঁ, তুমি ঠিক্ বুঝিয়াছ।’ তখন এই নূতন বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলাম, পাখীর এই সুস্বর-সমন্বিত ঝঙ্কার আমাদের স্ত্রীলোকদিগের কল্যাণের জন্য তাহার স্বর্গীয় কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয়; কিন্তু কয়জন ভারতরমণী বা বঙ্গবামা তাহা বুঝিতে পারে? পাখী এই কূজন দ্বারা রমণীকুলকে একটী মহা অধঃপতন হইতে অনবরত সাবধান করিয়া দিতেছে, কিন্তু কয়জন স্ত্রীলোক এই সাবধানতাব্যঞ্জক সুস্বরের অর্থ বুঝিয়াছে? ভগিনি! আইস, আমরা ঐ পাখীর ‘বউকথা কও’ বুলীর অর্থ আজি বুঝিতে চেষ্টা করি! ভারতের নারীজাতির পক্ষে বউ কথা কও পাখীর ন্যায় আর কোনও উপকারী পাখী আছে কি না জানি না।

নিস্তব্ধতা অথবা মৌনী হইয়া থাকা কিম্বা মূক ভাব অবলম্বন করা অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় বটে, বিশেষতঃ ভারতের স্ত্রীজাতির স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা তাহাদের অধিকতর নিস্তব্ধতার অন্যতম কারণ; কিন্তু নিস্তব্ধতা অনেক সময়ে প্রয়োজন ও প্রশংসার বিষয় হইলেও ইহা সকল সময়ে প্রশংসার বিষয় বলিয়া গণ্য হয় না এবং হইতে পারে না। মৌনব্রতাবলম্বিনী ব্রহ্মচারিণীদিগকে আর্য্য ঋষিগণ অধিক বাক্যব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া সামান্য মাত্র কথা বলিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ইহাও লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, “সাধু সংকল্পের সিদ্ধির জন্য অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হইলে, মৌনব্রতাবলম্বিনী ব্রহ্মচারিণী বা সন্ন্যাসিনীগণও অধিক বাক্য-

ব্যয় করিতে পারেন। "মহাত্মা পল খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগকে গির্জ্জায় ধর্ম্মাধিকরণের অধিকার" হইতে বঞ্চিতা করিয়া বলিয়াছেন "গির্জ্জার মধ্যে পুরোহিতের কার্য্য করা পুরুষেরই কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকের নহে। স্ত্রীলোকেরা যেন পাদ্রী বা প্রচারকের কার্য্য না করে।" কিন্তু উপসংহারে সাধু পল ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, "সদ্বাক্য প্রয়োগ জন্য তাঁহাদের (স্ত্রীলোকদিগের) মুখ সতত যেন প্রস্তুত থাকে, কারণ সদ্বাক্য দ্বারাই মুখ পবিত্র হয়। অতএব সতত সৎ কথা কও।" বাঙ্গালা প্রবাদে অধিক বাক্যব্যয়িনী স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা আছে,—

"খড়ম পেয়ে, চিরণদাঁতি, ট্যাঁস ট্যাঁসানে কথা।
গৃহলক্ষ্মী ছেড়ে যায়, হেন নারী যথা॥"

কিন্তু শ্রীমন্মনু মহারাজ বলিয়াছেন, "হিংস্রা চাপ্রিয়বাদিনী" অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক হিংস্রকা এবং সতত অপ্রিয় কথা বলে, সেই স্ত্রীলোকই অলক্ষ্মী। তাহা হইলে বেশ বুঝা যাইতেছে, স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হইলেও সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য—পবিত্র উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য—অধিক বাক্যব্যয় করা অথা 'কথা কহা' তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। ঈশ্বর জিহ্বা দিয়াছেন কথা কহিবার জন্য, কথা না কহিলে সংসার চলিতে পারে কি? আজিকাল অনেক সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-প্রচারক, লেখক এবং পণ্ডিতেরা স্ত্রীজাতিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আসন, স্বতন্ত্র পদবী, স্বতন্ত্র কার্য্য এবং স্বতন্ত্র স্থান দান করিয়া ভারতরমণী-গণকে সম্পূর্ণরূপে "পর্দানশিনী" অথবা "নিস্তব্ধা" থাকিতে পরামর্শ দিতেছেন। এই দলের লোকের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক এবং হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রচারকের সংখ্যা অল্প নহে। আমি নিজে হিন্দু, এখনকার কালের যুবক হিন্দু নহি, কিন্তু প্রাচীন কালের লোক বলিয়া স্ত্রীজাতির ধর্ম্মসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত, শাস্ত্রসঙ্গত ও সময়সঙ্গত

অধিকার হইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিতা করা আমি ঘোর অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করি। এই অধিকার প্রাপ্তির জন্য স্ত্রীজাতি যদি "কথা কয়" তাহা হইলে সে কথা আমরা শুনিতে বাধ্য। দেশের সমাজ এবং রাজাও তাহা শ্রবণ করিতে বাধ্য। আমার বোধ হয়. ভারত-বধূ-দিগের কথা কহিবার সময় আসিয়াছে, তাহাতেই ঐ পাখী উড়িয়া উড়িয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সুষুপ্ত ভারতরমণীকুলকে জাগাইয়া জাগাইয়া, চিৎকার স্বরে বলিতেছে, "বউ কথা কও", "বউ কথা কও।" দ্বারে আঘাত না করিলে দ্বার কেহ খুলে কি? কথা না কহিলে কেহ উত্তর দেয় কি? "বোবার শত্রু নাই" বটে, কিন্তু বোবার যত অসুবিধা ও অনিষ্ট হয়, একজন জিহ্বাযুক্ত ব্যক্তির তত হয় না, সুতরাং "Knock, it shall be opened unto you; Ask, ye shall receive" এই কথা সতত স্মরণ রাখা উচিত। ভারতরমণি! তুমি কথা কহিতে শিখ নাই, তাহাতেই তোমার এই অনুন্নতি। তাহাতেই ঐ আকাশের পাখী ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তোমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক তোমাকে শিখাইয়া দিতেছে "বউ কথা কও", "বউ কথা কও।"

এমন একদিন ছিল, যে দিনে ভারতরমণী কার্য্যেও যেমন পটু, জিহ্বাতেও তেমনি পটু ছিলেন। তরবারী দ্বারা কার্য্যোদ্ধার এবং জিহ্বা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার এই উভয় বিষয়ে তাঁহারা সুদক্ষা ছিলেন। তাঁহারা কেমন করিয়া কথা কহিতে হয়, তাহা জানিতেন। এখনকার কালে স্ত্রীলোকেরা কথা কন না এবং কথা কহিতেও জানেন না, তাহাতেই এই দুর্দ্দশা। মনে কর, স্ত্রীলোকের শিক্ষা (Female edacation) লইয়া বঙ্গদেশে—সমগ্র ভারতবর্ষে—কতই না প্রবল আন্দোলন হইয়া গেল, কিন্তু ফল কি হইল? সমগ্র জগতের—বিশেষতঃ ভারতের পুরুষ জাতি এমনই ঘোর স্বার্থপর যে, যে স্থানে পুরুষের সামান্য

স্বার্থেরও ব্যাঘাত দেখিতে পাইয়াছে, সেই স্থানেই স্ত্রীলোকের অধিকার হইতে স্ত্রীজাতিকে বঞ্চিতা করিতে ত্রুটি করে নাই। বঙ্গদেশে অনেকে অযথা যুক্তি এবং অন্যায় শাস্ত্রার্থ দ্বারা স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষা হইতে স্বতন্ত্রা রাখিতে যত্ন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, স্ত্রীলোকেরা যাহাতে কিছু বলিতে সমর্থা না হয় অথবা তাহাদের পক্ষের লোকেরা কথাটী পর্য্যন্ত কহিতে না পারে, তজ্জন্য নানা অযথা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পুরুষের এইরূপ ব্যবহারে স্ত্রীজাতি নিস্তব্ধা; পুরুষের ভয়প্রদর্শক বচনে স্ত্রীজাতি ভীতা এবং দেশের এই আন্দোলনে তাহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া। স্ত্রীজাতির এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গের পাখী উৰ্দ্ধমুখ হইয়া চিৎকার স্বরে বলিতেছে "ভারতবধূ! কথা কও, কথা কও; পুরুষের ভ্রুকুটিতে ভীতা হইও না; গৃহস্থের—দেশের—সমাজের—সমগ্র পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধির ভার তোমার উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না।" পাখী উড়িয়া উড়িয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, "বউ কথা কও, বউ কথা কও।"

ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য অথবা গৃহস্থালীর কার্য্য যাহা লইয়াই বিবেচনা করা যাউক, পুরুষেরা যদি স্ত্রীলোকগণকে সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের যথোপযুক্ত অধিকার প্রাপ্তির জন্য কথা কহিবে না কেন? আমি স্বীকার করি, অনেক কাজ কেবল পুরুষের পক্ষেই শোভা পায়, আর অনেকগুলি কার্য্য কেবল স্ত্রী-সমাজেরই পক্ষে উপযুক্ত; কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র ভারত—স্ত্রীসমাজকে অশিক্ষিত রাখিয়া সমগ্র দেশটাকে "গরুর গোয়াল" রূপে পরিণত করা কি শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও যুক্তির অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়? যতটুকু পুরুষের প্রাপ্য, ততটুকু পুরুষ পাইবে; যতটুকু নারীর প্রাপ্য, ততটুকু সে

অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে ; তাহাকে বঞ্চিতা করা কাহার সাধ্য ? কাহারও সাধ্য নাই বলিয়া আকাশের পাখী বলিতেছে, "বউ কথা কও" বউ কথা কও।" মহামতি যিশু বলিয়াছিলেন, "আমার শিষ্যেরা যদি কথা কহিতে না পায়, তাহা হইলে সম্মুখস্থ ঐ প্রস্তরখণ্ড ভেদ করিয়া কথা বাহির হইবে।" আমারও বিশ্বাস এই যে, হে স্বার্থপর পুরুষ-পুঙ্গবগণ ! যদি তোমরা বঙ্গের বামাকুলের মুখ বন্ধ কর—যদি তোমরা স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিতা রাখিয়া দাও—তাহা হইলে বাঙ্গালার গৃহের দেওয়ালে, গঙ্গার তরঙ্গে, দার্জ্জিলিং পাহাড়ের পাথরে এবং বৃক্ষের পল্লবের শন্ শন্ সমীরণে রমণীর কথা শুনিতে পাইবে। রমণীর এক বিন্দু চক্ষুর জলে যে মহাতরঙ্গায়িত মহাসাগরের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সমগ্র পুরুষসমাজ সারমেয়-তাড়িত মেষশাবকের ন্যায় দলে দলে ডুবিয়া মরিবে। আর হে রমণীবৃন্দ! তোমরা যদি (যেখানে কথার প্রয়োজন, সেখানে) কথা না কও, তাহা হইলে তোমরাও ঈশ্বরের আজ্ঞার লঙ্ঘনকারিণী হইবে। তোমরা চাও না, তাই পাও না ; কেহ কেহ চায়, কিন্তু তাহারা কেমন করিয়া চাহিতে হয়, তাহা জানে না। তোমরা কথা কহিতে শিক্ষা কর, চাহিতে শিক্ষা কর। তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই পাখী বলি-তেছে, "বউ কথা কও, বউ কথা কও।"

তাহার পরে শেষ কথা, বউ কথা কও পাখীর শেষ কথা। চক্ষু কর্ণ, হস্ত পদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং চিন্তা বুদ্ধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি আমাদের প্রধান সহায় স্বরূপ হইলেও, বিশ্বস্রষ্টা দয়াময় ভগবান্ আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায় এবং সমুদয় সাধুসংকল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। সেই প্রেমের আকর, গুণের সাগর, কল্যাণময় পিতার নিকটে মনের কথা, সভক্তি প্রার্থনা দ্বারা কথা কহিতে পারা বড়ই সৌভাগ্যের। যে ব্যক্তি

হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ খুলিয়া সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ভগবানের সহিত কথা কহিতে পারেন, তাঁহার মানবজন্ম সার্থক; আমি (অধম) তাঁহার পবিত্র পাদপদ্মে সভক্তি প্রণাম করি। প্রাচীনা ভারতের স্ত্রীজাতি ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত কথা কহিতে জানিতেন। এখনকার স্ত্রীলোকেরা আবার তেমন প্রার্থনাপরায়ণা, তেমন ব্রহ্মবাদিনী হইবেন কি? হে রমণীগণ! তোমরা ভগবানের সহিত মনঃপ্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে শিখ, সেই চিন্তাহারী, দুঃখহারী, ভক্তবৎসল ভগবানের উপর ভরসা কর, তাঁহাতে তন্ময়া হও,তোমাদের দুঃখের দিন অবসান হইবে। আবার এই তামসী রজনীতে আশার আনন্দময় আলোক আসিয়া ইহজীবনকে সুখকর ও পবিত্র এবং পরজীবনকে "সত্যং শিবং সুন্দরং"-রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া দিবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

পদচিহ্ন।

"কুতস্ত্বা কশ্মল মিদং বিষমে সমুপস্থিতং।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥"

(গীতা)

প্রাবৃটের প্রদোষে অনন্ত আকাশের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম—চারিদিকেই কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার! উর্দ্ধে, অধেঃ, বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দশদিকে কেবল তরুণ তামসের বিকট বিভাস প্রকীর্ণভাবে প্রসারিত। কোনও একটি গন্তব্যস্থানে গমন করিবার আমার প্রযত ও প্রত্যগ্র প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অকূল অন্ধ-

কারের মধ্যে আকুল ও অবশাঙ্গ অকুপারের ন্যায় অথবা যাদবহারা যশো-দার মত তারাহারা হইয়া পদদ্বয়ের গতিরোধ পূর্ব্বক সভয়ে, সংক্ষোভে, বিনয়ে, বিষাদে, ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে ব্যোমদেব! হে নভোমণ্ডল! পথ কোথায়?" নশ্বর নরকঙ্কাল সমাবৃত এবং শিবা ও সারমেয় সঙ্ঘাত এক বিকট বিভীষিকাময় বিস্তীর্ণ ও শয়ালু শ্মশান-প্রান্তরের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া জীমূতমন্দ্রে প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল, "পথ কোথায়?" আমি নীরবে, নির্জ্জনে সেই ঘোর ঘন তমঃরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিকে যেন কেবল নিরাশার নিরধিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আশায় আশ্বাসিত অথবা প্রবোধে প্রসাদিত করিবার কেহই ছিল না! প্রাবৃটীয় প্রদোষের তড়িতজড়িত জলদজাল ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টিশক্তি চলিতে সমর্থ হয়, ততদূর চাহিয়া দেখিলাম, যেন ঘন কালো অন্ধকারের উপর স্তূপস্তোপিক ভাবে রাশি রাশি ঘন কালো অন্ধকার আসিয়া ঘন হইতে ঘনতর ভাবে মিলিয়া ও মিশিয়া গিয়াছে। সেই কৃষ্ণমেঘের কোলে কৃষ্ণত্ব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমি আবার প্রাণভয়ে, কাতরস্বরে, ঊর্দ্ধ নয়নে অতি দীন হীন ভাবে জিজ্ঞাসিলাম, "পথ কোথায়?" এই মহাপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের কেহই উত্তর দিল না; অতীব উৎকণ্ঠায় মানসিক বন্ধন উশৃঙ্খল হইয়া গেল। সেই কালো মেঘের দিকে আবার চাহিলাম; বিজলীর চমকে প্রাণ চমকিল; সুন্দরীর হাসির আলোকে আনন্দ বা আশ্বাস না পাইয়া আক্রন্দী আক্ষোদনীর ন্যায় বরং আক্ষেপে আপ্লুত হইলাম, পথ প্রাপ্তির আশা আছে কি না সন্দেহ জন্মিল। আর একবার সেই অনন্ত আকাশের কোলে সমুদয় দশ দিক অত্যুজ্জ্বল প্রভায় সুরঞ্জিত করিয়া এক মহাজ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্ব আলোকের অভ্যুদয় দেখিলাম। কালো মেঘের কোলে এই সুবর্ণের আলোক সুন্দর

হইতেও সুন্দরতর। সেই আলোক ক্ষীণপ্রভঃ হইলে কৃষ্ণমেঘের ক্রোড়ে এক রমণীয় শুভ্র চিহ্ন দর্শন করিয়া আশায় আশ্বাসিত হইলাম। তাহা ঠিক যেন কোন সুন্দর সুঠাম পুরুষপুঙ্গবের পবিত্র পদাকৃতি। কিছুক্ষণ পরে জীমূতমন্দ্রে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইল, সেই ভৈরব গর্জ্জনের মধ্যে যে মহাজ্যোতির্ম্ময় আলোক দেখিলাম, তাহাতে ঐ পদাকৃতি চিহ্ন সহস্র সুসিদ্ধ সুবর্ণপ্রভায় জলিতেছিল। সেই মহাপ্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মধ্যে হিরণ্ময় জ্যোতিতে অতি পরিষ্কার দেবনাগর অক্ষরে লেখা ছিল—পদচিহ্ন"।

নিরতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আশ্বাসিত অন্তঃকরণে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "পথ কোথায়?" এইবারে মহা অপূর্ব্ব আলোকের ঘটার মধ্যে সুবর্ণপ্রভায় প্রভান্বিত মহাজ্যোতিষ্মান পদচিহ্নের শীর্ষদেশে অর্দ্ধ গোলাকার ভাবে সুকোমল শষ্প সমাকুল এক পার্ব্বতীয় প্রাঙ্গণকে প্রসারিত দেখিলাম। তাহার চারিদিকে মহা সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধিময় প্রস্ফুটিত প্রসূনপুঞ্জের পরিষ্কার ও মনোহর নিকুঞ্জাশ্রম, তাহার মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় যোগীন্দ্র পুরুষ উপবিষ্ট। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যত বসন্তের উদয় হইয়াছে, সে সমস্ত বসন্তের সৌন্দর্য্যরাশিকে যদি একত্রিত করিতে কেহ সমর্থ হয়, অথবা আকাশ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত যদি কেহ সমগ্র বিশ্বসংসারের সমুদয় সৌন্দর্য্যরাশিকে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেও তাহাদের সুন্দরতা এই মহাপুরুষের সৌন্দর্য্যের সহিত সমতুল্য হয় না। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তির সম্পূর্ণতা মানবীয় কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত। সেই মহাপুরুষের শিরোদেশে সুচিক্কণ কমনীয় কুন্তলরাজি গমনশীল অহি-ভাবে নিশীথ-সমীরণের সুশীত হিল্লোলের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল; তাঁহার কটিদেশে শার্দ্দূলাম্বর; হস্তে মনমোহিনী বীণা; গাত্রে বিভূতি ও ভস্ম;

বদনে শত সহস্র সূর্য্যের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ; নয়নে জ্ঞান, প্রেম ও ভক্ত-বৎসলতার পূর্ণতম বিকাশ এবং সেই সৌম্যমূর্ত্তির সৌসারভাগে (অর্থাৎ গলদেশে) শারদশশির শুভ্রতা-সঙ্কাশ সদ্যোস্ফুট সাহিত্য-প্রসূনের সৌগন্ধিময় মনোহর মালা। এই মহাপুরুষ সুবর্ণ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সেই সুবিশাল আকাশের কোলে পদচিহ্নের জ্যোতিম্মান অক্ষরে সুকোমল অঙ্গুলী স্পর্শ করতঃ ইঙ্গিতে দেখাইলেন, —"পদচিহ্ন"। আমি চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নীরবে সেই নির্জ্জন শ্মশানের প্রান্তদেশ হইতে পদচিহ্নকে দেখিতে লাগিলাম ; শ্মশানের ভীষণতা এখন সুন্দরতায় পরিণত হইল ; যাহা কিছু বজ্রাদপি কঠোর, তাহা কুসুমাদপি কোমল হইয়া গেল ; নিরানন্দ ও নিরাশা, আনন্দে, আশায় ও উৎসাহে আপ্লুত হইল ; মেঘের কৃষ্ণত্ব, বায়ুর প্রাবল্য, জলদের গর্জ্জন, শিবাসারমেয়গণের তর্জ্জন——এ সকল একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। ভয়বিহ্বলিত ও উৎকণ্ঠিত চিত্ত প্রীত ও প্রশান্ত হইল। আমি একটি প্রশস্ত ও পরিষ্কার পথ দর্শন করিলাম, সেই পথ চিনিয়া লইয়া পুনরায় পর্ণকুটীরে আগমন করতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিশ্রান্ত ভাবে ভূমিতলে শয়ন করিলাম।

আমার ন্যায় দারিদ্র্য দুঃখ-দ্রবীণ প্রবীণের পর্ণকুটীর প্রায়ই প্রচ্ছী প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুরই পরিষ্কার আলোক প্রাপ্ত হয় না। চিরদুঃখী দরিদ্র আলোক কোথায় পাইবে ? কিন্তু যিনি নিরাশার আশা, ভীতের ভরসা, শঙ্কিতের শরণ এবং পতিতের পাবন, তিনিই কৃপা করিয়া আমার আগমনের পূর্ব্বে আলৌকিক ভাবে ত্রিদিবসঞ্জাত এক অসামান্য আলোকে আমার পর্ণকুটীর আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই আলোকের তেজে আমার চর্ম্মচক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হীন হইয়া গেল, আমার দিব্যচক্ষু উন্মিলীত হইল। সেই অপূর্ব্ব আলোকে যাহা অবলীলাক্রমে

অবলোকন করিতে সমর্থ হইলাম, তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীত হইল, প্রত্যেক মানবের সম্মুখে দুইটী পথ প্রসারিত। ইহাদের একটি পথ সুগম, সুন্দর, সুস্পষ্ট, সরল এবং আপাততঃ সুখদায়ক ও রমণীয়, কিন্তু পরিণামে আশীবিষের প্রাণান্তক হলাহলের ন্যায় অনিষ্টকর, এই পথের নাম প্রবৃত্তিমার্গ। দ্বিতীয় পথ দুর্গম, দুর্বোধ্য, দূরবর্ত্তী, আপাততঃ দুঃখদায়ক এবং সঙ্কীর্ণ, কিন্তু পরিণামে অতুল আনন্দের আকর; এই পথের নাম নিবৃত্তিমার্গ। এই জরামৃত্যুসঙ্কুল সংসারী মায়াময় জীব ভ্রান্তবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণতঃ প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। কারণ, এই পথে তাহার ঐন্দ্রিয়িক লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অগণ্য উপকরণ সংগৃহীত থাকে। নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডময়ূখ-মালা-বিদগ্ধ মৃগশিশু যেমন মায়াত্মিকা মরুভূমির উত্তপ্ত আগ্নেয় বাষ্প-পুঞ্জকে অবলোকন করিয়া তৃষা নিবারণ জন্য সুশীত সলিলভ্রমে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাহার পদানুসরণ করে, প্রবৃত্তিমার্গকে আপাততঃ রমণীয় ও আনন্দবর্দ্ধক বোধ করিয়া মায়ামুগ্ধ মানব সাধা-রণতঃ এই পথেরই অনুবর্ত্তী হয়। নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিতে হইলে, আত্মোৎসর্গ, স্বজাতি-প্রেম, স্বদেশীয় মহত্ব রক্ষণ, জননী জন্মভূমির উপকার সাধন, স্বধর্ম্মের গৌরব রক্ষা, চরিত্রের বলবৃদ্ধি, সমগ্র বিশ্বসংসারের জন্য চিন্তা এবং ইহকাল ও পরকালের পথকে পবিত্র করা মানজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হয়। সুতরাং এই পথে আগমন করিলে কষ্টসহিষ্ণুতা, দীনতা, হীনতা, দারিদ্র্য দুঃখ, গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ, অপমান, স্বার্থহানি এবং বিবিধ প্রকারের অসুবিধা, অস্বচ্ছলতা, অভাব ও অস্বচ্ছন্দতা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই দুইটি পথের মধ্যবর্ত্তী স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া যখন মনুষ্যমণ্ডলী অজ্ঞান-অন্ধকারের প্রভাবে পথভ্রান্ত হয়, তখন পূজ্যপাদ প্রাচীন

আর্য্যঋষির এই পবিত্র পদচিহ্নের প্রকৃষ্ট প্রয়োজন হইয়া থাকে। মায়ায় মানুষকে ভুলাইবার, ঠকাইবার, মাতাইবার এবং মজাইবার উপকরণ সর্ব্বত্র প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত থাকে; যাহাদের ধৈর্য্য, শৌর্য্য, প্রাজ্ঞতা, স্বজাতিবৎসলতা, স্বদেশ-প্রেমিকতা, মাতৃভক্তি অথবা পরকালে বিশ্বাস এখনও জন্মে নাই বা দৃঢ় হয় নাই, সেই হতভাগ্য মানবগণ পরিণামে পরম রমণীয় ও আনন্দাপ্লুত নিবৃত্তিমার্গকে পরিহার পুরসরঃ প্রবৃত্তির পথে প্রধাবিত হয়। এই সঙ্কট সময়ে পূজ্যপাদ প্রাচীন আর্য্যঋষির পবিত্র পদাঙ্ক বড়ই প্রয়োজনে আইসে।

সময়-সৈকতের শাশ্বত শরীরে পূজনীয় সনাতন আর্য্যঋষি যে সকল পদাঙ্ক বা পদচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া নশ্বর জগত হইতে অবিনশ্বর জগতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই গুলি আমাদের নিরাশার আশা, বিপদের সহায়, অন্ধকারের আলোক এবং দুর্ব্বলতায় মহাবল। রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও দেবর্ষিবৃন্দের অনুগৃহীত—মহাসিদ্ধ মহাপুরুষদিগের মহামন্ত্রে অণুপ্রাণিত——জননী-জন্মভূমির বিপদ ও বিষাদের দিনে কতবার এই পবিত্র পদচিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। নক্ষত্রের ন্যায় ইহা প্রতিদিন দেখা দেন না; ভারত যখন এই শ্রীচরণ দর্শনের উপযুক্ত হয়, তখন ইহা অনন্ত আকাশকে অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত করিয়া অতি সুন্দর ভাবে উদয় হন; কখনও বা একাধিক শ্রীপদাঙ্ক প্রভাসিত হইতে দেখা গিয়াছে। আকাশের কোলে এই পবিত্র পদচিহ্ন প্রকাশিত হয় বলিয়া, জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রে অনন্ত আকাশ অতি পবিত্র হইতেও পবিত্রতর। কোরাণে দেখ, মূসা ও মহম্মদ আকাশের কৃপায় পদাঙ্ক দেখিয়াছিলেন, আকাশের আশাময় ক্রোড় হইতেই মহাপুরুষদিগের মুখারবিন্দে ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহামতি যিশুখ্রীষ্ট আকাশ হইতে দৈববাণী শুনি

তেন। আকাশ হইতেই এলাইশাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রসাদিত হইয়াছিলেন, আকাশের অভ্যন্তর দিয়াই অন্তর্হিত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং আকাশ হইতে আবার আগমন করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন। মেঘদূতের কবি আকাশ হইতে কত কথাই শুনাইয়াছেন আর আর্য্যঋষিদিগের আকাশগমন, আকাশাৎ অবতরণ, আকাশ হইতে প্রত্যাদেশ প্রচারকরণ প্রভৃতি মহা আধ্যাত্মিক লীলামালায় সনাতন হিন্দুশাস্ত্র ভাদ্রের ভাগীরথীর ন্যায় পরিপূর্ণ। এই পবিত্র পদাঙ্ক আকাশ হইতে আমাদের সহায়কের কার্য্য করেন; তাঁহার করুণায় অন্ধকারে আলোক দেখি, দুর্ব্বলতায় বলীয়ান হই, অজ্ঞানে জ্ঞানী হই, অভাবে সম্পূর্ণ হই, এবং ভ্রান্ত পথিক হইয়াও অন্ধকারে উজ্জ্বল পবিত্র পথ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। তখন বুঝিতে পারি, নিবৃত্তিমার্গে পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা, কোর্ম্মা, কাবাব, ঘির্ণী, ক্ষির্ণী, চব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয় কিছুই নাই; এই পথে সুন্দর রমণী, সুসভ্য পরিচ্ছদ, বিলাস-সম্ভোগ, সাংসারিক সুখে মত্ততা প্রভৃতি কিছুই নাই;—এই পবিত্র পথ সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম হইলেও ইহা পরিণামে ধর্ম্মার্থ-মোক্ষ-কামের একমাত্র আকর; ইহাই দেবানুগৃহীত —ব্রহ্মানুগৃহীত—পথ। এই পথে উলঙ্গ, উপবাসী বা উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইলেও ইহাই উৎকৃষ্টতম উপায়। এই পথে মহাপুরুষদিগের— মহামান্য মহামানবদিগের——অমূল্য শোণিতের অক্ষরে লিখিত আছে—"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।" এই পথে অমরত্ব; অন্য পথে নিত্য-মৃত্যু। এই পথে স্বজাতি-প্রেমিক, স্বদেশ-হিতৈষী, সাধু-সজ্জনবর্গ, বিশ্বসংসারের শুভকরী মহাপুরুষগণ স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম এবং বিশ্বসংসারের হিতসাধন জন্য সহাস্য বদনে প্রাণাধিক প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, নয়নের পুতুলিসম স্নেহময় পুত্র, পারিবারিক

বিভব, ধন, মান, দেহ, মন—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া জগতের অবিনশ্বর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, আর মুমুক্ষু মুনি ও পবিত্র পারিবারিক পুরুষপুঙ্গব-পুঞ্জ এবং বনবাসী তপশ্চারীগণ মোক্ষধন লাভ করিয়া জীবন্মুক্তাবস্থায় অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিয়াছেন; এই পথ ধার্ম্মিকের পথ, এই পথ স্বদেশ-প্রেমিকের পথ, এই পথ উদাসীর পথ; অপর পথ, বিলাসী বাবুর পথ, বিনাশের বিস্তৃত বর্ত্ম এবং জন্মজন্মান্তরীণ নির্ম্মুক্তির নিরানন্দময় অন্ধকার পরিপূর্ণ পথ। প্রবৃত্তিতে ও নিবৃত্তিতে এই প্রভেদ! ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে এই বিভিন্নতা! স্বদেশ-প্রেমিক ও স্বদেশ-দ্রোহীতে এই সুস্পষ্ট স্বতন্ত্রতা! কেবল শুষ্ক নিম্বপত্র চর্ব্বণ করিয়া জীবন কাটাইতে হইলেও নিবৃত্তিমার্গ হইতে নিরস্ত হইতে পারি না, কারণ এই মহামার্গে অবস্থান করিয়া না থাকিলে—এই মহামার্গের মহামন্ত্রে নিঃস্বার্থ অনুপ্রাণিত না হইলে—কেমন করিয়া স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম এবং তৎসঙ্গে নিজের পারত্রিক উপকার এবং বিশ্ববাসীর হিতসাধন করিতে সমর্থ হইবে? দেখিতেছ না, তোমার সম্মুখে, ঐ অনন্ত নীল নভোমণ্ডলের কোমল ক্রোড়ে, সেই পবিত্র পদচিহ্ন আবার অপূর্ব্ব আলোকে আভাসিত হইয়াছে? তবে কিসের চিন্তা? কিসের ভয়? দেব যাহার সহায়, সাহস যাহার সম্বল, উৎসাহ যাহার প্রকৃতি, ধর্ম্ম যাহার আশ্রয়, নিবৃত্তিমার্গ যাহার পথ, এবং পবিত্র হইতেও পবিত্র সনাতন আর্য্য-শোণিতে যাহার দেহস্থ ধমনী সুপুষ্ট, তাহার আবার কিসের ভয়? তাহার আবার কিসের চিন্তা? হিন্দুপুরুষ এবং হিন্দুললনা কি মরিতে ডরে? যাহার শাস্ত্রে মৃত্যু কেবল দেহান্তর বা স্থানান্তর মাত্র, যাহার জীবনের চরম উদ্দেশ্য মুক্তি-সাধনা, মাতৃভূমি যাহার জননী, যাহার ধর্ম্ম সৃষ্টির সমসাময়িক, সেই হিন্দুজাতি মরিতে কি কুণ্ঠিত? স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বধ-

র্ম্মের জন্য হাসিতে হাসিতে অম্লানবদনে কেমনে মরিতে হয়, হিন্দুই তাহা জানে এবং হিন্দুই তাহা সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়া দিয়াছে। সুবর্ণ সিংহাসনারূঢ় নরপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বনবাসী ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত অথবা প্রবৃদ্ধা রমণী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুই এক দিন মরিতে জানিয়াছিল এবং মরিতে শিখিয়াছিল, সেই জন্য হিন্দুর এত গৌরব, হিন্দুর এত মহিমা, হিন্দুর এত পবিত্রতা! তত্ত্বজ্ঞানী বিপ্র ও দেবতাদিগকে অত্যাচারী অসুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য, বনবাসী ফলমূলভোজী মুনি দধিচি স্বীয় শরীরের অস্থি নিষ্কাষণ করিয়া ধনুর জ্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কি জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ! নিবৃত্তিমার্গী পুরুষদিগের কি জীবন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা! সুষুপ্ত ভারত আবার কি জাগ্রত হইয়া এই জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গ-বিদ্যায় অনুপ্রাণিত হইবে? আইস, আজ এই নববর্ষের প্রথমে আমরা পদচিহ্ন দর্শন করিয়া পূতঃদেহে ও পূতঃ চিত্তে জননীর পবিত্র পদতলে প্রণাম করি এবং নবীন উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, বিলাস-বিভোগ ভুলিয়া গিয়া, আবার কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হই। স্বকামী হও আর নিষ্কামী হও, নিবৃত্তিমার্গে উভয়েরই মুক্তি; সকামী হও আর নিষ্কামী হও, স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির জন্য প্রাণ দিলে বা পরিশ্রম করিলে, স্বর্গের সুবর্ণ সিংহাসন তোমার জন্য সুসজ্জিত থাকে, ইহা অখণ্ডনীয় ধ্রুব সত্য। ঐ দেখ, আবার দেখ, ঐ তড়িত-জড়িত জলদজাল ভেদ করিয়া আবার দেখ, কেমন নবীন সৌন্দর্য্যে এই শাশ্বত পদচিহ্ন শোভা পাইতেছেন! অধঃপতিত অন্ধতামসময় ভারতবাসী ভ্রাতার মৃত দেহে পুনরায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এই পরপদানত সারমেয় তাড়িত পরাধীন মেষশিশুপালকে আবার মহাবলে বলীয়ান করিতে হইলে, আবার আধ্যাত্মিক বিক্রম ও বিভবে ভারতের শ্মশানকে শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত

করিতে হইলে, এই পবিত্র শ্রীপদাঙ্কের পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন হইবে। ভাই জাগো! কিসের ভয়, কিসের চিন্তা? এই নববর্ষের নবীন শোভায় তুমি সঞ্জীবিত ও সুসজ্জিত হও। জাগো! জাগো! প্রবৃত্তি-মার্গের কুহকী মায়া-নিদ্রা পরিহার করিয়া জাগ্রত হও, উত্থিত হও, উদ্দীপ্ত হও এবং মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া হিন্দুকুলের মুখোজ্জ্বল কর। জন্মিলেই মরণ, ইহা ধ্রুব সত্য, একবার কেবল মরিতে হয়, তবে মরণে এত ভয় কিসের? সাধনায় এত আলস্য কিসের? নিবৃত্তিমার্গের লোকেরা কেবল একবার মরে, মরিয়া আবার অমর হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গের পশুগণ নিত্যই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, জন্মজন্মান্তরেও ইহারা মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় না। তাই বলিতেছি, ভাই জাগো! জাগো!

ঐ পবিত্র পদচিহ্নের মহাপুরুষের অনুজ্ঞা এই যে, সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায় এবং যে ব্যক্তি পুরুষকারকে পরিহার না করে, পদচিহ্নের মহাপুরুষ সদতই তাহার সহায়ক স্বরূপে কার্য্য করিতে স্বীকৃত থাকেন, অতএব কেবল পদচিহ্নের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না, উৎসাহ, উদ্দীপনা, পরিশ্রম-পরায়ণতা, সাহস, অধ্যবসায়, চরিত্রবল, পুরুষকার প্রভৃতিকে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ ভাবে অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল কাতর স্বরে অলসের ন্যায় ভগবানের দিকে তাকাইয়া—

"যদি মে ন দয়িষ্যসে
তদা দয়নীয় স্তব নাথ! দুর্লভঃ॥"

এ কথা বলিলে কার্য্যসিদ্ধির আদৌ সম্ভাবনা নাই। তোমরা যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও ইউরোপীয় শিক্ষায় সুদক্ষ হইয়াছ, সেই ইউ-রোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার নীতি এই যে, Heaven helps those

who help themselves." অতএব পুরুষকারকে পরিত্যাগ করা ধার্ম্মিক মানবের অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। যাঁহারা "আর্য্য" বলিয়া পরিচয় দেন, ভগবানে যাঁহাদের ভরসা আছে, মোক্ষলাভ যাঁহাদের মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহারা কেমন করিয়া পুরুষকারকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? শ্রীভাগবৎকার ব্রহ্মর্ষি মহোদয় "আর্য্য" শব্দের অর্থ স্থলে লিখিতেছেন—

"অহোবত শ্বপ চতো গরীয়ান
য জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্॥
তেপুস্ত পস্তে জহুবঃ সন্নুর্বার্য্য।
ব্রহ্মণ্‌ চুর্ণাম গৃহ্নতি যে তে॥"

দেখিলে, আর্য্য নাম কত মহান্! কত পবিত্র! যাঁহাদের পবিত্র শরীরে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত, তাঁহারা কেমনে পুরুষকারকে পরিহার করিতে পারেন? মোক্ষসাধন প্রত্যেক প্রকৃত আর্য্যের চরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য; নিবৃত্তিমার্গ প্রত্যেক আর্য্য পথিকের পক্ষে পবিত্র পথ ও পবিত্র আশ্রয়; এবং স্বধর্ম্ম, স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্মের শাস্ত্র, গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে রক্ষা ও পালন করা প্রত্যেক আর্য্যের মোক্ষলাভের অন্যতম উপায়। ইহা যাহার ব্রত নহে, সে ব্যক্তি "আর্য্য" নহে; হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার তাহার আদৌ অধিকার নাই; এই ব্যক্তি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও পশুত্বে পরিণত। বিজলীর চমকে যাহার প্রাণ চমকিয়া উঠে, পুষ্পের আঘাতে যাহার দেহে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ পরিত্যাগে যে নরাধম কাতর হয়, মোক্ষ-সাধনার জন্য পরিশ্রম করিতে যে অপটু, সে ব্যক্তি আর্য্যহিন্দু নহে, তাহার ছায়া স্পর্শ করিলেও "পতিত" হইতে হয়। প্রাণের মমতা হিন্দুর মনে থাকিতেই পারে না, স্বজাতি-

প্রেমিক হিন্দু চিরদিনই মরণে মমতা শূন্য,—এই জন্য "হিন্দু" নাম আমাদের আঁধারের আলোক, নিরাশায় আশা, বিষাদে সন্তোষ এবং দুর্ব্বলতায় মহাবল।

হিন্দু চিরকালই মহাশক্তির মহোপাসক। হিন্দু চিরকালই পুরুষ-কারকে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। রণেই মরুক আর বনেই মরুক, মনেই মরুক আর কোণেই মরুক, হিন্দু মরিতে ডরে না, কারণ হিন্দু-জাতি মহাশক্তির মহোপাসক।

"সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে
শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী
নারায়ণী নমস্তুতে॥"

মহাশক্তিরূপিণী মহামায়া—মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী মহাশক্তি—যাহার আরাধনার দেবী, তাহার আবার ভয় কি? তাহার আবার চিন্তা কি?

"চতুর্ব্বর্গ স্বরূপিণী ত্বং হি
শক্তি মহামায়ে।
বরদে বরদে মাতঃ দানবাক্রান্ত
সন্তানে॥"

অতএব আইস আমরা এই নববর্ষের শুভ প্রথমে বাঙ্গালী হিন্দুবর্গ মিলিত হইয়া, দ্বেষ-বিদ্বেষ পরিহার পুরঃসরঃ, স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, সহস্র কণ্ঠ, লক্ষ কণ্ঠ কোটি কণ্ঠ মিলাইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া বলি—

বন্দে মাতরং
বন্দে পদচিহ্নং

ঐ শোভাময় সুনীল আকাশের দিকে অবলোকন কর; ঐ পবিত্র পদচিহ্নের মহাপুরুষ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তোমার শ্রী ও সিদ্ধিলাভের সফলতা জ্ঞাপন করিতেছেন। তুমি সকামী হও আর নিষ্কামী হও, এই মহামন্ত্রের জপ করিতে করিতে—এই মহামন্ত্রের সাধনা করিতে করিতে—যদি মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহা হইলে স্বর্গের সুবর্ণ সিংহাসন তোমার জন্য প্রসারিত থাকিবে, তুমি সেই ত্রিদিবলোকে অক্ষয় অব্যয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিয়া সাযুজ্য মোক্ষ লাভ করিবে। যে সকল মহামানবেরা—মহাপুরুষেরা—নিজের শরীরের শোণিত দিয়া মাতার সেবা ও তর্পণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গলোক হইতে তোমাদিগকে শিখাইতেছেন—

বন্দে মাতরং
বন্দে পদচিহ্নং॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

রেতী মায়ী।

"অহো! কস্য ন মানসং বদ মহাবিস্ময়াম্বুধৌ মজ্জতি।"—ভারবী।

অনেক দিন পূর্ব্বে, রাজপুতনা প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে, যশলমীর নামক হিন্দুরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যশলমীরাভিমুখে রেলওয়ে লাইন ছিলনা, এখনও নাই, সুতরাং যোধপুর হইতে বিকানীরের প্রান্তভাগ দিয়া বিবিধ সুবিশাল প্রান্তর, অনেকগুলি ছোট বড় পর্ব্বত এবং পাদপ ও ব্রততী পরিশূন্য নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক যশলমীরে উপস্থিত হইতে

হইয়াছিল। তদ্দেশীয় কোনও বন্ধুর বাটীতে অবস্থানকালে নানা কারণে আমি এমন অসুস্থ হইয়া উঠিলাম যে, যশলমীরাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের চিকিৎসালয়ে গিয়া আমাকে চিকিৎসিত হইতে হইয়াছিল। পঞ্জাব প্রদেশের একটি সুশিক্ষিত যুবক-ডাক্তার হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ পরিচয় হইবার পরে তিনি আমাকে হাঁসপাতালে রাখিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চিকিৎসালয়ের মধ্যভাগে একটি অনতিবৃহৎ "হল" (Hall) এবং তাহারই চতুঃপার্শ্বে রোগীদিগের অবস্থানের কামরা দেখিলাম। ঐ হলে কয়েক খানি চেয়ার, তিনটী পুরাতন মোড়া, দুইখানি বড় বেঞ্চ এবং দুই খানি টেবিল ছিল, ইহাই ডাক্তারের অফিস। ইহার দক্ষিণ দিকের কামরায় আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেই খানে চারিটি রোগীর জন্য চারি খানি খাট ছিল; প্রথমটিতে একটি মাড়োয়ারী বৃদ্ধ, দ্বিতীয়টিতে একটী যুবক, তৃতীয়টিতে আমার বিছানা এবং চতুর্থটি সে সময়ে কেহ না থাকায় খালি ছিল। দুই দিবস পরে বৃদ্ধ রোগিটি আরোগ্যলাভ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেল; সেই কামরায় আমি এবং ঐ যুবক রহিলাম। পঞ্চম দিবসে প্রেমসিংহ নামে এক ব্যক্তি উৎকট নিওমোনিয়া (শ্বাস কাস) রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসিত হইবার জন্যে ডাক্তারের পরামর্শ মতে আমাদের কামরায় প্রবেশ করিল, বৃদ্ধের খাটে তাহার বিছানা বিস্তৃত হইল। প্রেম সিংকে দেখিয়া সুন্দর মূর্ত্তির যুবা বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। সেই মিষ্টভাষী এবং ধর্ম্মভীরু যুবার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার সময় আমি তাহার হিন্দুশাস্ত্রে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া অতীব আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। সায়াহ্নের কিছু পূর্ব্বে প্রেমসিং হাঁস-

পাতালে আসিয়াছিল, কিন্তু রাত্রি দশম ঘটিকা অতীত না হইতে হইতে উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভবলীলা সম্বরণ করিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে প্রেমসিং আমার নিকটে শীতল জল প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ডাক্তার আমাকে গোপনে বলিয়া দিয়াছিলেন "প্রেম সিংহ পিপাসিত হইয়া জল চাহিলে আপনি তাহাকে গরম দুগ্ধ খাইতে দিবেন; যেন সে কোন মতেই শীতল জল না খায়।" আমি প্রেম সিংহকে দুগ্ধ দিয়াছিলাম, কিন্তু সে দুগ্ধের পেয়ালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ জল প্রার্থনা করিয়াছিল; শীতল জল খাইলে তাহার রোগ এবং যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইবে এই ভয়ে তাহাকে আমি জল দিতে পারি নাই। সে মরিয়া গেলে আমার মনে অতিশয় কষ্টানুভব হইল, ভাবিলাম আমি কি হতভাগ্য! পিপাসিত মানবের সামান্য শেষ অনুরোধটিও রক্ষা করিতে আমি সমর্থ হইলাম না।

প্রেম সিংহের প্রাণত্যাগ হইলে, দ্বিতীয় খাটের যুবক অত্যন্ত ভীত হইয়া অপর একটি কামরায় শুইতে গেল, আমি সেই ঘোর অন্ধকারময়ী কুঠুরীতে রাত্রিকালে একাকী মৃতদেহের পার্শ্বস্থ খাটে শুইয়া রহিলাম। আমার এবং মৃত ব্যক্তির এতদুভয়ের খাটের মধ্যে কেবল তিন হাত ব্যবধান ছিল। সমুদয় হাঁসপাতালে একটি মাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছিল সুতরাং রোগীদের কামরার সহিত ঐ আলোকের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমি গুরুপদ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমার বোধ হইল যেন সেই কামরা মধ্যে দুই ব্যক্তি মৃদু মধুর স্বরে পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মৃত দেহের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিলাম। সেই ঘোর অন্ধকারে যাহা কিছু দেখা গেল, তাহাতে আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। আমার খাটে দেশ-

লাইর বাক্স ছিল, ঝটিতি তাহা জ্বালিয়া ভাল করিয়া একবার মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। শরীর পুনরায় কণ্টকিত হইল, মনে ভয় ও ভক্তির যুগপৎ সঞ্চার হইয়া উঠিল। দেখিলাম, সেই শবের পার্শ্বে জটাজুট সম্বলিতা, মলিনও ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা এবং বৃদ্ধবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। ঐ স্ত্রীলোককে দেখিতে কৃশাঙ্গী এবং তাঁহার সর্ব্বশরীর ভস্মমাখা।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মা! আপনি কে?" সে কথার কেহই উত্তর দিল না। পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহা পুরুষ রোগীর হাঁসপাতাল, এখানে স্ত্রীলোকের প্রবেশের অধিকার নাই, আপনি কেমন করিয়া—বিশেষতঃ এই রাত্রে কেমন করিয়া এখানে আসিলেন?" এবারেও কোনও উত্তর পাইলাম না। নিমেষ মধ্যে সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কামরা পরিত্যাগ করিয়া হলের দিকে চলিল, আমি তন্মুহূর্ত্তেই দৌড়িয়া গিয়া তাহার পদানুসরণ করিলাম, কিন্তু দেখিতে দেখিতে, চক্ষের পলকে, বৃদ্ধা অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি হল হইতে লণ্ঠন লইয়া প্রত্যেক কামরা এবং হাঁসপাতালের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। হাঁসপাতালের মোটে একটি দ্বার, সেই দ্বারে সিপাহী পাহারা থাকিত; আমি সিপাহীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কাহাকেও এই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে অথবা উপর হইতে নীচে নামিতে দেখিয়াছ কি?" সিপাহী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "মহাশয়! আমি কাহাকেও উঠিতে বা নামিতে দেখি নাই।" আমি পুনরায় উপরে আসিয়া, সেই কামরাতেই প্রবেশ করিলাম। লণ্ঠনটি নিকটে রাখিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলাম; কাহারও নিদ্রাভঙ্গ করিয়া একথা প্রকাশ করি নাই।

রজনী প্রভাত হইলে ডাক্তার এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা আসিয়া

মৃত দেহকে স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন। চাকরেরা আমাদের কামরাটিকে উত্তমরূপে জলদ্বারা প্রধোত করিয়া পরে গন্ধকের ধূঁয়া (Fumigate) দিল। রাত্রিতে যে যুবা বয়স্ক রোগী ভয়ে অন্য কামরায় শুইতে গিয়াছিল, সে আবার আমার কামরায় আসিয়া তাহার পূর্ব্বকার খাটে বিছানা বিস্তৃত করিল। আমরা দুই জনে সেই ঘরে রহিলাম। রজনীর ঘটনার কোনও কথা যুবাকে বলি নাই। রাত্রি দুই ঘটিকার সময় আমাদের ঘরে একটা বিকট চীৎকারধ্বনি শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিলাম, যুবা রোগী তাহার বিছানায় নাই, অথচ তাহার খাটের নীচে হইতে অতি ক্ষীণ ভাবে উৎকট যন্ত্রণা-সূচক গোঁ গোঁ স্বর শুনা যাইতেছে। হলের লণ্ঠন আনিয়া দেখিলাম, যুবা রোগী খাট হইতে পড়িয়া গিয়া গড়াইতে গড়াইতে খাটের তলে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ঝটিতি তাহাকে উঠাইয়া তাহার মুখে ও চোখে জল দিলাম এবং তাহার পরে জিসাজ্ঞা করিলাম "তোমার কি হইয়াছে?" সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল কিন্তু কথা কহিতে পারিল না। অনেক কষ্টে এবং অনেকক্ষণ পরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে সে বলিল "মহাশয়! আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, আমার কথা কহিবার শক্তি নাই।" আমি তাহাকে অভয় দিয়া বলিলাম, "আমি তোমার নিকটে রহিয়াছি, আর ভয় নাই। যে জন্য ভীত হইয়াছ তাহা খুলিয়া বল, গোপন করিও না। "যুবক বলিল," যাহা দেখিয়াছি তাহা মনে করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়; এখনও দেহ কণ্টকিত হইতেছে। আমি নিদ্রিত ছিলাম, স্বপ্ন দেখিলাম, যে খাটে গত কল্য রাত্রে মাড়োয়ারী যুবা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহারই পার্শ্বে প্রেমসিংহকে কোলে লইয়া একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেওয়ালের দিকে চাহিয়া কি একটা অদ্ভুত পদার্থ দেখাই-

তেছে। প্রেম সিংহ হাসিতেছে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেই স্ত্রীলোককে দেখিলে কিরূপ আকৃতি বলিয়া বোধ হয়? “তিনি কৃশাঙ্গী, তাঁহার মাথায় জটা, গায়ে ভস্ম এবং কটিদেশে অতি ছিন্ন এবং অতি পুরাতন মলিন গৈরিক বসন। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, মা তুমি কে? স্বপ্নে বোধ হইল, যেন তিনি বিকট মুখব্যাদান করিয়া আমাকে গ্রাস করিতে আসিলেন। তাঁহার মুখের গহ্বর হইতে যেন মহাশ্মশানের প্রজ্বলিত হুতাশন নির্গত হইতেছিল। স্বপ্নে ইহাই দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম, তাহার পরে কি হইয়াছিল জানি না, কিন্তু আমার মাথায় বেদনা বোধ হইতেছে; বোধ হয়, খাট হইতে পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।” যুবার মুখে এই অত্যাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া আমি ঝটিতি কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আসিয়া বেদনার চিকিৎসা করিলেন। কম্পাউণ্ডার চলিয়া গেলে, সেই কামরা মধ্যে যুবা এবং আমি উপবিষ্ট হইয়া গল্প করিতে করিতে রাত্রির অবশিষ্ট সময় কাটাইয়া দিলাম। প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলে যুবা রোগী নিজের ইচ্ছানুসারে রেজেষ্টি হইতে নাম কাটাইয়া স্বগৃহে চলিয়া গেল। রাত্রির ঘটনা সে কাহাকেও বলে নাই, আমিও কাহার নিকটে প্রকাশ করি নাই। যুবা চলিয়া গেলে আমি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যুবা যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছে, আমি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। যুবা বা অপর কেহ আমার প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই, অথচ যুবার স্বপ্ন এবং আমার প্রত্যক্ষ দর্শন একই বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। আমি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং সেই দিন সায়াহ্নে হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর বাটীতে চলিয়া গেলাম। বন্ধুদিগের মধ্যে কেহই একথা জানিতে পারিল না। এক সপ্তাহের পরে যশলমীর হইতে আমি স্থানান্তরে

গেলাম। ক্রমে একথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, কাহারও নিকটে আলোচনা করি নাই। •

ইহার অনেক দিন পরে বেহারের অন্তর্গত বেটিয়া নামক স্থানে কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ আমাকে যাইতে হইয়াছিল। আমি মোকামা ঘাটে জাহাজযোগে গঙ্গাপার হইয়া অপর পারস্থিত সমেরিয়া (Samariah) নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। তখন অপরাহ্ন, গাড়ীরও বিশেষ সুবিধা ছিল না, বিশেষতঃ শরীর ক্লান্ত হইয়াছিল, সুতরাং একদিন বিশ্রামলাভ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। ক্ষুদ্র সামেরিয়া ষ্টেশনের চারিপার্শ্বে ময়দান ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন, 'এখান হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিয়া গেলে আপনি সামেরিয়া গ্রাম দেখিতে পাইবেন, তথায় আপনি স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন। বিশেষতঃ আজি কালি সামেরিয়ার গঙ্গাতটে এক মহামেলা হইতেছে, তাহাতে নানা স্থান হইতে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, ঐ মেলা দেখিবার যোগ্য।' ষ্টেশন মাষ্টারের কথা শ্রবণ করিয়া আমি সামেরিয়ার মেলায় গিয়া পৌঁছিলাম। একটা দোকানে বসিয়া কিছু আহার করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম, মুঙ্গের হইতে একজন সবডেপুটী কলেকটর ঐ মেলার শান্তিরক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ঐ সময়ে কাছারী করিতেছিলেন। লোকমুখে তাঁহার পরিচয় পাইয়া বুঝিলাম, তিনি আমার একজন পুরাতন বন্ধু। আমি দোকান হইতে চলিয়া গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারই তাবুতে রহিলাম। রজনী প্রভাত হইলে সবডেপুটী সরকারী কার্য্য করিতে চলিয়া গেলেন; মুখ হাত ধুইয়া আমি মেলা দেখিতে গেলাম। নানা স্থানে ও নানা দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে, একটা প্রকাণ্ড অথচ পুরাতন বৃক্ষের তলে, একজন

বিপুলবপু মুসলমান দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকারের দ্রব্য নিলাম করিতেছে, তাহা দেখিলাম। বহুসংখ্যক লোক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ আর একদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই বৃক্ষের তলে কেবল একটি মনুষ্য মূর্ত্তি ব্যাঘ্র চর্ম্ম বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। দূরে ছিলাম বলিয়া লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই। নিকটে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত হইল, আমি কাঁপিতে লাগিলাম, দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। আবার দেখিলাম, আরও ভীতির সঞ্চার হইল। দেহস্থ ধমনীতে খরতর বেগে শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। ভাবিলাম, ইহা কল্পনা কি প্রত্যক্ষ দর্শন? ভাবিলাম, ইহা কি ইন্দ্রজাল?

দেখিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যশলমীরের মহারাজার হাসপাতালে এক যুবক রোগী যাঁহাকে স্বপ্নে এবং আমি যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম, সেই বৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণী এই বৃক্ষতলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে অনেক দিন পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাঁহার আকৃতি প্রভৃতি ভুলি নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিয়া দেখিয়া স্থির করিলাম, ইহাঁর আকৃতি, জটাজুট, বস্ত্রাদি, বয়স প্রভৃতির সহিত যশলমীর হাসপাতালের ব্রহ্মচারিণীর কিছুই ভিন্নতা নাই। আমি খুব নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি আমার দিকে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন এবং দেখিবা মাত্র ব্যাঘ্র চর্ম্মখানি হাতে লইয়া সেই বিষম জনতার মধ্যে তীব্র বেগে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্যা হইলেন। আমিও দৌড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি নাই। আমি তন্ন তন্ন করিয়া মেলার প্রায় সকল স্থানই অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। সত্বরে তাম্বুতে ফিরিয়া আসিয়া সবডেপুটীকে বলিলাম, "আপনাকে আমার নিজের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য অনুরোধ করিতেছি, আপনি

এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন কি ?” তিনি ইহাতে সম্মত হওয়ায় আমি বলিলাম, “এই মেলায়,ছিন্ন ও মলিন গৈরিকবস্ত্র পরিহিতা, জটাজুট সমন্বিতা, বৃদ্ধাবয়স্কা এবং কৃশাঙ্গী কোনও ব্রহ্মচারিণী আছেন কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।” কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সবডেপুটী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কহিলাম “কারণ বলিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন, তাহা হইলে অনুসন্ধানের বিলম্ব হইয়া যাইবে।” যাহা হউক, তৎক্ষণাৎ চৌকিদার, কনেষ্টবল এবং আরও অনেক লোকের দ্বারা তীব্র অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার দর্শনলাভ হইল না। রেলওয়ে ষ্টেশনে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে এবং নানা পথে তাঁহার অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যেমন অদৃশ্যা হইয়া গিয়াছিলেন, তেমনি অদৃশ্যাই রহিলেন। আর বৃথা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই দেখিয়া অনুসন্ধান বন্ধ করা হইল। আমি সে কথার আর পুনঃ প্রসঙ্গ করিলাম না। সবডেপুটী পুনঃ পুনঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলাম যে, “সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিণীদিগের অলৌকিক লীলা সমূহের মধ্যে এমন অনেক গুরুতর রহস্যময়ী কথা থাকে, যাহা সকল সময়ে গৃহী লোকদিগের সম্মুখে প্রকট করা দূষণীয় হইয়া উঠে।” সব্‌ডেপুটী আর কোনও প্রশ্ন করিলেন না। তিনি বিশিষ্ট ভদ্র লোক ছিলেন বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অতীব সংকীর্ণ ছিল, বিশেষতঃ তিনি সংশয়াত্মিক পুরুষ ছিলেন, এজন্য এরূপ লোকের নিকট এতাদৃশী রহস্যময়ী কথা প্রকাশ করা অযৌক্তিক। যাহা হউক, আমি সামেরিয়া হইতে বেটিয়া গিয়াছিলাম, বেটিয়ায় কিছুদিন থাকিবার পরে অন্যত্রে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

কয়েক মাস পরে আমি মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া মাদ্রাজের পার্শ্ববর্ত্তী আদিয়ার (Adyar) নামক প্রসিদ্ধ উপনগরে প্রখ্যাত নাম্নী মাদাম ব্লাভাটস্কি মহোদায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে সমুদয় কথা খুলিয়া বলায়, তিনি বলিলেন "যশলমীর হাঁসপাতালে যে যুবক রোগীর নিওমনিয়া রোগে মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার সহিত এই ব্রহ্মচারিণীর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা জানিতে পারিলে বড় ভাল হয়।" আমি যশলমীরের বন্ধুদিগকে পত্র লিখিলাম; এত দিন যে ঘটনা অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলাম, পত্রে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলাম। কিছু দিবস পরে বন্ধুবৃন্দ হিন্দি ভাষায় আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম।

যশলমীরের পত্র।

"আপনার পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলাম। আমরা স্বল্পজ্ঞানী ও মায়াবদ্ধ সংসারী জীব, তাহাতেই এতাদৃশ বিস্মিত হইয়াছি, নতুবা ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? প্রতি দিবসে, অধিক কি প্রতি ঘণ্টায় আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষ ও মহিম্নী গুর্ব্বীবৃন্দ কর্ত্তৃক যে সকল অলৌকিক লীলা সম্পাদিত হইতেছে, কয়জন মানুষ তাহা দেখে, জানে ও বুঝে? যাহা হউক, এ বিষয়ে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। মৃত মাড়োয়ারী যুবক (প্রেমসিং) ঐ ব্রহ্মচারিণীর দীক্ষিত শিষ্য ছিল। গত চারি বৎসর হইতে ঐ ব্রহ্মচারিণী এ দেশে বাস করিতেছেন, তিনি অধিকাংশ সময় বালুকার উপর বসিয়া ও শুইয়া থাকেন, এই জন্য এখানকার লোক তাঁহাকে রেতী মায়ী বলিয়া ডাকে। আমাদের দেশে 'রেৎ' অর্থে বালুকা বুঝায়। ঐ যুবকের রোগোৎপাদনের প্রায় পঞ্চমাসকাল পূর্ব্বে

ব্রহ্মচারিণী মহাশয়া স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রেমসিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি যশলমীর সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং হাসপাতালে গিয়া প্রেমকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। তিনি হাসপাতালে গিয়াছিলেন কি না জানি না, যদি গিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেমনে বা কোন্ সময়ে গিয়াছিলেন, জানি না। তাঁহার অনেক অলৌকিক ক্রিয়া আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। মৃত ব্যক্তি আমাদের স্বজাতি ছিল এবং আমাদের বাটীর অনতিদূরেই বাস করিত। সে অতি ভাল লোক ছিল এবং মাতাজীর খুব প্রিয় শিষ্য ছিল। আমরা প্রেমসিংহকে খুব চিনিতাম ও জানিতাম। অনুসন্ধানের কিছু ত্রুটি হয় নাই জানিবেন।"

এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া মাননীয়া মাদাম ব্লাভাট্স্কিকে তাহা দেখাইয়াছিলাম। হিন্দী পত্র original এবং তাহার ইংরাজি অনুবাদ তিনি আমার নিকট হইতে লইয়া তাঁহার কাগজাদির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

দুই দিবস পরে মাদাম ব্লাভাট্স্কি আমাকে আবার ডাকাইয়া যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। তিনি নিশীথকালে অতি গোপনে আমাকে বলিয়াছিলেন, "প্রিয় শিষ্যদিগের দেহান্তর হইলে ভক্তবৎসল গুরুরা আবশ্যক মত, তাহাদিগকে দেখিতে আইসেন। এরূপ ঘটনা বিচিত্র নহে। আমি স্বয়ং এরূপ ঘটনা অনেক দেখিয়াছি। সম্প্রতি এক স্থানে গিয়াছিলাম, তথায় একটি অর্গলবদ্ধ কামরার মধ্যে গৃহস্বামী একাকী বসিয়া কথোপকথন করিতেছে শুনিতে পাইয়াছিলাম, অথচ গৃহে অপর কেহ ছিল না। দুই জনের ভিন্ন ভিন্ন স্বর, এক জন প্রশ্নকর্ত্তা: এবং অন্য জন উত্তরদাতা। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এইরূপ কথোপকথন চলিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, গৃহস্বামীর গুরু আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু সে দিনে প্রায় সাত শত ক্রোশ দূরে ছিলেন। বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর তীব্র বেগে মহাপুরুষেরা গমনাগমন করিতে পারেন। আমি গৃহের দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র ঘরের ভিতর হইতে প্রবল বায়ুবেগে কিছু উড়িয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি কামরার ভিতরে গিয়া দেখি, সেই ভদ্রলোকটি ভিন্ন আর কেহ ছিল না, একটি ক্ষীণ-জ্যোতির আলোক জ্বলিতেছিল, এবং গৃহের সমস্ত অংশ অতি মনোহর সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।" ইত্যাদি।

ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি মধ্যভারতের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় কাল-ভৈরব নামক প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দিরে ঐ রেতী মায়ীকে আর একবার দেখিয়াছিলাম। সে বারে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় হয় নাই, অত্যন্ত আনন্দের উৎপাদন হইয়াছিল। সভক্তি তাঁহার চরণস্পর্শ করায় তিনি সস্নেহে আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যশলমীর হাসপাতালের ভীত যুবক যাঁহাকে স্বপ্নে এবং আমি যাহাকে হাসপাতালে ও সামেরিয়ায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম, তিনি যে সেই ব্রহ্মচারিণী, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "মা! প্রেমসিংহ মৃত্যুকালে অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া আমার নিকট জল প্রার্থনা করিয়াছিল, ডাক্তারের নিষেধ বাক্যে আমি জল দিতে পারি নাই, সে জন্য আমার এখনও মনোকষ্ট রহিয়াছে।" মৃদু হাস্য করিয়া তিনি উত্তর দিলেন "সে জন্য প্রেম দুঃখিত হয় নাই, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহার মুখে এ কথা শুনিতে পার। আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতে পারি।"

এই খানেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম। উজ্জয়িনীতে যাহা কিছু শুনিয়াছিলাম বা দেখিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা করিব না; নানা কারণে

সকল কথা ব্যক্ত করা অযৌক্তিক। সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি-দিগের নিকট সকলই সংশয়াত্মক ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না, সংশয়াত্মকের ইহকাল ও পরকাল এই উভয় কালই নষ্ট হয়। যাহা হউক, সংশয়ীদিগের জন্য এই ঘটনা বিবৃত করি নাই; সৌভাগ্যবান্ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহা পাঠ করেন, ইহাই আকাঙ্ক্ষা। মহাপুরুষ ও মহিমী গুর্ব্বীদিগের যাঁহারা অনুগ্রহভাজন হইতে পারেন, তাঁহারাই জগতে ধন্য এবং তাঁহাদের মানবজনম সার্থক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অদৃষ্ট-খণ্ডন।

Pure or Asiatic Fatalism, the Fatalism of OEdipus, holds that our actions do not depend upon our desires ; whatever our wishes may be, a superior power, or an abstract destiny, will overrule them, and compel to act, not as we desire, but in the manner predestined.——

John S. Mill.

ভাগ্য বা প্রাক্তন অথবা অদৃষ্ট নামে কোনও পদার্থ আছে কিনা, এই গুরুতর অথচ মহাপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের মিমাংসা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হয় নাই। কেবল এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে "হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ আছে এবং এই জন্মান্তরে ও অদৃষ্টে হিন্দুর অচল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে তাহারা শোক দুঃখ ভুলিয়া যায়, বিপদে পড়িয়াও হতাশ্বাস হয় না। এমন কি, এই বলে বলীয়ান্

হইয়া তাহারা মৃত্যুকেও গ্রাহ্য করে না।" এই সন্তাপ ও আপদময় সংসারের গতি এতই কুটিলা যে, অদৃষ্টবাদে যাঁহাদের আদৌ আস্থা নাই, তাঁহারাও সময়ে সময়ে অদৃষ্টের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। সেক্ষপিয়র, মিল্টন প্রভৃতি বড় বড় খৃষ্টীয় কবিরা অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন এবং মুসলমান ও বৌদ্ধগণ আপনাদিগকে ভাগ্যের দাসানুদাস বলিয়া এখনও প্রগাঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। রাবণ-রাজার "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ" প্রভৃতি শ্লোকে অদৃষ্টে তাঁহার বিশ্বাস থাকা সম্বন্ধে সুন্দর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ওয়ার্ডশ্‌য়োয়ার্থ বলিয়াছিলেন—

"Our brith is but a sleep and
a forgetting ;
The soul, that rises with us,
Our life's Star,
Hath had elsewhere its setting'
And cometh from afar."—

কবির এই কবিতায় জন্মান্তরের ছায়া আছে। জন্মান্তরতত্ত্বের কথা প্রাচীন য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং খ্রীষ্টানের বাইবেলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জন্মান্তর মানিলেই অদৃষ্ট মানিতে হইবে এবং অদৃষ্ট মানিলেই জন্মান্তরে আপনা হইতেই বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। অদৃষ্টবাদ এবং জন্মান্তরবাদ এই দুইটি বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতে মনুষ্যজাতির বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক অথবা সম্পূর্ণ সত্যমূলক, বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার মীমাংসা করিবার অবসর নাই। অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে যতই তর্ক উপস্থিত হউক, অদৃষ্টবাদের পরিপোষক যুক্তি সমূহকে বিচার দ্বারা যতই খণ্ড বিখণ্ড করা যাউক, মায়াবী সংসারী মানবের মনে অদৃষ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আস্থা আপনা হইতেই আসিয়া

উপস্থিত হয়। দুঃখে, শোকে সন্তাপে, পীড়ায়, দারিদ্র্যতায়, স্বজনবিরহে, হতাশায় মনুষ্য যখন কর্ত্তিতকণ্ঠ রোহিতের ন্যায় এই মায়াময় সংসারে জরজর হইয়া পড়ে, যখন তাহার নিজের চেষ্টা, নিজের উদ্যম, নিজের যত্ন ও পরিশ্রম কোনও প্রকারেই ফলদায়ক হইতেছে না দেখে, তখন মনুষ্য সহজেই মনে করে, "আমার ইচ্ছায়, আমার চেষ্টায় কিছুই হয় না এবং কিছুই হইতে পারে না; আমি অবশ্য আমার অদৃষ্টের দাস। আমার অদৃষ্ট আমাকে যেমন চালাইবে, আমি সেইরূপে পরিচালিত হইব।" এই জন্য ওশমানগণী চিরকাল অদৃষ্টে অবিশ্বাস করিয়া, জীবনের শেষভাগে জনৈক আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন "আরফ্‌তা রব্বি বফশ্‌কিল্‌ অজায়ামে।" ওশ্‌মানগণী একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন; তর্ক শাস্ত্রে এবং প্রাচীন নৈসর্গিক দর্শনে তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি ঘোরতর অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অদৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উপদেশও প্রদান করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টে বিশ্বাস করা মানুষের একটা স্বাভাবিকী ইচ্ছা; এই জন্য অদৃষ্ট-প্রতিবাদীর সংখ্যা অপেক্ষা অদৃষ্ট-বাদীর সংখ্যা লক্ষগুণ অধিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র হিন্দুজাতি এবং সমগ্র জৈন ও বৌদ্ধ জাতি অদৃষ্টের ঘোরতর পক্ষপাতী; পার্শী, আর্ম্মেণী এবং সারাকীণ জাতিত্রয় অদৃষ্টবাদে প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখেন; সমগ্র মুসলমান জাতি "তগ্‌দীর" ভিন্ন কথাটি কহেন না; য়িহুদীরা মুখে যাহাই বলুক, "কপাল" নামক এক অদৃশ্যমান শক্তির অধীনে যে সকলেই অবস্থিত, ইহাই তাহাদের হৃদয়ের বিশ্বাস এবং তাহাই তাহাদের জাতীয় সংস্কার। বাইবেলের নিউটেশ্‌টামেণ্ট অংশের বহুল পুস্তকে ভাগ্যবাদের কথা আছে। মহামতি পল (St. Paul) অদৃষ্টবাদী ছিলেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া,

প্রভৃতি দেশের খৃষ্টান অধিবাসীদিগের সম্মুখে জ্যোতিষের কথা তুলিলেই, তাহারা ভাগ্য পরীক্ষা করাইবার জন্য সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া জ্যোতিষিকের নিকটে উপস্থিত হয়। অদৃষ্টে বিশ্বাস না থাকিলে, পাগলের মত দৌড়িয়া যায় কেন? "ভবিষ্যতে কি হইবে" এ কথা জানিবার জন্য মানবের মন স্বভাবতঃ উৎসুক হয় এবং যে ব্যক্তি সেই ঔৎসুক্য মিটাইয়া দিয়া একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক মনুষ্যের ভক্তি ও সম্মানের যোগ্য এবং সেই জন্য এইরূপ ব্যক্তি সমূহ ক্রমে "মহাপুরুষ" "ভবিষ্যদ্বক্তা" "ত্রিকালজ্ঞ" প্রভৃতি সম্মানিত উপাধিতে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টবাদীর সংখ্যা পৃথিবীতে শতকরা ৯৫ জন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অদৃষ্টবাদ, সত্য কি মিথ্যা, তাহার মীমাংসা করিবার এখন অবকাশ নাই; যাঁহারা অদৃষ্টে অবিশ্বাস করেন, অথবা "ভাগ্য" বলিয়া কোনও পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অস্বীকৃত কিম্বা সন্দিহান, তাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই; যাঁহারা অদৃষ্টে আস্থা রাখেন, তাঁহাদের জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের নাম "অদৃষ্ট-খণ্ডন"; একটি গুরুতর অথচ মহা প্রয়োজনীয় প্রশ্নের ইহাতে মীমাংসা করা হইয়াছে; একটি অতি প্রাচীন এবং দুর্ভেদ্য সমস্যার ইহাতে পূরণ করা হইয়াছে। যাহারা অদৃষ্ট মানে, তাহাদের ধারণা এই যে, ঈশ্বর আমার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন অথবা আমার কর্ম্মফলে যাহা প্রসূত হইয়াছে, তাহারই নাম ভাগ্য বা অদৃষ্ট, সুতরাং ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা নাই। কপালে যাহা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তাহার বিপরীত দিকে যাওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত অথবা অদৃষ্টচক্রকে ঘুরাইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে স্বতন্ত্র করতঃ পথান্তরে আনাও অসম্ভব, অতএব আমরা সকলেই অদৃ-

ষ্টের দাসানুদাস।" ইত্যাদি। আমিও অদৃষ্টবাদী; অদৃষ্টবাদে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস, কিন্তু আমার বিশ্বাস জন-সাধারণের বিশ্বাসের সহিত এক নহে। আমি অদৃষ্টে বিশ্বাস করি, এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া "অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়" এই কথায় আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে ইহার কোনও অর্থ নাই। অনিয়ম করিলে জ্বর হইবে; অনিয়মে জ্বর হয় ইহা সত্য, এই সত্যে আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু জ্বর হইলে পর তাহার কোনও প্রতীকার হইবে না, তাহার ঔষধ, তাহার চিকিৎসা, তাহার শুশ্রূষা চলিবে না, এরূপ কথায় আমার আস্থা নাই। কর্ম্মফলবশতঃ অদৃষ্টরূপ প্রকোষ্ঠে ভাল অথবা মন্দ, পুণ্য অথবা পাপ, সুখ অথবা দুঃখ, যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা একেবারে অটল, অচল, অখণ্ড, (অচ্ছেদ্য) অথবা অপরিবর্ত্তনীয়, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। এক পরমাত্মা ভিন্ন এই বিশ্বসংসারে অদাহ্য, অশোষ্য, অখণ্ড্য, অচ্ছেদ্য অথবা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় আর কিছু থাকিতে পারে না। যেখানে রোগ, সেই খানেই ঔষধ, যেখানে অন্ধকার, সেইখানে আলোক; যেখানে অত্যাচার, সেই খানেই পরিত্রাণ; যেখানে ভয়ানক ধর্ম্মগ্লানি, সেই খানেই ধর্ম্ম-স্থাপন——ইহাই সংসারের নিত্য নিয়ম; সকল বিষয়েই এই এক নিয়ম, তবে অদৃষ্ট সম্বন্ধে এই নিয়মের পরিবর্ত্তন কেমনে সম্ভবপর হইতে পারে? ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি অধর্ম্মের পরিত্রাণ; আমি ভয়াতুরের অভয়; আমি দুঃখে শান্তি, আমি চিন্তায় সন্তোষ এবং আমি আশাহীনের সুখময়ী আশা।" এই প্রাণশীতলকর মধুমাখা ঈশ্বরবাণী শুনিয়া আর কি বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "আমার আর পরিত্রাণ নাই, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে; অতএব চেষ্টা, উদ্যম অর্থব্যয় প্রভৃতির কিছুই আবশ্যকতা নাই?" কবিবর পোপ লিখিয়াছেন——

"Where the Devil builds a tower of power,
God creates a house of prayer there."

অর্থাৎ, যেখানে পাপের ক্ষমতার প্রাবল্য, সেই খানেই সেই পতিতপাবন পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অপার করুণা, অনন্ত মহিমা এবং অপৌরুষের শক্তি বলে, পাপের প্রশস্ত প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধর্ম্মের পবিত্র ও শান্তিময় মন্দিরের উদ্ভব! সংসারের এই নিয়ম। নদ, নদী, সরোবরে বা সাগরে স্নান করিতে গিয়া আমরা নিত্য দেখিতে পাই, জলরাশি হইতে একমুষ্টি জল গ্রহণ করিলে সে স্থান খালি থাকে না, তৎক্ষণাৎ অন্যস্থান হইতে দেখিতে দেখিতে জলস্রোত আসিয়া শূন্য স্থানকে পূর্ণ করিয়া দেয়। এই জন্যই কবি কাম্বেল বলিতেছেন——

"Liberal ; not lavish is kind
Nature's hand, for good and
Good counteracts the evil——

যদি আমার অদৃষ্টেরই আমি প্রকৃত দাস, যদি অদৃষ্ট ভিন্ন আমার অন্য উপায় বা অন্য পথ অথবা অন্য গতি না থাকে, তাহা হইলে সংসারে আমার তুল্য হতভাগ্য মানব আর দ্বিতীয় নাই। মনুষ্য (Man) তাঁহার অবস্থার (Circumstances এর) অনুগত জীব (Creature), ইহা নিরবচ্ছিন্ন সত্য হইলেও, এই অবস্থাগুলির (Circumstances) পরিবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব নহে। "ক্রিয়ার শেষস্থ ন মূর্দ্ধণ্য হয় না" ইহা ব্যাকরণের একটি সত্য; "দুই আর দুই, চারি হয়" ইহা গণিতের একটি অকাট্য সত্য; "আলোক হইতে উত্তাপের উদ্ভব" ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য; "এক মহাশক্তি সমগ্র বিশ্বসংসারের পরিচালক", ইহা একটি আধ্যাত্মিক সত্য; কিন্তু "মানবের অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়" ইহা কোনও সত্যের মধ্যে গণনীয় নহে;

যাহা সত্য (Truth) তাহা চিরকাই সত্য (Truth), যে সত্যের হ্রাস বৃদ্ধি অথবা পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহা প্রকৃত সত্য কিম্বা সম্পূর্ণ সত্য (Absolute Truth) নহে, এই জন্য "অদৃষ্ট অখণ্ডনীয়" এই কথাটি Absolute Truth বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না ; কথাটি পরে বুঝাইব ; এই মহাপ্রয়োজনীয় কথাটি বুঝাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অদৃষ্টে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, এই প্রবন্ধের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক খুব কম। এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইলে, অদৃষ্ট বলিয়া কোনও পদার্থ আছে, মানিয়া লইতে হইবে। নরেশচন্দ্র জন্মিয়াছিল, ইহা না মানিলে নরেশচন্দ্র মরিয়াছিল এই কথাটি সিদ্ধ হয় না ; সুতরাং অদৃষ্ট আছে, ইহা বিশ্বাস করিলে তবে 'অদৃষ্টের খণ্ডন' হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা যায় ; যদি আদৌ মাতঙ্গ নামক বিপুলবপু জীবের অস্তিত্ব স্বীকার না কর তাহা হইলে মাতঙ্গের দন্ত স্তম্ভমত পাদদ্বয়, ধূসর বর্ণের চর্ম্ম, কুলার মত কর্ণ প্রভৃতি লইয়া বাক্‌-বিতণ্ডা করিবার প্রয়োজন কি ? যদি অদৃষ্টেই বিশ্বাস না থাকে, অদৃষ্টের খণ্ডন হইতে পারে কি না, একথা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। অদৃষ্টের খণ্ডন মণ্ডন নাই ভাবিয়া যাঁহারা নিরুপায় এবং কাতর, বিধির বিধি অলঙ্ঘনীয় এবং অখণ্ডনীয় বলিয়া যাঁহারা পুরুষকার পরিত্যাগ করিয়াছেন ; অথবা আমরা অদৃষ্টের চিরদাস ভাবিয়া যাঁহারা সদাই ম্রিয়মাণ এবং সদাই ভয়াকুল, তাঁহাদের শান্তি সন্তোষ এবং অভয়ের জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। এই সংশয়ের অপনোদন করা, এই চিরাগত ভ্রমাত্মক সংস্কারের ছেদন করা আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতার আয়ত্ব কিনা, তাহাই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি এবং সেই ক্ষুদ্র চেষ্টা হইতে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের

উদ্ভব হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন, "দুই আর দুই একত্রে চারি হয়; কখনই তিন বা পাঁচ হইতে পারে না। যদি চারি হওয়া অকাট্য সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাকে ৩ বা ৫ করিবার চেষ্টা করা কি অনর্থক নহে?" ইহার উত্তরে এই বলা যায়, যাহা এই মায়াময় সংসারে সত্য বলিয়া গণ্য হয়; আধ্যাত্মিক জগতে তাহা অনেক সময়ে সত্য বলিয়া গণ্য হয় না; ইহসংসারে তুমি যাহাকে সাংসারিক জ্ঞানে মহাপণ্ডিত ভাবিয়া রাখিয়াছ আধ্যাত্মিক ভাবে তাহাকে ধর্ম্মজগতের লোকেরা হয়ত মহামূর্খ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তুমি সাংসারিক জ্ঞানে যাহা সমস্ত জীবনে অথবা বংশপরম্পরায় কিম্বা সমগ্র মানবমণ্ডলীর একত্রিত শক্তিতে অসিদ্ধ অথবা অসম্ভ ভাবিয়া রাখিয়াচ, আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট হয়ত তাহা নিমিষ মাত্র কাল-মধ্যে অতি আশ্চর্য্যরূপে সুসিদ্ধ হইয়া যাইতেছে ইহা কি দেখিতে পাইতেছ না? এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির পদ্মপলাশবৎ প্রশস্ত লোচন বর্ত্তমান থাকিলেও আধ্যাত্মিক জগতে সেই ব্যক্তি "অন্ধ" (দিব্যচক্ষু বিহীন) বলিয়া গণ্য হয়। আহাতেই বলিতেছি, তোমার ইহজগতের সত্যের (Truth এর) সহিত সেই অদৃশ্যমান আধ্যাত্মিক জগতের সত্যের (Truth এর) তুলনা হয় না, এই জন্য তোমার "অসিদ্ধ সত্য" ধর্ম্মজগতে "সিদ্ধ সত্য" বলিয়া গৃহীত, সেই কারণেই যে অদৃষ্ট তোমার নিকট অখণ্ডনীয়, জ্ঞানচক্ষুর নিকটে তাহা খণ্ডনীয়। মনে কর, তোমার আবাসবাটির পশ্চাৎভাগে একটি মহারণ্যে একটি শার্দ্দুল অবস্থান করে, সেই শার্দ্দুলের আক্রমণে ও দংশনে তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে, ইহাই তোমার বিশ্বাস, কারণ তোমার ভাগ্যে তাহা লিখিত আছে, ইহা স্পষ্টতঃ তুই জানিতে সক্ষম হইয়াছে; এইরূপ ধারণায় চারিটি বিষয়ের মীমাংসা হইতেছে, অর্থাৎ তোমার বাটির পশ্চাৎভাগে

অরণ্যের অস্তিত্ব, সেই অরণ্যে ব্যাঘ্রের অবস্থান এবং সেই ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক তোমার প্রাণবিয়োগ এবং প্রাণবিয়োগের কথা অদৃষ্টলিপিতে উল্লেখ—এই চারিটি বিষয়ের মীমাংসা হইতেছে, কিন্তু আসল কথার মীমাংসা এখনও অনেক দূরে অবস্থিত। ঐ ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় আছে কিনা এবং উপায় থাকিলে তোমার অদৃষ্টলিপির লিখনকে উল্টাইয়া দিতে পারা যায় কিনা, তাহার এখনও মীমাংসা হয় নাই। মনে কর, অরণ্যে ব্যাঘ্র থাকা এবং ব্যাঘ্রের আক্রমণ করা সত্বেও যদি তোমার প্রাণরক্ষার কোনও সহজ উপায় কেহ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে মনে কত শান্তি ও সন্তোষের উদয় হইতে পারে!! বাস্তবিক এইরূপ উপায় বর্ত্তমান আছে। এই উপায়ে নির্ভর করিলে প্রাক্তন খণ্ডন হইয়া যায়; এই সদুপায়ে বিশ্বাস করিলে কর্ম্মফল জনিত ভুক্তট অদৃষ্টচক্রের ঘূর্ণন উল্টাইয়া যায়, এই উপায়ে নিরাশার মনে আশা, অশান্তের মনে শান্তি এবং অসুখীর মনে সুখের সঞ্চার হয়। জীবের পরিত্রাণ জন্যই ভগবানের ভক্তবৎসলতা গুণ, তিনি ভ্রাময়ণ্ সর্ব্ব ভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানিমায়য়া অর্থাৎ তিনি মায়ার দ্বারা সর্ব্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় এই সংসাররাজ্যে পরিভ্রমণ করাইতেছেন সত্য, অদৃষ্টের যন্ত্রে ফেলিয়া জীবকুলকে নানা অবস্থায় উপনীত করাইতেছেন সত্য, কিন্তু আবার তাঁহারই করুণাবলে অদৃষ্টচক্রের গতিও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং অদৃষ্টের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকিলে সেই বিশ্বাসে অদৃষ্টের খণ্ডন হইতে পারে না এই মতের বিরোধী হইতে পারে না। সেই জন্যই সেই পতিতপাবন ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন——

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।

MAHARAJAH'S LIBRARY 20 JAN 1900

এই জন্যই খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন, "হে তাপিত মানব! আমরা তোমাদের দুঃখের ভার, পাপের ভার, চিন্তার ভার দূর করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি।" যদি দুঃখের ভার হ্রাস হইবার উপায় না থাকে, তবে অবতারের প্রয়োজন কি, তাহা হইলে শাস্ত্রচর্চ্চার আবশ্যকতা কি, তাহা হইলে জ্ঞানালোকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন "হে তাপিত মানব! মামেকং শরণং ব্রজ "অর্থাৎ এক মাত্র আমাকে (পরমেশ্বরকে) তুমি স্মরণ কর, আমার তুমি শরণ লও।" এই শরণের ফল কি? তদুত্তরে শ্রীভগবান সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন, তাহা হইলে অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপে ভো মোক্ষয়াষ্যামি মাশুচঃ। অর্থাৎ—একং মাং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, (ত্বং) মাশুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ॥ তাহা হইলে আমি (পরমেশ্বর) তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পবিত্র করিব। ভগবান আরও আজ্ঞা করিতেছেন "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" অর্থাৎ "ইহ (মোক্ষমার্গে) অতিক্রম নাশঃ (প্রারম্ভস্য নাশঃ) ন অস্তি, প্রত্যবায়ঃ চ ন বিদ্যতে, অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পং অপি মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে (রক্ষতি) অর্থাৎ "অতি অল্পমাত্র ধর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানেও মহৎ ভয় (মহান্ দুঃখ) হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।" তাহাই যদি না হইবে, তবে এত কষ্ট করিয়া তপঃ যপের প্রয়োজন কি? দেহকে শুষ্ক করিয়া সংসারের সমুদয় সুখ, সমগ্র বিলাসরাশি, স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া লোকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে কেন? তাহাই যদি না হয়, তাহা হইলে উপবাসের উপর উপবাস করিয়া, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর নিকর সহ্য করিতে করিতে অর্দ্ধ দগ্ধ দেহে, নগ্নপদে, নগ্নশিরে, তৃষিতকণ্ঠে, 'হে দয়াময়!' 'হে দয়াময়' স্বরে চীৎকার করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ

কাতর মানব তীর্থস্থানাদি দর্শন করিতে অগ্রসর হইবে কেন? তাহাই যদি না হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, লক্ষ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া লোকে মহাপুরুষদিগের সেবা, অনাথাশ্রম নির্ম্মাণ, পরোপকার, বিদ্যালয় স্থাপন, দেবপূজা, দীনদুঃখীর, ভরণপোষণ, ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কেন করিতে চায় ও কেন করিতে যায় যদি দুই আর দুই ৪ হইবে, ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের অকাট্য সত্য হয়, যদি আমার কর্ম্মফল জনিত অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই অনিবার্য্য একথা ধ্রুব সত্য হয়, তাহা হইলে আর ঈশ্বরারাধনার প্রয়োজন কি? আমার কর্ম্মফলে যাহা আছে তাহাই যদি ঘটিবে, এবং সেই কর্ম্মফলের উপরে যদি ঈশ্বরের কোনও আধিপত্য না থাকে, তাহা হইলে সেই সর্ব্বশক্তিমানত্বহীন ক্ষুদ্র ঈশ্বরে আমার প্রয়োজন কোথায়? তাহা হইলে যিশুখৃষ্টের "পরিত্রাতা" Saviour কিম্বা মহম্মদের "রসুল" Prophet অথবা মহারাজ রামচন্দ্রের "ত্রেতাবতার" Incarnation বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার কোথায় রহিল? তবে মিছামিছি সাধুর পদ-তলে প'ড়িয়া, অবতারের আশ্রয় লইয়া ঋষিবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া, কঠোর তপস্যা দ্বারা সুখের কলেবর খানিকে শীর্ণ বিশীর্ণ করিয়া ফল কি? যদি "ভাগ্য ভিন্ন পথ না থাকে, যদি ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, তাহার ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নাই" এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মন্দিরে গিয়া ঈশ্বরের প্রার্থনার আবশ্যকতা কিছুই দেখিতেছি না। মনুষ্য পুণ্য সঞ্চয়ে প্রয়াসী হয় কেন, তাহা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ? মনুষ্য, ভগবানের প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হয় কেন, তাহা কি কখন ভাবিয়া দেখিয়াছ? মনুষ্য যতই সৎসংসর্গ লাভ করুক, এই মায়াময়—এই লোভ প্রলোভনময়—সংসারে মনুষ্য যতই নৈতিক শিক্ষা ও নৈতিকবলে বলীয়ান হউক, পাপ হইতে সে সম্পূর্ণরূপে

কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারে না, রক্তমাংসের দেহে এরূপ স্বতন্ত্রতা লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং সম্পূর্ণ অসম্ভব হইতেও অসম্ভবতর; সেই জন্য সাধু পল কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "There is none—no, not one—righteous in the whole world." এই জন্য মহম্মদ বলিতেন, "মীন সর্ রিল্ রসোয়াশীল থন্নাস" (কোরাণ)। এই জন্যই কার্লাইল বলিতেন, Man taketh birth in sin; he liveth in sin and he dieth in sin." এবং এই জন্যই হিন্দুর পুরাণে দেখা যায়, "পাপোহং পাপকর্ম্মাহং" ইত্যাদি। পাপ হইতে, দুঃখ হইতে, দুশ্চিন্তার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতে পারে না বলিয়া, মনুষ্য সৎকর্ম্ম দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করতঃ "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ" অর্থাৎ মহৎ দুঃখ, মহৎ পাপ, মহৎভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করে এবং এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে যে, "হে দয়াময়! জন্মজন্মান্তরে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে সকল মহাপাপের সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে এক অত্যুচ্চ পাপ-হিমালয় প্রস্তুত হইয়াছে, আপনার এক বিন্দু কৃপায় সেই হিমালয় প্রস্তর গলিয়া যাইতে পারে। হে ভগবান! তুমি প্রসন্ন হও, আমাকে সুমতি দাও, আমাকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত কর, এই অগতির তুমি গতিস্বরূপ হও।" সরল ও অনুতপ্ত হৃদয়ে মানব যখন এই বলিয়া কাঁদে, ভক্তাধীন ভগবান তখন তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহার ভক্তি, অনুতাপ, অনুরাগ ও সৎকর্ম্মাদি বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে নিষ্পাপ করেন। এক সময়ে এক গহন বনে এক মহর্ষি, মধ্যাহ্ন কালে আকাশস্থিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মধ্যে প্রজ্জলিত বৈশ্বানর রূপে সেই হিরণ্ময় মহাপুরুষের (ভগবানের) অপৌরুষেয় জ্যোতি অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে ভগবান! হে হিরণ্যগর্ভ! তোমার কৃপাবলে আমি নিষ্পাপ হইলাম।" (উপনিষদ।) আর এক-

জন ঋষি মহাভারতে বলিয়াছিলেন, "হে করুণানিধি! হে মহানুভব! আমি যে তোমার মহিমায় ও তোমার করুণায় নিষ্কলঙ্ক হইয়া পূতঃ হইয়াছি, তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেছি। সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন তটস্থ পদার্থের মলিনতা ধৌত হইয়া যায়, জ্ঞানের অগ্নিতে যেমন কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়, তোমার কৃপাবলে সেইরূপে দুরদৃষ্ট হইতে মনুষ্য মোচন হইয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকে। আমি নিজের ক্ষীণ দেহের অমিত শক্তি এই বৃদ্ধাবস্থায় শীর্ণ শরীরে যৌবনের উৎসাহ ও লাবণ্য, মনের অত্যন্ত আনন্দ এবং হৃদয়ের নির্ম্মলতা—এই সকল দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ করিতেছি যে, আমার প্রতি ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, আমার দুরদৃষ্ট ঘুচিয়া গিয়াছে এবং আমি, হে ভগবন্! তোমারই—কেবল তোমারই—করুণাবলে নিষ্পাপ হইতে সমর্থ হইয়াছি। হে করুণার বারিধি! আমি জানিতেছি, দান, ধ্যান, নিদিধ্যাসন, শ্রবণ, চিন্তন, পরোপকার, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সদাচার, পূজা, প্রার্থনা, গুরুকৃপা, প্রভৃতি দ্বারা প্রাক্তন খণ্ডন হইয়া যাইতে পারে। দুষ্টাচারে রোগ হয়, কিন্তু রোগেরও প্রতীকার আছে, ইহা আজি তোমার করুণাবলে জানিতে পারিলাম। রোগ হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আর তাহার উপায়, ঔষধি, প্রতীকার অথবা শুশ্রূষা নাই, ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? তোমার নাম দয়াময়, তুমি নিজে দয়াস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ; আমরা অধম তুচ্ছ মায়াময় সাংসারিক জীব, পাপে প্রণত হওয়া আমাদের ধর্ম্ম, কিন্তু আমাদের পাপরাশি যতই উচ্চ হউক, তোমার করুণারাশি তাহা অপেক্ষা চিরকালই উচ্চতর, অতএব কর্ম্ম-ফল খণ্ডন হয় না কে বলিবে? এই দেখুন, হে নারায়ণ! তোমারই করুণাবলে আমি নিষ্পাপ হইয়া আজি দেবতাদিগের সহিত বিষ্ণুলোক, ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি পবিত্র ধামে গমন করিতেছি। এই বলিয়া

সেই ঋষি, আকাশমধ্যস্থিত জলন্ত সূর্য্যের জ্যোতিঃ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৈশ্বানর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং সেই পবিত্রধামে চির-পবিত্রতার পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন।" (মহাভারত। ৺ কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ) কি সুন্দর কথা!! কি মধুমাখা দৈব বাণী! মহাভারতের এই অংশ পড়িতে পড়িতে শুষ্ক প্রাণে শীতলতা এবং মধুময়ী শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের প্রবল অদৃষ্ট হইতেও মুক্ত হওয়া যায়. ইহা জানিতে বা বুঝিতে পারিয়া মানবের মনে যে প্রকার শান্তি ও সন্তোষের উদয় হইতে পারে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। আমার ন্যায় মহাপাপীর পরিত্রাণের সদুপায় আছে, ইহা জানিতে পারিলে মরণে আর ভয় থাকে না; আমার প্রবল অদৃষ্ট আমাকে আর দাসানুদাস করিয়া রাখিতে পারে না, ইহা যদি জানিতে পারি, তাহা হইলে জীবন কতই সুখময় বলিয়া বোধ হয়! এই দুঃখময় মায়াময় জীবনের ভার অনেকটা লঘুতর বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক ধর্ম্মের নাম পরিত্রাণ, যদি এমন কোনও ধর্ম্ম থাকে, যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমি ভয়, বিপদ, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, পাপ, শোক, দুরদৃষ্ট প্রভৃতি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতে না পারি, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নামের উপযুক্ত নহে। এই জন্য লাটিন ভাষায় Religion শব্দের Re এবং Ligio অথবা Ligo অর্থ করা হইয়াছে; পাপের দ্বারায় মনুষ্য ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হয়; ধর্ম্ম মনুষ্যকে পুনরায় ঈশ্বরের নিকটে আনিয়া ভক্তকে এবং ভক্তাধীন ভগবানকে এক সূত্রে বন্ধন করিয়া দেয়; এই জন্য সংস্কৃত ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, ধৃ ধাতু অর্থে ধারণ বুঝায়; অর্থাৎ আমি যতই অদৃষ্ট-চক্রে ঘুরিয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হই না কেন, ধর্ম্মবলে আমি আবার পতিতপাবন ভগবানের পদধারণ করিতে পারি, ধর্ম্মের ইহাই উদ্দেশ্য;

এই উদ্দেশ্য না থাকিলে, ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে; এরূপ ধর্ম্মকে বিজ্ঞান বল, কৌশল বল, পাণ্ডিত্য বল, চতুরতা বল, তেজ বল, শক্তি বল, আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু এরূপ ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিবার তোমার অধিকার নাই। যদি ধর্ম্মের—সৎকর্ম্মের—এই ক্ষমতা না থাকিত, তবে ধর্ম্ম নামে একটা প্রকাণ্ড দিগ্‌গজ শব্দের ভারবহন করিয়া মরি কেন? তাহা হইলে 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলিয়া বৃথা সময় নষ্ট করি কেন? যদি দুরদৃষ্ট—মন্দ অদৃষ্ট—খণ্ডিত হইবার কোনও উপায় না থাকে, তবে এত পরোপকার, এত দান, এত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, এত কঠোর তপস্যা, এত জীবন্ত স্বার্থত্যাগ, এত তীর্থদর্শন, এত অশ্রুপতন, এত শাস্ত্রপাঠ ও সঙ্কীর্ত্তন এবং তৎসঙ্গে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কোথায় রহিল? কেবল যে সদাচার ও সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানেই অদৃষ্টখণ্ডন হয়, তাহা নহে; জগাই মাধাই এই দুই ভাই কোন্ তপস্যায় ব্রতী হইয়াছিল? যবন হরিদাস কোন্ পবিত্রতায় উদ্ভাসিত ছিল? সল্ নামে খৃষ্ট-বৈরী য়িহুদী কোন্ ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল? কিন্তু দেখ, চৈতন্যের দেবশরীর স্পর্শমাত্রে, গৌরাঙ্গদেবের মধুরবাণী শ্রবণমাত্র এবং খৃষ্টের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রেই জগাই, মাধাই, হরিদাস এবং সলের (পলের আদি নাম) কেমন জীবন্মুক্তি ঘটিয়া উঠিল? চিরপাপে কলঙ্কিতা, পাষাণদেহী পাষাণ-হৃদয়া অহল্যা পাষাণরূপে পড়িয়াছিল, পূতঃদেহ ভগবান রামচন্দ্রের পবিত্র পদস্পর্শে সেই পাপচারিণীর মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিত্রাণ হইল! বিনা প্রার্থনা, বিনা উপাসনা, বিনা সৎকর্ম্মে মুক্তি!! এই জন্যই অদৃষ্ট মানিতে হয়, এই জন্যই স্বীকার করিতে হয় ঈশ্বরের করুণায় সকলই সম্ভবে, এই করুণায় ইংরাজী নাম Mercy নহে, ইহাই সেই সুন্দর নামে অর্থাৎ Grace নামে অভিহিত। সুতরাং

Grace দ্বারাও অদৃষ্ট খণ্ডন হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই গ্রেসের নাম গুরুকৃপা, সাধুকৃপা, ব্রহ্মকৃপা, মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি। কেন ঈশ্বর এইরূপ করুণা প্রদর্শন করেন, তুমি আমি তাহা জানিবার যোগ্য নই। তুমি কে হে বাপু! আমি কে হে বাপু! তুমি আমি আদার বেপারী হইয়া জাহাজের খবর লই কেন? এই জন্যই সাধু পাল বলিতেছেন—"কর্দ্দমের উপরে কুম্ভকারের কি সম্পূর্ণ অধিকার নাই? কুম্ভকার কোনও পাত্রকে বড় কোনও পাত্রকে ছোট করে, ইহা তাহার ইচ্ছার অধীন।" এই জন্যই ইশ্রালীয়দিগকে ভগবান বলিয়াছেন—"I will have mercy upon them whom I will have merey." (Old Testament)। অর্থাৎ আমার যেমন ইচ্ছা, আমি সেইরূপ করুণা করিব," তুমি কে হে বাপু! তুমি ঈশ্বরের সৃজিত হইয়া স্রষ্টার গুণ দোষ দেখিতে যাও! কি ধৃষ্টতা!! তাহাতেই বলিতেছি, সৎকর্ম্মে অদৃষ্টের খণ্ডন হয়, আবার ভগবানের কৃপায় এবং তাঁহার চিহ্নিত নরনারীদিগের করুণায় দুরদৃষ্টের খণ্ডন হয়, ইহা একটা খুব বড় আধ্যাত্মিক সত্য, আমি বাল্যকাল হইতে এই বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত, পৃথিবীর বহুদেশ, বহুস্থান, পরিব্রজন করিয়া এবং বহু মানবজাতির চরিত্র ও অবস্থা শিক্ষা করিয়া যাহা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহা এই আধ্যাত্মিক সত্যের জলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ। আমি আমার এই বহু বিচিত্রতাময় অতি অদ্ভুত জীবনে অদৃষ্টকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, অদৃষ্টে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস, কিন্তু অদৃষ্টের খণ্ডন নাই, এ কথায় বিশ্বাস করি না।

কথাটি আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। প্রবন্ধের শেষে একটি সুখপাঠ্য অথচ উপদেশগর্ভ গল্প দিতেছি। অশেষ রত্নের আকর স্বরূপ হিন্দুশাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া

এই সুন্দর গল্পটি উদ্ধার করা গিয়াছে। এই গল্পটি না পড়িলে প্রবন্ধের অনেক কথা বুঝা সহজ হইবে না। গল্পটি এই; কোনও সময়ে এক রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, জ্যোতিষ প্রাজ্ঞপুরুষ প্রভৃতিকে রাজসভায় সাদরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহানুভবগণ! আমার পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত পাপ অথবা পুণ্য কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন সুফল বা কুফলজনিত অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া আমার মৃত্যুকাল নির্ণয় করতঃ আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করুন।" রাজার প্রার্থনানুসারে, জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বহুল প্রাজ্ঞ পুরুষের সহায়তায় নানা শাস্ত্র সমালোচনা পূর্ব্বক, সামুদ্রিক, রেখাগণিত ফলিত জ্যোতিষ করকোষ্ঠি জন্মপত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া রাজার অদৃষ্টচক্র অনুসরণ পূর্ব্বক এই বলিয়া নিবেদন করিলেন, "হে রাজন, আমারা সকলে একমতে ইহাই স্থির করিয়াছি যে, যে দিন আপনার ঠিক ৬০বৎসর বয়ক্রম পূর্ণ হইবে,ঠিক সেই সায়াহ্নে সূর্য্যাস্তের সময়ে আপনার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যাইবে। ধর্ম্মপরায়ণ, পরোপকারী এবং ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষদিগের এইরূপেই মৃত্যু হইয়া থাকে,এবং ইহাই উৎকৃষ্ট মৃত্যুর লক্ষণ। এই প্রকার মৃত্যুর পরে মনুষ্য অব্যয় ব্রহ্মপদের অধিকারী হইয়া থাকেন।" যে দিন রাজা এই কথা শ্রবণ করিলেন, সে দিনে তাঁহার বয়ক্রম ৫৯ বৎসর ১১ মাস এবং ২ দিন ছিল। পুত্রকে সাদরে সম্ভাষণ করতঃ রাজা বলিলেন, "হে পুত্র! "আমার জীবনের আর ২৭ দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, সমস্ত জীবন মায়াময় সংসারসাগরের প্রবল কোলাহল তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়াছি এবং খেলিয়াছি অথচ এই অপার ভবসাগর পার হইবার কোনও উপায় স্থির করি নাই, অতএব এই অসার জীবনের অবশিষ্টাংশ কাল আর গৃহে থাকিতে ইচ্ছা করি না। পতিতপাবনী সুরধুনী জগন্মাতা ভাগী-

রথীর পবিত্রতটে অবস্থান পূর্ব্বক সেই পূতঃসলিলা জাহ্নবীর নির্ম্মল জল রাশি দর্শন করিতে করিতে এবং হরিগুণ গান করিতে করিতে জীবন অবসান করিবার অভিলাষী হইয়াছি। আমাকে তোমরা গঙ্গার তটে লইয়া যাও, আমি সেই মহাপবিত্র স্থলে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হই। ধ্যাননিরত নিষ্কলঙ্ক ঋষিবৃন্দের পবিত্র কর-কমল স্পর্শে যাহার জল নির্ম্মল, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানকালের বিবরণে অভিজ্ঞ যোগী দিগের পদস্পর্শে যাহার সলিল শুদ্ধ, যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানে——ভগীরথের আরাধনায়——ঐরাবতের কটাক্ষে এবং মহর্ষি নারদের বীণাগণে যাহার জল পবিত্র হইতে পবিত্রতর, যাহার তটে বসিয়া পুরাকাল হইতে তপঃপ্রভাবশালী দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ আধ্যাত্মিক তেজে হিরণ্ময় মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছেন এবং যাহার পূতঃ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক পাষাণহৃদয় মহাপাপীগণও নির্ম্মলচেতা হইয়া ব্রহ্মদর্শনলাভে সক্ষম হইয়াছে, আমি সেই পতিতপাবনী সুরধুনী গঙ্গাতটে গিয়া জীবনত্যাগ করিব। পুত্র! তুমি সুখে রাজত্ব কর, হে মন্ত্রীন্! তুমি নব রাজার সহায় হও।" এই বলিয়া রাজা বাহাদুর গঙ্গাতটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন গত হইতে লাগিল; সহচরেরা হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণেরা বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক হোম করিতে লাগিলেন, সাধুরা ভাগবতাদির পাঠারম্ভ করিলেন এবং সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে গো, সুবর্ণ, রজত, শস্য, বস্ত্র ইত্যাদি যথারীতি দান করা হইল। ক্রমে "শেষের সেই দিন" আসিয়া উপস্থিত; "ভব-ছাড়িবার দিন" আসিয়া উপস্থিত; শনিবার, নবমী তিথি, মিথুন লগ্ন, অনুরাধা নক্ষত্র এবং মাহেন্দ্রযোগে সূর্য্যাস্তের সময় উপস্থিত। বেলা সার্দ্ধ পঞ্চ ঘটিকা, আর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই সূর্য্যাস্ত, এবং ঠিক সূর্য্যাস্ত কালেই রাজার মৃত্যু!! রাজার অর্দ্ধ শরীর জাহ্নবীর পূত সলিলে নিমগ্ন,

কণ্ঠে হরিগুণগান এবং সর্ব্বশরীর হরিনামাবলীতে অঙ্কিত। মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কিন্তু ঠিক এই সময়ে নিকটস্থ এক মহারণ্য হইতে এক তপঃপ্রভাবশালী মহাপুরুষ শুভাগমন করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন জন্য ধীরে ধীরে জাহ্নবীর এক নিকটবর্ত্তী অথচ অন্যতম ঘাটে মৃগচর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। বৈদিক সংস্কারে আচমন পূর্ব্বক, গায়ত্রী জপ সমাপন করিয়া সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী মহাপুরুষ ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য বীরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ঠিক এই সময়ে রাজা মহাশয়ের হাঁচি হইল (Sneezed); শাস্ত্রের আদেশ এই যে, ব্রাহ্মণ পুরুষ বা ব্রাহ্মণী স্ত্রীলোকের নিকটে কোনও বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তি হাঁচিলে, তৎক্ষণাৎ বলা উচিত "শতজীবি হও।" রাজার হাঁচি শুনিয়া মহাপুরুষ চক্ষু খুলিয়া কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন "পুত্র! শতবর্ষজীবি হও।" মৃত্যুর করায়ত্ত এবং কাতরহৃদয় রাজা করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "হে মহানুভব! হে পূতঃদেহ-মহাপুরুষ। বিধির বিধানে আমার আর অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মাত্র জীবনের অবস্থিতি কাল; কেমন করিয়া আমি শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারি?" মহাপুরুষ বলিলেন, "হে ধর্ম্মপালক! হে গো-ব্রাহ্মণ হিতকারী! তোমার অদৃষ্টে কি আছে না আছে আমি তাহার অনুসন্ধান করিতে চাহি না; গুরুকৃপায় আমি বাক্য-সিদ্ধ; বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিষ্পাপ দেহে এবং নিষ্পাপ চিত্তে আমি অব্যয় ব্রহ্মপদ ধ্যান করিয়াছি, সেই জন্য আমার পরমারাধ্য গুরুদেব আমাকে বাক্যসিদ্ধি দান করিয়াছেন; আমার মুখ হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা বিফল হয় না এবং হইতে পারে না, যেহেতু আমি বাক্যসিদ্ধ; অতএব হে শান্তিস্থাপক! তোমাকে আরও শতবর্ষ

বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; কারণ, তপঃপ্রভাবশালী, ব্রহ্মদর্শী, নিষ্পাপ-দেহ, নিষ্পাপচেতা সাধুদিগের আশীর্ব্বচন কখনই বিফল হয় না।” মৃত্যু হইল না দেখিয়া, রাজা স্বকীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। স্বল্পকাল মধ্যে প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন “হে মহানুভবগণ! বোধ হইতেছে আপনাদের শাস্ত্র মিথ্যা অথবা আপনারা সকলে অসত্যপ্রিয়।” প্রাজ্ঞ পুরুষেরা কহিলেন, “সমুন্নতহৃদয়! আপনার অদৃষ্টানুসারে আপনার নিশ্চয়ই ৬০ বৎসর বয়ক্রমে মৃত্যু ছিল, কিন্তু সেই মহাতপঃপ্রভাবশালী তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষের আশীর্ব্বচন প্রভাবে আপনার অকালমৃত্যু মোচন হইয়া গিয়াছে।” রাজা বলিলেন, “হে বিদ্যাভিমানী পুরুষ প্রধানগণ!! বিধির বিধান খণ্ডন করা কাহার সাধ্য? ভগবানের বিধি কি মনুষ্যে খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়? আপনারা বিকৃত মস্তিষ্কের ন্যায় বাক্যোচ্চারণ করিতেছেন কেন?” পণ্ডিতেরা বলিলেন “হে দেবপ্রতিনিধি! হে বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষব্যাঘ্র! হে অহর্নঘ! আপনি গুণসাগর এবং বিদ্যার ভাণ্ডার হইয়া গুণহীন ও অবিদ্বানের মত অভিমতি প্রকাশ করিতেছেন কেন? নদী সকল পর্ব্বতদেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করে; সমুদ্রাভিমুখে গমন করাই তাহাদিগের রীতি বা অদৃষ্ট; কিন্তু মনে করুন, বেগবতী নদীর মধ্যস্থলে যদি হিমালয়ের মত সুদৃঢ় অথচ অত্যুচ্চ পর্ব্বতকে বসাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নদীর অবস্থা কি হইতে পারে? পর্ব্বতাপেক্ষা নদী যদি অধিকতর বলবতী হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত ভেদ করিয়া নদী চলিয়া যাইবে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রত্যাবৃত্ত হইবে। আপনার মৃত্যুতটিনী অদৃষ্টবারিধির দিকে সাধারণ নিয়মানুসারে প্রধাবিত হইতেছিল, কিন্তু সেই মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ রূপ হিমালয় স্থাপিত হওয়ায় মৃত্যুর গতি রোধ হইয়াছে। মহারাজ! সৎকর্ম্ম

সদাচার, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ঈশ্বরোপাসনা, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন, গুরুকৃপা, সাধুকৃপা, সৎসঙ্গ, ঈশ্বরকরুণা প্রভৃতি দ্বারায় অদৃষ্টের খণ্ডন হয়। তাহা যদি না হইবে, তবে ধর্ম্ম কেন? সৎকর্ম্ম ও সদাচার কেন? তবে ঈশ্বরোপসনা কেন? নিশ্চয়ই সদুপায়ে দুরদৃষ্টের মোচন হইয়া থাকে।" ইত্যাদি। পাঠক মহাশয়! অদৃষ্টের নাম অ—দৃষ্ট, যাহা অদৃশ্যমান (দৃষ্ট) নহে, তাহাই অদৃষ্ট; আমরা দৃশ্যমান (দৃষ্ট) পদার্থ সম্বন্ধেই অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতে পারি না, তবে অ—দৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে কেমন করিয়া বিচার করিব? এই জন্য শাস্ত্র মানিতে হয়, গুরুপদেশ মানিতে হয় এবং প্রত্যাদেশ মানিতে হয়। অতএব "বিধির বিধি অলঙ্ঘনীয় সুতরাং আর উদ্যমে প্রয়োজন কি? আর চেষ্টা ও পরিশ্রমে প্রয়োজন কি?" ইত্যাদি বৃথা সংস্কারে আবদ্ধ না হইয়া, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত; সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কাহারও দুর্গতি হয় না; অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কলুষকলস পূর্ণ হইয়া গেলেও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে মহা সুদৃঢ় প্রস্তর প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা ঐ কলস চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া থাকে। রোগীর প্রতিকার ঔষধে, দুরদৃষ্টের প্রতীকার পুণ্যজনক সৎকর্ম্মে। দেশের হিতই হউক, সমাজের হিতই হউক, আইস, আমরা নিষ্কাম হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি। ভক্তাধিক ভক্ত রামপ্রসাদ গাইয়াছেন——

মা!

তবে তোমার ভরসা কে করে?
যদি আপনারই কর্ম্মফল ফলিবে আমারে;
তবে কালী; তোমার ভরসা কে করে?

ভয় নাই, অদৃষ্টের খণ্ডন আছে। আর একজন মহাপুরুষ পারস্যের এক অরণ্যে দাঁড়াইয়া কি বলিতেছেন শুনুন।——

সোপর্দ্দম্ বো তু মায়ে খেস্‌রা।
তু দানী হেশাবে কমো বেশ্‌রা॥
শুণ্ আ-হে মনর্ নামদে দর্ শোমার্।
তুরা নাম ক্যায়্ বুদে আমুর্ জেগার॥

শ্রীমৎ মনু মহারাজা কহিয়াছেন——

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভির সমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মম্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্॥
(চতুর্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ "পূর্ব্ব সম্পত্তি নাই বলিয়া অথবা অর্জ্জন চেষ্টা ফলবতী হইতেছে না দেখিয়া আপনাকে কখন হতাদর করিবে না, পরন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা করিবে, শ্রীলাভ কখন দুর্লভ মনে করিবে না।" মনু মহারাজা আরও লিখিয়াছেন——

সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈব মানুষে।
তয়ো দৈবম্ চিন্ত্যান্ত মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া॥
(৭ম অধ্যায়)

অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় কর্ম্মই দৈব ও মনুষ্যাধীন। কিন্তু দৈব অদৃষ্ট বলিয়া চিন্তার অগোচর, পৌরুষ্যাচার দৃষ্ট, সুতরাং ক্রিয়াসাধ্য। অতএব——

এতা দৃষ্টস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব তেজসা।
ধর্ম্মতো অধর্ম্ম তশ্চৈব ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদামনঃ॥
(মনুসংহিতা, ১৩ অধ্যায়)

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হেতু জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

রাণী ভবানীর পত্র।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে অনেকের নিকটে অনেক প্রকারের অভিমতি শুনা গিয়াছে। কেহ তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক বা নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে অত্যাচারী শার্দ্দূল অথবা "নির্লজ্জ গৃধ্র" রূপে অঙ্কিত করিয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন। সিরাজ যেরূপ চরিত্রেরই লোক হউন, তিনি যে অযোগ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা বা স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার দিকে তাঁহার যে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, ইহা এক প্রকার ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত। সুন্দরী যুবতীর সতীত্ব-নাশ করিতে সিরাজের যে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা উপস্থিত হইত না, ইহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। অতি তরুণ বয়সে অর্থাৎ উনবিংশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রমকালে, অজাতশ্মশ্রু সিরাজ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিকৃতমস্তিষ্ক সখা ও বিকৃত চরিত্র সহচর এবং মন্ত্রীদিগের কুপরামর্শে একাদশ মাসকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া অবশেষে এক আত্মীয়ের হস্তে নিহত হয়েন। তাঁহার এই স্বল্পকালব্যাপী শাসনসময়ে ব্রাহ্মণী হইতে চণ্ডালী পর্য্যন্ত এবং সৈয়দ রমণী হইতে অতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানী পর্য্যন্ত যে কোনও সুন্দরী রম-

ণীর তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার উপরে হস্তক্ষেপ অথবা একেবারেই সতীত্বনাশ করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। এই একাদশমাসকালব্যাপী শাসনে যে সমস্ত অত্যাচার এবং যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, অনেকের একাদশবর্ষকাল-ব্যাপী শাসনেও প্রায় তাহা ঘটে না। সিরাজের জন্মস্থানে এবং তাঁহার রাজধানীতে আমরা অনেক দিন বাস করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; সিরাজ যে বিকৃত চরিত্রের লোক ছিলেন এবং তাঁহার নৈতিক বল বা নৈতিক সাহস যে কিছুমাত্র ছিল না, তদ্বিষয়ে অনেক অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। সে প্রমাণের উপরে তর্ক বা যুক্তি চলে না। পলাসী যুদ্ধের ক্ষুদ্র ইতিহাসের প্রণেতা বহুদর্শী মার্টিন সাহেব সিরাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন—"Seraj was a voluptuous tyrant; he wielded the sceptre to minister to his own pleasures." অর্থাৎ সিরাজ গৃধ্র প্রকৃতির অত্যাচারী ছিলেন; তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি রাজদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কথাটি সত্য। যাঁহারা সিরাজুদ্দৌলাকে নিরপরাধ বা নিষ্কলঙ্ক অথবা সতী স্ত্রীর মর্য্যাদারক্ষাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা অকাট্য সত্যের অবমাননা করেন, এং স্ত্রীজাতির পরম শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। আমরা হিন্দু; রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নামে অযথা অথবা মিথ্যা কলঙ্কারোপ করা হিন্দুশাস্ত্রমতে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "নরাণাঞ্চ নরাধিপং" অর্থাৎ "আমি মনুষ্যদিগের মধ্যে নরাধিপতি।" এক সময়ে সিরাজ আমাদের রাজা ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজার চরিত্র, মহিমা

ও গৌরবে প্রজার গৌরব হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিরাজের চরিত্রের সমর্থন করিতে আমরা অসমর্থ। কারণ অসত্যের সমর্থন এবং সত্যের অপবায় মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত।

যাহাই হউক, সিরাজের বৈচিত্র্যময়ী ভবলীলার সহিত একজন আদর্শ সতী এবং আদর্শ ব্রাহ্মণরমণীর জীবনের কতকগুলি ঘটনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। সিরাজ যে বৎসর এবং যে মাসে জন্মগ্রহণ করেন, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণের মাতা সুপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর সেই বৎসরে এবং সেই মাসে জন্ম হয়। জুন মাসে সিরাজের জন্ম এবং জুন মাসে সিরাজের পলাসী ক্ষেত্রে পরাজয়; জুন মাসে রাণী ভবানীর জন্ম এবং ঐ মাসেই তাঁহার বৈধব্যদশার সূত্রপাত। এইরূপ বহু সাদৃশ্য থাকিলেও সিরাজের এবং রাণী ভবানীর জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রধাবিত ছিল; একের জীবনের উপাদান অন্যের জীবনের উপাদান হইতে স্বতন্ত্র ছিল। সিরাজের জন্ম শিখিবার জন্য; রাণী ভবানীর জন্ম শিখাইবার জন্য; সিরাজের জন্ম চালিত হইবার জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম পরিচালিকা হইবার জন্য; সিরাজের জন্ম সংশোধিত হইবার জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম সংশোধিকা হইবার জন্য; দুর্ব্বৃত্ত সিরাজের জন্মগ্রহণ পরের অমঙ্গলের জন্য, মহারাণী সতী ভবানীর জন্মগ্রহণ পরের উপকারার্থ স্বার্থত্যাগ করিবার জন্য। এইজন্যই জনৈক ইতিহাসকার লিখিয়াছিলেন :—

Seraj was born to be taught and Rani Bhowani was born to teach. * * Seraj was born to minister to his own pleasures, the noble Rani was born to sacrifice all her best interests at the sacred alter of her country's regeneration."

সিরাজ ও রাণী ভবানী একই সময়ের ও একই বয়সের লোক। কোনও সময়ে সিরাজুদ্দৌলাকে রাণী ভবানী একখানি পত্র পাঠাইয়া-

ছিলেন, নিম্নে তাহার অবিকল অনুলিপি দেওয়া গেল। ঐ পত্র পাঠে সিরাজের চরিত্র, রাণী ভবানীর সতীত্ব ও মহত্ত্ব এবং বাঙ্গালা ঐতিহাসিক-দিগের ভুল স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। পত্রখানি এখনও বাঙ্গলা বা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই; যে ঘটনা উপলক্ষে এই পত্র লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণও এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল।

কোনও সময়ে কৈবর্ত্তজাতীয়া এক পরমাসুন্দরী যুবতী, নৌকা-যোগে নবদ্বীপ হইতে পাটনা অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। এই সতী স্ত্রীলোকের স্বামী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকটে লালবাগ নামক স্থানে গঙ্গাবক্ষে রাজকীয় তরণী মধ্যে নবাব সিরাজু-দ্দৌলা ঐ সময়ে সহচরবর্গকে লইয়া সুরাপান এবং আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইলে, সুন্দ-রীর দিকে নবাবের দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া সুন্দরী যুবতীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু এরূপ অধর্ম্মজনক প্রস্তাবে সতী বা তাঁহার স্বামী এতদুভয়ের মধ্যে কাহারও সম্মতি না দেখিয়া শেষে বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশের উপক্রম হইতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় ঐ নৌকার আরোহিগণ সায়ংকালে নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক অতিশয় সংগোপনে আজিমগঞ্জ নামক স্থানে পলাইয়া যান। তথা হইতে স্বল্পকাল মধ্যে ঐ কৈবর্ত্ত স্ত্রীলোক নাটোরে গমন করেন। যে গ্রামে রাণী ভবানীর জন্ম হইয়াছিল, ঐ কৈবর্ত্ত যুবতীর সেই গ্রামে জন্ম হয়। কৈবর্ত্ত স্ত্রীলোকের মুখে ঘটনাটি আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া রাণী ভবানী নবাব সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে অবিকল অনুলিপ্ত হইল।

পত্রখানি এই। ইহার ভাষা সে কালের বাঙ্গলা, এবং ইহাতে অনেক পারস্য শব্দ মিশ্রিত আছে।

"শাহ্-এ-জাঁহা আমীর-উল্-উমরা নবাব সিরাজুদ্দৌলা খাঁ সাহেব বাহাদুর বা নিজ্‌দ্-এ-খাস্।

কাতিব্ ব দেহেনদা ফিদ্‌বী (রাণী) ভবানী, কোমিয়ৎ ব্রাহ্মণী, সকুনৎ নাটোর।

বঙ্গাধিপতি শাহ্-এ-জাহাঁ নবাব সিরাজুদ্দৌলা খাঁ সাহেব বাহাদুরকে মালুম হয় যে, স্ত্রীলোকগণের সতীত্ব হইতেছে একটি মাটীর হাঁড়ির তুল্য যাহাকে একবার ফাটাইয়া দিবায় আর মেরামত বা দোবারা গঠন হওনে কঠিন জানিবা। খণ্ড খণ্ড অংশ সমুদয় মেরামত হয় না, তাহা চূর্ণ হইবায় ধূলি মধ্যে পয়নালী ভিতর নিক্ষেপ করা যায়। স্ত্রীলোকের সতীত্ব আক্রমণে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ হইল আর যে আক্রমণ করিল তাহারও ধর্ম্ম যাইল আর অপযশ হইল আর রাজ্য-নাশের উপায় আরম্ভ হইল জানিবা। আপনার মন্দ স্বভাব আর কামুক চরিত্র জন্য আপনি কুবেরের ভাণ্ডারের মত সুবর্ণ সমূহ খরচ জন্য স্বীকার আছেন, পরন্তু আপনার কামুক চরিত্র আর দুষ্ট প্রবৃত্তি-মার্গ দলনের কারণে আমাদের অর্থ নাই। আমার মাথার কেশ থাকিতে প্রতিহিংসা লওনে কসুর করা যাইবেক না। আর এই প্রতিহিংসা হইতে বৈশ্বানর দেবের আবির্ভাব হইবা জানিবা, আর ঐ অগ্নি জ্বলিয়া উঠনে মুর্শিদাবাদের গঙ্গামাতার জল তাহার জ্যোতি নির্ব্বাণ করণে সক্ষম হইবা না। ঐ অগ্নি আপনাকে আর আপনার জীবন আর আপনার রাজ্য দাহ করিবা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা এই পত্রের একটু নমুনা দিলাম। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পত্রের পার্শি তর্জমা হইয়াছিল। আমরা তাহা দেখি নাই। একজন বঙ্গবাসী ঐ সমগ্র বাঙ্গলা পত্র-খানির ইংরাজি অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন।

অনুবাদটি আমরা যেমন পাইয়াছি, তাহাই ঠিক এই স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। কেবল বাঙ্গলা পত্রখানি পাঠ করিলে পত্রের মাধুর্য্য এবং তেজ (spirit) বুঝা অনেকের পক্ষে কঠিন বোধ হইতে পারে; এই জন্য ইংরাজি অনুবাদটি আদ্যন্ত দিতেছি।

(ইংরাজি অনুবাদ)

রাণী ভবানীর পত্র।

Be it known to you, Newab Serajudowla, that a woman's chastity is like an earthen vessel; once you break it you break it for ever. The broken pieces are not mended but they are reduced to powder and thrown away into dust and dirt. An outrage on a woman's modesty is an outrage on the outrager's own character. An attempt by a king at outraging the modesty of a woman is an attempt at ruining the king himself and the kingdom itself. You can spend, O Newab, you can spend the treasury of Plutus (or কুবের ভাণ্ডার) to destroy the chastity of a woman and gratify your carnality; I have neither gold nor silver to spend with a view to purchase your ruin or to put a check to the commission of this heinous crime; but every hair that has been given to me by God on my head shall cry for vengeance and be it known to you Newab Serajudowla, that this continued cry for vengeance will create and spread such a terrible wild fire of discontent throughout the country that the waves of the sacred waters of the Ganges at Murshidabad will fail to quench it out until the fire burns your kingdom and consumes your very existence. Remember, what became of mighty Ravana and his glorious Lanka; remember what became of them who outraged Droupadi; remember what became of Joolaykhan on account of the poins Yusuff's consort;

if neither your Koran nor our Pooran can give you an idea of the value of a woman's chastity which is her noblest and holiest possession, then may it please God, O Newab, may it please the Father in Heaven to enable you to understand what a great insult will it be to the Newab himself—what a terrible shock will it be to his mind—if a man, whether a Hindoo or a Mahomedan, attempts at outraging the modesty of the great Newab's own wife. Will the Newab be pleased to tell me what His Highness will do unto the man for the outrage which the Newab does not like to be committed on his own wife?

এই অনুবাদ যখন আমার হস্তগত হয়, তখন একজন বন্ধু ইহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই পত্রে মূল্য এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা।" অপর একজন বান্ধব বলেন, "কুবেরের ভাণ্ডারে যত ধন আছে, এই পত্রের মূল্য তদপেক্ষাও অধিক।" যাহা হউক, এই পত্র যখন সিরাজ্-দ্দৌলার সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল, তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সিরাজ ইহা শুনিয়াছিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল মূক ভাব অবলম্বনের পর, সিরাজ বলিয়া উঠিয়াছিলেন:—"বজীর! বজীর! ইয়ে চিঠি বনী আদম্‌সে আয়ী নেহি, ইয়ে চিঠ্‌ঠি কিসি ফেরেস্তা কি জানিব্‌ সে আয়ী হ্যায়" অর্থাৎ "মন্ত্রি! মন্ত্রি! এই পত্র কোনও মনুষ্যের প্রেরিত নহে, ইহা কোনও স্বর্গীয় দূতের নিকট হইতে আসিয়াছে।" শুনা যায়, এই পত্র পাঠের পরে কোনও সতী স্ত্রীলোকের প্রতি সিরাজ অত্যাচার করেন নাই।

রাণী ভবানীর পত্রখানি ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, এই ইংরাজিটুকুর বিশুদ্ধ বাঙ্গালানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(অনুবাদ)

নবাব সেরাজউদ্দৌলার জানা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের সতীত্ব প্রায় মৃন্ময় পাত্র তুল্য। মাটির পাত্র একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর যোড়া যায় না, স্ত্রীলোকের সতীত্ব একবার নষ্ট হইলে আর তাহার প্রতীকার হয় না। যে ব্যক্তি সতী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশের চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি নিজের চরিত্রনাশের মূলীভূত কারণ হয়। রাজা যদি স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা ও সতীত্বনাশে উদ্যত হয়েন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য ও সিংহাসন সত্বরেই নষ্ট হয়, ইহা ধ্রুব সত্য। হে নবাব! আপনি অর্থব্যয় দ্বারা স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশের উদ্যোগ করিতে পারেন এবং পাশবীয় কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতে পারেন; এরূপ মহাপাপের দমন জন্য—এরূপ প্রবল দেশ-বৈরীর শাসন জন্য—প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন তাহা জানি; আমাদের তত ধন না থাকিতে পারে; কিন্তু আমার মাথায় যত চুল আছে, ততগুলি শত্রু একত্র হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তোমার অত্যাচারে, তোমার পাশবীয় ইন্দ্রিয়লালসায়, এ দেশে এমন এক বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে, যাহা মুর্শিদাবাদের গঙ্গার সমুদয় জল একত্রিত হইলেও নির্ব্বাণ করিতে সক্ষম হইবে না। সতী সীতার সতীত্বনাশের চেষ্টা করিয়া অথবা দ্রৌপদীর মর্য্যাদাহানির উদ্যোগ করিয়া মহাবলী রাবণ ও কীচকের কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহা মনে কর; কোরাণ ও পুরাণ পাঠ দ্বারা যদি তুমি স্ত্রীলোকের সতীত্বের মূল্য বুঝিতে না পরিয়া থাক, তাহা হইলে একথা তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি একটা উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। তুমি অন্যের স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে সন্তুষ্ট, কিন্তু তোমার স্ত্রীর প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে, যদি তোমার সহধর্ম্মিণীর সতীত্ব নাশ করিতে কেহ উদ্যত হয়, তাহা হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও কি অসন্তুষ্ট

হও? তাহা হইলে সেই লোকটাকে তুমি ভাল বল কি মন্দ বল? অনুগ্রহ করিয়া এই কথাটার উত্তর দিলে বাধিত হইব।

(ভবানী)

পাঠক মহাশয়! রাণী ভবানীর এই পত্রখানি কেবল সেরাজুদ্দৌলার দুশ্চরিত্রতার একমাত্র পরিচয় নহে, তাঁহার পাশবীয় স্বভাবের ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ আছে। মুর্শিদাবাদের সানগর নামক মহল্লায়, গঙ্গা নদীর তটে, এখনও একটা পুরাতন ঘাট "লম্পট ঘাট" নামে বিখ্যাত, ঐ ঘাট এখনও বর্ত্তমান। এই ঘাটে লম্পট সেরাজুদ্দৌলা এবং তাহার লম্পট সহায়কেরা আড্ডা করিত। এই সকল অখণ্ডনীয় প্রমাণে সেরাজকে "দুশ্চরিত্র" ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? সেরাজ যেমন পাপের ও অশিক্ষার দৈত্য মূর্ত্তি ছিল, রাণী ভবানী তেমনি পুণ্য, ধর্ম্ম ও সৎ শিক্ষার দেবীমূর্ত্তি ছিলেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ।

যে সকল মহাত্মার চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পাঁচটী শ্রেণীতে এবং তাঁহাদের যুগসমূহকে পঞ্চযুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টির ইতিহাস, পৃথ্বী সৃষ্টির পৌরাণিক ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর আমোদ ও আনন্দজনক; বাইবেলের "জেনেসিসের"

সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে ইহা অধিকতর কৌতুকাবহ এবং অধিকতর প্রয়োজনীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সকল বিস্তৃত কথার বিশদরূপে আলোচনা করিবার স্থান এবং সময় নাই। আমরা কেবল দ্বিতীয় যুগের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

যাঁহাদিগকে আমরা কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, তর্জ্জাদার, ঝুমুরওয়ালা, কথক, পাঁচালিকার প্রভৃতি উপাধিতে অভিহিত করিয়া থাকি, বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের তাঁহারাই অধিকর্ত্তা। ঝুমুর, তর্জ্জা, "কবি" প্রভৃতির নামে অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন, সত্য; বিরক্ত হইবার কারণও আছে, স্বীকার করি; কিন্তু ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে—বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে—যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় ইঁহাদের সামান্য অশ্লীলতা সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়। 'কবি'র পূর্ব্বে যাত্রার সৃষ্টি হয়; যাত্রার পরে কথক এবং পাঁচালিকারের আবির্ভাব, তদনন্তর ঝুমুর ও তর্জ্জার উৎপত্তি। বাঙ্গালা দেশে যাত্রা এক অপূর্ব্ব জিনিষ! পৃথিবীর আর কোনও দেশে, কোনও সমাজে, "যাত্রা" নাই; যাত্রার বলে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৈষ্ণবকুলতিলক চন্দ্রশেখর দাস, বাঙ্গালা দেশে যাত্রার স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যাত্রা ছিল না। চন্দ্রশেখর অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য এবং জাতিতে কায়স্থ; তাঁহার যাত্রার নাম "হরিবিলাস," এই পালাই তাঁহার যাত্রার প্রথম পালা। তদনন্তর তাঁহার পালার সংখ্যা অধিক হইলে যাত্রাটি "শেখরী যাত্রা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ঐ যাত্রার মোটে তিনটী গান সংগ্রহ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। একটী এখানে উদ্ধৃত হইল।

(ভৈরবী)

"দশদিক নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস ॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ুর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর ॥
দ্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোতকপোতী।
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি ॥
কুমুদিনীবদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর ॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর ॥
জাগহ সকল লোক নাহি মান ডর ॥
শেখরে শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু পারা রহিয়া শুতিয়া ॥"

চন্দ্রশেখরের শিষ্যের নাম জগদানন্দ। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের হরিবিলাস পালায় ইনি "রাই" সাজিতেন। জগদানন্দ, চন্দ্রশেখর অপেক্ষা অধিকতর উচ্চদরের কবি ছিলেন। জগদানন্দের গানের শব্দবিন্যাস, ওজস্বিতা, মাধুর্য্য এবং ভাব এত সুন্দর যে, এক একটা গীত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকারদিগের কবিতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, জগদানন্দ প্রণীত বহু গাতের মধ্যে আমরা অল্পমাত্রই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। একটা গীতের সম্পূর্ণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

ভৈরবী।

জাগহো বৃষভানুনন্দিনী মোহন যুবরাজে। (ধুয়া)
অকরুণ পুন বাল অরুণ
উদিত মুদিত কুমুদ বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদ
মিনিক সদন সাজে॥
কি জানি সজনী রজনী থোর
ঘুঘু ঘন ঘোষতি ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী
কামিনী কুল লাজে॥
জাগহো বৃষভানুনন্দিনী মোহন যুবরাজে॥
গলিত ললিত বসন সাজ
মণিযুত বেণী ফণি বিরাজ
উচ কোরক যুথ লোলক
কুচযোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত জলদ ভাতি
দোহে শুভে সুখ রহল মাতি
জিনি ভাদর রস বাদর
পরমাদর শুভ সাজে॥
জাগহো বৃষভানুনন্দিনী মোহন যুবরাজে॥
টুটল গেয়ে ফুল ধনু গুণ
কি রতি রণে ভেল তনু ঘুণ
সরম মাঝ পড়ল লাজ
রতিপতি ডর ভাজে॥

কুহু কত হত শোক কোক
জাগব অবশ অবহুঁ লোক
শুক সারিক কাকলী পিক
নিধুবন তরু আওয়াজে ॥
জাগহো বৃষভানুনন্দিনী মোহন যুবরাজে ॥
বিপদে পড়িল যুবতী বৃন্দ
গুরুজন অতি কহব মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস দ্বন্দ্ব
ভনয়ে রসবতী রসরাজে ॥

জগদানন্দ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার শ্রীখণ্ড গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই মহকুমায় কবি কাশিদাসের জন্মস্থান। বটতলা হইতে প্রকাশিত "পদকল্পতরু" নামক পুরাতন গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় এই গীত প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তদনন্তর অমৃতবাজার-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক অতি সুন্দররূপে সংগৃহীত, সম্পাদিত এবং প্রকাশিত পদকল্পতরুতে ইহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। জগদানন্দের পরে সাত জন যাত্রাওয়ালার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমরা এখন পর্য্যন্তও তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাই নাই। এখনও অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছি। এই সাত জন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাত্রাওয়ালার অন্তর্দ্ধানের পরে রসিকচূড়ামণি কিরণ দাস, চন্দ্রোদয় মজুমদার, মোহন সরকার, অনপরাধ ঘোষাল, উদ্ধব সামন্ত, হৃষীকেশ গোস্বামী, জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হরিহর বটব্যালের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ছিলেন এবং "বেগো"র গাঙ্গুলী

বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারই প্রসিদ্ধ "বালকের" নাম গোবিন্দ অধিকারী। যাত্রার দলের "ছোক্‌রা" গিরি করিয়া, গোবিন্দ শেষে "অধিকারী" হইয়া পড়েন। বাঙ্গালা ভাষা, গোবিন্দ অধিকারীর নিকটে বিশেষ ঋণী। তাঁহার পদাবলী, বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার "শারি শুকের দ্বন্দ্ব" বাঙ্গালা ভাষার এক অপূর্ব্ব জিনিষ! গোবিন্দ অধিকারী ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ছিলেন। গোবিন্দ·অধিকারী মহাশয়ের সময়ে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের "খাসযাত্রা"আর ছিল না, এখনও আর নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে আমরা ছত্রিশ জন যাত্রাওয়ালার নাম পাইয়াছি। ইঁহাদের প্রত্যেকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। এই ছত্রিশ জনের মধ্যে, সেখ বকাউল্লা, বিশ্বনাথ মাল, রামময় দাস, রাজনারায়ণ দাস, লোকনাথ (চাষা ধোবা), মহেশ ঠাকুর, কান্ত তেলি, রঘু তামুলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সেখ বকাউল্লা 'বোকো সেখ' বলিয়া বিখ্যাত। ইনি মুসলমান, ইহাঁর পিতামাতাও মুসলমান ছিলেন। হুগলী জেলায় ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি মুসলমান হইয়াও বাঙ্গালা ভাষায় অসাধারণ অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর গীতাদি বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম অলঙ্কার। অনুপ্রাসে গীতরচনায় বকাউল্লা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কান্ত তেলি, রঘু তামুলী, লোকনাথ, বিশ্বনাথ মাল প্রভৃতির বাঙ্গালায় অধিকার এবং বঙ্গসাহিত্যের সহিত সম্পর্ক কম ছিল না। লোকনাথের—

কি সুন্দর, শুনিতে সুন্দর,
বিদ্যাসুন্দর মনোহর।
ছলে বলে কৌশলে

মালিনীরে ফাঁকি দিলে
উভয়ের মন অন্তঃশীলে
বহে নদী ফল্গু যেমন ॥

প্রভৃতি গীত, কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচায়ক। লোকনাথ, মিনিটে মিনিটে অদ্ভুত কবিতা বাঁধিয়া দিতে পারিত। যখন চারিধারে "যুড়ীরা" দাঁড়াইয়া, সুকণ্ঠ বালকদিগের সহিত, "শুন শুন রসিক-সুজন" প্রভৃতি ধূয়া গাহিতে গাহিতে, হাততালি দিত, তখন যাত্রার আসর মাৎ হইয়া যাইত। ফলতঃ এখনকার কালে যাত্রার আসরে আর সেকালের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাই না; কালে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। সে কালের মত সরল ভাষায় সরল ভাবের গানও এখন কম শুনা যায়। এখনকার যাত্রা ও থিয়েটরে যে প্রকার ভাষা ও যে প্রকার ভাব ঢুকিয়াছে, তাহা পল্লীগ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের কথা দূরে থাকুক, বড় বড় পণ্ডিতও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কাজেই পাড়াগেঁয়ের লোকেরা এখনকার বিলাতী ফ্যাশনের যাত্রায় এবং বিদেশীয় ভাবে ও সংস্কৃত মিশ্রিত "কেতাবী বাঙ্গালায়" রসভোগ করিতে পারেন না। বকাউল্লা সেখের—

'বল্‌লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয়।
নারীর গুণ শুন বলি,
আপনি কালী মুণ্ডমালী,
স্বামীর বুকে পদ দিয়ে
নৃসিংহ করিল জয় ॥
বল্‌লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয় ॥

অথবা "বল্‌গো সীতে, এ দুরন্ত শীতে, এ বনে আসিতে"

ইত্যাদি গীত অতি মনোহর, অতি সুন্দর। এই সময়ে সুন্দর দাস নামে এক উড়িয়া কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই উড়িষ্যাবাসী কায়স্থের বাঙ্গালা ভাষায় অতি আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। তাঁহার গীত ও কবিতা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার অলঙ্কার স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আমাদের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি, উৎকর্ষ ও বিস্তৃতির ইতিহাস" নামক বিপুলবপু গ্রন্থে এ সকল গীতের আলোচনা করা যাইবে। ঐ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সুন্দরদাস উড়ের এক বাঙ্গালী বাদ্যকর ছিল; তাহার নাম অক্ষয় ঘোষ। অক্ষয় জাতিতে গোয়ালা, কিন্তু যেমন "বাজিয়ে" তেমনি "গাইয়ে"। কেবল তাহাই নহে, অক্ষয় ঘোষ অত্যন্ত সুবক্তা ছিলেন এবং তাঁহার বাঙ্গালা লিখিবার ক্ষমতাও বেশ ছিল। তাঁহার তৎকালীয় বাঙ্গালার একটু নমুনা দিতেছি।—

"এতাবৎকালের উপদ্রবাবলীর বিবরণমালা উপযুক্ত কালে ব্রাহ্মণ বৃন্দের শ্রুতি গোচর না হইবায় কাকতালীয় ন্যায় সূত্র মাফিক্ তদানীন্তন গোস্বামীপুঞ্জ বেকায়দা প্রাপ্তি নিবন্ধন গোলমালে হয়রাণ পর্শান্ হইবায় বর্ণিত বিষয় দুইটার বিশেষ ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় অথবা জলবুদ্বুদের ক্ষণিক স্থিতি ও ক্ষণিক অন্তর্দ্ধানের ন্যায় সে কথা ক্ষণমধ্যেই জাগ্রত হইয়া উঠিবার বহুল কারণ দৃশ্যমান হইয়াছিল। অনন্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ার পর আর কি বসুন্ধরা সলিলে অপূর্ণ থাকিবে?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই অক্ষয় ঘোষ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ছিল। অক্ষয়ের অনেক কবিতা আমাদের নিকটে আছে। অক্ষয়ের চিঁড়ে মুড়কী" কবিতা বাঙ্গালা ভাষায়

এক নূতন জিনিষ। এই কবিতার অর্দ্ধাংশ পাইয়াছি। বাকী এখনও পাই নাই। সমগ্র না পাইলে ইহার প্রকাশে মজা নাই, এজন্য তাহার নমুনা দিলাম না। বর্দ্ধমাননগরে "পঞ্চানন্দ" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে "মুড়ি" নামে এক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ কবিতার পদাবিন্যাসে এবং সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া পঞ্চানন্দের রসগ্রাহী সম্পাদক, লেখক মহাশয়কে "ঈশ্বরগুপ্তের জীয়ন্ত শিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ মুড়ীর কবিতার সুলেখকের সহায়তায় অক্ষয় ঘোষের অনেক কবিতা আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। চিঁড়ে মুড়কীর পদ্য মুড়ীর পদ্য হইতে স্বতন্ত্র হইলেও মুড়ীর পদ্যকে উহার সমতুল্য বলা যাইতে পারে। এই অসাধারণ মুড়ীর কবিতার ভূমিকা এইরূপ—

ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি!
আসি এই বঙ্গভূমি
উদ্ধারিছ বঙ্গবাসী জন।
কাঙ্গাল বিষয়ী যত
সদা তব অনুগত
কভু হর তাপসের মন॥
মুড়িভোজী পেলে লঙ্কা
স্বর্গে যায় মেরে ডঙ্কা
শঙ্কা করে সদা তারে যম।
আদার সনে হ'লে যোগ
অমৃতে আদিত্য ভোগ,
কলার সঙ্গে নহে কিছু কম।" ইত্যাদি।

বর্দ্ধমানজেলাবাসী এই মুড়ির কবিতাকার বলেন, অক্ষয় ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবর ঘোষ চব্বিশ পরগণার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলিয়া বিখ্যাত হন, এবং তাঁহার প্রপৌত্র কেশব ঘোষ রাজসাহী জেলায় বিবাহ করিয়া সুন্দররূপে ইংরাজী ভাষায় অধিকারলাভ করতঃ এখন উচ্চপদে আসীন। কেশব বাবু The Beauties of Bengalee Literature নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, শুনিয়া আমরা আপ্যায়িত হইলাম। ভরসা করি, এই গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইব।

তাহার পরে, দাশুরায়ের পাঁচালি, রসিক রায়ের পাঁচালি এবং গোবর্দ্ধন দাসের পাঁচালি উল্লেখ করিবার যোগ্য। কেশবচাঁদ, ননীলাল, যদু ঘোষ প্রভৃতি পাঁচালিকারের দ্বারাও বঙ্গভাষার অনেক উপকার হইয়াছে। কথকদিগের মধ্যে ধরণীধর কথক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর সুযোগ্য পুত্র মুরলীধর বি, এ, পাশ করিয়া কটক নগরের রাভেন্‌শা কলেজের অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ঝুমুরের মধ্যে দেবদাসী, রাইরাণী, মা ভবানী, যুগলমতি, বামাদাসী, প্রভৃতি শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিবার উপযুক্ত। ইহাঁদের ঝুমুরে অশ্লীলতার লেশমাত্র ছিল না, অথচ পদাবলী অতি মধুময়ী এবং অতি উচ্চভাবপরিপূর্ণা। তর্জ্জার মধ্যে স্বরূপ হাজরা, জগৎ মিত্র, নয়ন রায় এবং শ্রীনিবাস মহাচার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইঁহাদের সকলের নিকটেই বাঙ্গালা ভাষা ঋণী; ইঁহারাই বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের উজ্জ্বল রত্ন।

এইবারে আমরা কবিওয়ালাদিগের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, হরুঠাকুর, ভোলা-ময়রা, জগন্নাথ দাস, গুড়্‌গুড়ের দল, শ্রীমতি মোহিনী দাসী, আণ্টনী

ফিরিঙ্গি, রাম বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ঈশ্বর গুপ্ত, গুড়্গুড়ে, হরুঠাকুর প্রভৃতি উচ্চদরের 'কবি' বটেন, কিন্তু ভোলাময়রা সকলকে টেক্কা দিয়াছেন। আণ্টুনী ফিরিঙ্গি হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছেন। মুষ্টি মুষ্টি ধূলি প্রক্ষেপে মুসলমানের যেমন কবর হয়, নানা লোকের অল্প অল্প সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষার তেমনই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ধোপা, নাপিত, তেলি, তামুলি, ময়রা, মুসলমান প্রভৃতি অনেক জাতিই বাঙ্গালা সাহিত্যাট্টালিকার মিস্ত্রি স্বরূপ; শেষে বাকী ছিল ফিরিঙ্গি——আণ্টুনী সাহেব সে বাকীটুকু পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। "কবি"ওয়ালাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জগৎকে বিস্মিত করিতে পারে। এই উপস্থিত বুদ্ধিতে ভোলা ময়রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে ইহাঁর নিকটে ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়্গুড়ে হারি মানিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের একজনই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ভোলা ময়রার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাহার মধ্যে আণ্টুনী ফিরিঙ্গি এবং যজ্ঞেশ্বর খুব বলবান্ প্রতিযোগী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ভোলা ময়রার সকল কথা আমরা পাই নাই; অনেক দিন পূর্ব্বে "ভারতী"তে ভোলা ময়রার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রবন্ধের লেখক অনেক নূতন কথা শুনাইয়াছিলেন। আণ্টুনী গাহিত,—

"ভজন পূজন জানিনা মা!
জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া ক'রে তার মোরে
এ ভবে, মাতঙ্গি॥"

গান শুনিয়াই, ভোলা ময়রা ভগবতী সাজিল, এবং গাইতে লাগিল—

"আমি পার্ব্বোনারে তরাতে

আমি পার্ব্বোনারে তরাতে।

যিশুখৃষ্ট ভজ্‌গা তুই, শ্রীরামপুরের গির্জ্জাতে।

আমি পার্ব্বোনারে তরাতে।" ইত্যাদি।

ভোলার ভবানীপুরের বারোয়ারীতে সেই গান—

আমি সে ভোলানাথ নই,

আমি সে ভোলানাথ নই।

আমি ময়্‌রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,

বাগবাজারে রই।

আমি সে ভোলানাথ নই।

যদি সে ভোলানাথ হই,

যদি সে ভোলানাথ হই,

তা'হলে——"। ইত্যাদি।

সেই গান এখনও পল্লীগ্রামের লোকের বৈঠকখানায় আমোদের জিনিষ বলিয়া আদর পাইয়া থাকে। রাম বসুর "মনে রৈল সই মনের বেদনা" গীত, রাখাল ছেলেদের কণ্ঠে এখন শুনা যায়। কিন্তু প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বে ভোলা ময়রা অদ্বিতীয়। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত জাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব জমিদারদিগের বাটীতে ভোলাময়রার এবং জগাদাসের কবি হইতেছিল। ঐ গ্রামের জমিদার ব্রাহ্মণ এবং অধি-বাসীদের অধিকাংশই জাতিতে চাষা, গ্রামের পার্শ্বে মাণিককুণ্ড নামক স্থানে খুব বড় বড় মূলা জন্মিত, এখনও জন্মে। যজ্ঞেশ্বর দাস লোভী ছিল এবং খোষামোদ করিয়া সত্যের অবমাননা করিয়া, পয়সা লইতে ভালবাসিত। যজ্ঞেশ্বর জাড়ার প্রশংসাচ্ছলে গাহিল—"এই জাড়া

গ্রাম সাক্ষাৎ বৃন্দাবন স্বরূপ, ইহা মর্ত্ত্যের গোলোক, ইহার পুষ্করিণীসমূহ রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ইত্যাদি।" ভোলা উত্তর দিল—

"কি কোরে বল্লি জগা
　　জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা
　　চৌদিকে তার বাঁশের বন॥
কোথারে তোর রাধা কুণ্ড,
　　কোথায় তোর শ্যাম কুণ্ড
সাম্‌নে আছে মাণিক কুণ্ড
　　করগা মূলা দরশন।
কি কোরে বল্লি জগা
জাড়া গোলক বৃন্দাবন।
ওরে "কবি" গাবি পয়সা লবি,
　　খোসামুদী কি কারণ॥
কি কোরে বল্লি জগা
　　জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।" ইত্যাদি।

ভোলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। রমাপতি ঠাকুর নামে আর একজন লোক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজে কবি-ওয়ালা ছিলেন না, কিন্তু তিনি 'কবির' ছড়া ও গীত বাঁধিয়া দিতেন। রমাপতির "সখি ধর ধর" গীত ভাদ্রমাসের ভাগীরথীর তরঙ্গভরা; এই গীতের পদবিন্যাস, শব্দচাতুরী, অলঙ্কার এবং ভাব অতি প্রশংসনীয়। রমাপতির বেহাগ রাগিণীর একটী গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

"সখি! শ্যাম না এলো।
অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী আজি অমনি পোহা'ল॥
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক কিরণ
উষার প্রভায় হলো সঙ্কীরণ
পাতায় পাতায় বহে প্রাতঃসমীরণ
কুমদিনী হাস্যবদন লুকা'ল।
শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিক তারা,
দেখ সখি সবে প্রভাহীন তারা,
নীলকান্ত মণি হলো জ্যোতিহারা,
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশা'ল॥
সখি! শ্যাম না এলো॥
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়,
এ বিরহ ধনি তোমা বোলে নয়;
নিশাগতে যেন প্রভাত নিশ্চয়,
রজনীর সুখ ঐ বিলাস ফুরাল॥
সখি! শ্যাম না এলো।"

কবিওয়ালাদের মধ্যে হরিবোলা দাসও প্রসিদ্ধ। যজ্ঞেশ্বর, হারু কৈবর্ত্ত ও হরিবোলা দাস সমসাময়িক। ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দীর পূরা নাম যজ্ঞেশ্বর, জাতিতে ধোপা, বাড়ী মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণা। মেদিনীপুরের ঘাটাল ও তমলুক অঞ্চলে এখনও অনেক কবিওয়ালা আছেন। হারু কৈবর্ত্ত ও হরিবোলার পারস্পরিক প্রতী-দ্বন্দীতায় "কবি" হইলে, আসরের একদিকে একছড়া পাকা কদলী এবং আর একদিকে লাল রুমালে বা গামোছায় টাকা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া

দেওয়া হইত। যে জিতিত, সে টাকা লইত আর যে হারিত, তাহার ভাগ্যে পাকা কলা মিলিত! সে কালের কবির আসরের জনতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতি এখনকার কালের লোকেরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সুগায়ক ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজবাটীতে "প্রধান গায়ক" বলিয়া তাঁহার চাকুরী ছিল। সেখানকার রাজার প্রদত্ত চন্দ্রকোণাতে রমাপতির জায়গীর আদি এখনও আছে, তাঁহার পৌত্রেরা তাহা ভোগ করিতেছেন। রমাপতির স্ত্রীও বেশ গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বামীর "সখি শ্যাম না এলো" গান শুনিয়া "সখি শ্যাম আইল" গানটি রচনা করিয়া সেই রাগিণীতে গাহিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

উপরে তর্জ্জা ও ঝুমুরের উল্লেখ করা গিয়াছে। তর্জ্জার গানের একটা নমুনা দিতেছি। একালে তর্জ্জা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(তর্জ্জার গীত)

ঠক ঠকা ঠক ঠক।
রাত দুপরে বসে ঘরে, আঁতকে ওঠা সক।
ঠক ঠকা ঠক ঠক।
সখের প্রাণ বাগ না মানে,
বেরিয়ে পড়ে হেঁচকা টানে,
আনাচ কানাচ মানবনাকো ধর্ম্মে হ'ব বক।
রামা শ্যামা মিষ্টি বড়, ভাতার বড় টক্॥
শুইরামের পিসের শ্বশুর,
টেকোর মামার শ্যালা।
মিত্তির গিন্নির পিত্তি পড়ে শুকিয়ে গেছে গলা॥

ছুটেছে হোরে হোঙ্গে হাম্‌লে—
ইটালী পদ্মপুকুর মাণিকতলা যায় না রাখা সাম্‌লে।
পেরিয়ে গেছে মেছোবাজার ধর্ম্মতলার চক্।
ওরে ঠক ঠকা ঠক ঠক॥

এবারে ঝুমুরের একটা গীত শুনাইবার আকাঙ্ক্ষা করি।

(ঝুমুরের গীত)

চল সই বাঁধা ঘাটে যাই।
আঘাটার জলের মুখে ছাই॥
ঘোলা জল পড়্‌লে পেটে,
গা টা অমনি গুলিয়ে উঠে,
পেট্ ফাঁপে আর ঢেঁকুর উঠে,
হেউ হেউ হেউ।
(আবার) কলসিতে পাঁক থেঁতিয়ে থাকে
ঘেন্নায় মরি ভাই।
তাইতো আমি মর্‌ছি ভেবে,
সখের প্রাণে দুঃখ ক্যানে সবে,
তাইতো আমি মর্‌ছি ভেবে
কাশী কি মকা যাই॥
পেট ফাঁপে আর ঢেকুর উঠে
যেন খেউ—খেউ—খেউ॥
চোখের জল চোখে মরে
বেড়াই আমি আমোদ করে
জালায় জ্বলি, তবু রসে চলি,
আমি হেলে দুলে চলেছি।

পোড়া গয়না বুঝি সয়না আর,
পাঁচ আবাগীর পাঁচ নজরের ছার,
পোড়া বিধির বিষম মার,
কার ধার যেন ধেরেছি ॥
ওগো! কুমড়ো ফুলের মধু খেয়ে
আমার পেট হয়েছি ভারি।
আমি চল্‌তে নাহি পারি ॥
ইত্যাদি ॥

এ দেশে "কর্ত্তাভজা" নামে এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়া বহুল গীত ও কবিতাদি রচনা দ্বারা সে কালের বাঙ্গালা ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছিল। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ পাদ্রী কেরি সাহেবের সর্ব্ব প্রথম দীক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের নেতা রামচরণ পালের শিষ্য কৃষ্ণ পাল অন্যতম।

"দেহতত্ত্ব" নামে আর এক সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারাও বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। দেহতত্ত্বের গায়কেরা এখনও নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহাদেরও সংখ্যা কমিয়া আসিয়াছে। দেহতত্ত্ব গানের নমুনা দেওয়া যাইতেছে——

ভগ্ন ঘরে বাস করা নয় কদাচন।
আমার দেহ-দিয়াল
দেখ্‌ছে খিয়াল
পড়্‌ছে পড়্‌ছে সদা মন।
ভগ্ন ঘরে বাস করা নয় কদাচন ॥
ইত্যাদি।

মুসলমানেরা অনেক কবিতা রচনা করিয়া সেকালে প্রচার করিয়া-

ছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ভাল ভাল বাঙ্গালা-কবিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানী বাঙ্গালার অনেক কবিতা পাঠ করা যায়। নমুনা নিম্নে দেখুন :—

চাচি কেঁদে আকুল হোলো
দর্‌গা সান্‌কি রাখা ভার ॥

আর একটী গান শুনাইব—

ছোট মামুগো !
ভেবে মনু গো।
এবার দুনিয়া পোড়ালে আল্লা ॥
মেহে পানি ফোট্টা নাই
মেহ ডাহে সদাই
আস্‌মানে আগুন লাগ্‌লা ॥
ছোট মামু গো ! এবার দুনিয়া পোড়ালে আল্লা ॥
ভেবে মনু গো
ছোট মামু গো
খোদার গজবে সব কোল্লে ছেল্লা ভেল্লা।
যা ছিল সান্‌কি থালি বদ্‌না আদি,
বেচে কিনে কোল্লাম মহাজনে রাজি,
আমার ভাগ্যে যা করেন্ গো কাজি,
দর্‌গায় দর্‌রায় দিব সিন্নী কেলা।
মামু গো ! এবার দুনিয়া পোড়ালে আল্লা ॥

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শাক্ত ও বৈষ্ণব।

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগদ্বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল রণস্থলে পাণ্ডবীয় রথের মধ্যস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক যোগীশ্বর অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! নদী সমূহ (গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, ব্রহ্মপুত্র, বারুণী প্রভৃতি) অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অটল অচল দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া দিক্‌দিগন্তরে নানা দেশ প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে গিয়া সম্মিলিত হয়," তখন যমুনা, জাহ্নবী, শতদ্রু, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধি ও নাম লুপ্ত হইয়া কেবল অনন্ত মহাসমুদ্র এই প্রকীর্ণ নামে ইহারা আখ্যাতা হইয়া থাকে। তখন যমুনার শ্যাম সলিল, ভাগীরথীর শ্বেত সলিল আর কাবেরীর লোহিতাভ উর্ম্মি-মালা সম্প্রসারিত হইয়া বিশালা বারিধিবক্ষের নীল নীরে এমন প্রচ্ছন্ন-ভাবে মিলিয়া যায় যে, ইহাদের পরস্পরকে বিভিন্ন করা কঠিন হইতেও কঠিনতর হইয়া উঠে; তখন বোধ হয়, যেন কোন তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মর্ষি পুরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহকে সংযম পূর্ব্বক একই মহাকেন্দ্রাভিমুখে প্রধা-বিত করিয়া সুষুপ্তি ও নিরোপাধিক অবস্থায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত এই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ উক্তি ও অনুজ্ঞা কি সুন্দর, কি মধুর, কি শাশ্বত! প্রাচীন হিন্দুর পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের চরমফল ঠিক এইরূপ। হিন্দুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র গুলির শিক্ষা ও দীক্ষার শেষ ফল বাস্তবিক নদী সমূহের সাগর সলিলে সম্মিলনের অনুরূপ। স্বীকার করি, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে "নানা মুনির নানা মত আছে"; স্বীকার করি, আধ্যাত্মিক দিব্য চক্ষু মুদিত করিয়া কেবল চর্ম্মচক্ষে হিন্দুশাস্ত্রকে

দর্শন করিলে, অষ্ট্রেলিয়ার জরঙ্গ পশুর বহু বহির্ব্বাসের ন্যায় অনেক ভেদ ও অনেক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় বটে, দিব্যাক্ষমান বিবেকী পুরুষের নিকটে ইহা নদী সমূহের সাগর-সলিল সহ সম্মিলনের অনুরূপ। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অক্ষরক্ষ (চশ্‌মা) দিয়া দৃষ্টিপাত করিলে একই পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে প্রতীয়মান হইয়া দর্শকের মনে যেমন সর্পে রজ্জু অথবা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় মায়িক ধারণার উৎপাদন করে, সেই-রূপ ভক্তি বিবেক ও বিশ্বাসের চক্ষু দিয়া না দেখিলে এবং তত্ত্বজ্ঞানীর হৃদয়ের উদারতা ও শুদ্ধতা সহকারে না বুঝিলে, হিন্দুধর্ম্মের পালনে ও হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনায় অনেকের সন্দিগ্ধচেতা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; কিন্তু দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিয়া হিন্দুজাতিকে দর্শন করিলে এবং হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হিন্দুর অবি-নশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রের ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত কি সুন্দর একতায়, কি অপরূপ সাদৃশ্যে, কি মধুর একপ্রাণতায় এবং কি বিশ্বজনীন প্রেমডোরে সুচারু-রূপে গ্রথিত! যে দিক দিয়াই যাই, পরিণামে হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের অপূর্ব্ব পারস্পরিক মিলন দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হই; তখন আবার মনে হয়, শ্রীভগবান সত্যই বলিয়াছেন, "যথা নদীনাং বহবোম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি" ইত্যাদি। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের বেদ হইতে পুরাণ পর্য্যন্ত, কাণ্ড হইতে কাণ্ডান্তর পর্য্যন্ত, এই চমৎকার মিলন ও একতা বর্ত্তমান আছে বলিয়া হিন্দুশাস্ত্র জগতে একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম্ম (Universal Religion) আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য। এই বিশ্বজনীন উদার ভাব হিন্দুশাস্ত্র-শরীরের শিরায় শিরায় অনাদি ও অনন্তরূপে বিদ্যমান বলিয়া ইহা বৌদ্ধের নির্ব্বাণ-বাণে, মুসলমানের কৃপাণে ও কোরাণে এবং খৃষ্টানের বাইবেল-বন্যার টানে এখনও জীবিত, এখনও উদ্দীপ্ত এবং এখনও প্রবৃদ্ধ দেহে যুবকের উৎসাহে উৎসাহিত

হিন্দুশাস্ত্র যেন বিশ্বসংসারবাসীর শিক্ষা ও সম্মিলনের সুন্দর আশ্রম; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, উপাসনাযোগী, তত্ত্বযোগী, ;ভক্তিযোগী, মুক্তিযোগী, সকামী,নিষ্কামী, সকলেরই ইহা আশ্রয় ও আশ্রম। দুঃখের বিষয়, অনেকে তাহা বুঝিল না; বুঝিল না বলিয়াই হিন্দুর গৃহে গৃহে অনৈক্য, অমিলন ও অসদ্ভাবের বীজ উপ্ত হইয়াছে; বুঝিল না বলিয়াই হিন্দুর দুগ্ধফেননিভ সুকোমল কুসুমশয্যা আজি শ্মশানের সূর্য্যদগ্ধ সৈকত-শয্যায় পরিণত! একথা বুঝিলে কি বঙ্গদেশের শাক্ত ও বৈষ্ণবগণ আজি চারিশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া বিদ্বেষানলে জ্বলিয়া মরিত? হা হতোস্মি! যে মহাবীর শাক্তের আরাধ্য "শক্তি" বলে হতভাগ্য বঙ্গদেশ মহাশক্তিময় হইবার আশা করিয়াছিল এবং যে বৈষ্ণবের "বিষ্ণুমন্ত্রে" দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন হইবার মধুর আশা ছিল, কাল প্রভাবে সেই আশা প্রাণঘাতিনী মায়াবিনী মরিচীকা-রূপে পরিণত হইয়া উঠিল দেখিতেছি। বৈষ্ণবের মঙ্গলে শাক্ত এবং শাক্তের কল্যাণে বৈষ্ণব, হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া কর্ত্তিতকণ্ঠ রোহিতের ন্যায় অস্থির! ইহা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের—ধর্ম্মজীবনের—অধোগতির আর কি পরিচয় চাও?

বঙ্গদেশের রাজনৈতিক সীমা অর্থাৎ বঙ্গদেশের ছোটলাট সাহেবাধিকৃত রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া পরিভ্রমণ করিলে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আর শুনিতে পাই না; বঙ্গের বাহিরে ক্রূরতা, কপটতা ও বিদ্বেষবিষ মাখা প্রতিদ্বন্দ্বীতা আর দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশের বাহিরে শাক্ত ও বৈষ্ণবে সামান্য মাত্র ভেদজ্ঞান থাকিলেও তথায় অসদ্ভাবের অস্তিত্ব নাই। যে সকল কারণে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব ও মতদ্বৈধের উৎপত্তি হইয়াছে, বঙ্গের বহির্দ্দেশে তাহার বিদ্যমানতা নাই। বাঙ্গালায় যদি ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা শাস্ত্রার্থ লইয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবে

বিবাদ হইত, তাহা হইলে অমঙ্গলের কারণ ছিল না; শাস্ত্রার্থ লইয়া বিচার করিলে উভয়ে উভয়েরই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া লজ্জার সহিত মূকভাব অবলম্বন করিত। ইক্ষুকে যতই নিষ্পেষণ করা যায়, ততই যেমন তাহা হইতে সুরস নিঃসৃত হয়, তেমনি শাস্ত্র লইয়া যতই আলোচনা করা যায়, শাস্ত্র সমূহের পারস্পরিক মিলন ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় এবং হিন্দুজাতির অশেষ জ্ঞানগর্ভ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সমূহের অভ্যন্তরে অকাট্য সত্যকে প্রচ্ছন্ন ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক, বিশ্বাস, শাস্ত্র বা সদুপদেশ লইয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবে কখনও বিবাদ বিসম্বাদ করে নাই, করিলে এতদিনে সত্যের নিষ্কাষণ এবং ভ্রমের নিরাকরণ হইত; কেবল অসার বাহ্যিক বিষয় লইয়াই ইহারা বহুকাল ব্যাপিয়া বিবাদ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব অর্থে যাহা বুঝায়, তাহা এই :—যিনি মাংস, মদ্য, পলাণ্ডু, প্রভৃতি ব্যবহার করেন না এবং জীবহিংসার প্রশ্রয় দেন না অথবা সম্পূর্ণ ভাবে নিরামিষাশী কিম্বা নামাবলীর দ্বারা দেহ খানিকে আবৃত করিয়া এবং মস্তকের উপরিভাগ হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত তিলকের দ্বারা চিত্রিত করিয়া কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধিকা, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব। শাক্ত অর্থে যাহা বুঝায় তাহা এই:—যিনি মৎস্য, মাংস ব্যবহার করেন, জীবহিংসায় (বলিদানে) প্রশ্রয় দেন, মদ্যপানে বিশেষ আপত্তি করেন না, তিলকের পক্ষপাতী নহেন এবং কালী তারা দুর্গা প্রভৃতির উপাসক, তিনিই শাক্ত। শাস্ত্রে শাক্ত ও বৈষ্ণবের যাহাই অর্থ থাকুক, সাধারণতঃ বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিলাম। হতভাগ্য বঙ্গদেশে আহার লইয়াই শাক্ত ও বৈষ্ণবের প্রথম ও প্রধান বিবাদ। জাহ্নবীতটে নবদ্বীপ নগরে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ

চৈতন্যের (শ্রীগৌরাঙ্গের) আবির্ভাব ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য অনুশিষ্য এবং অনুচরবর্গ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্ব ছিল না; এই চারিশত বৎসর কাল মধ্যে বঙ্গদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবে মহাবিবাদ সমূহ সংঘটিত হইয়া গিয়াছে এবং উভয় পক্ষীয় লোকের গায়ক ও লেখকগণ কর্ত্তৃক বিরচিত পারস্পরিক বিদ্বেষব্যঞ্জক কত অসংখ্য গীত, গজল, কবিতা, পদাবলী, পুস্তক, পাঁচালি প্রভৃতির প্রচার হইয়া গিয়াছে। এখনও বিদ্বেষ বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই; সময়ে সময়ে প্রতিবাদ বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা-অনিলের সহায়তা পাইলেই সেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি মহাতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। হে ভগবন্! এই মহা বিদ্বেষানল কি বঙ্গদেশকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না? প্রাচীন যুগে শুক, নারদাদি অসংখ্য বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু বিবাদ বিতণ্ডা ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আহার লইয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে ঘোরতর ঘৃণা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা বিবেচনা করেন, আহার্য্য দ্রব্য লইয়াই বুঝি ধর্ম্ম। আহারের সহিত ধর্ম্মের একেবারেই কোনও সম্পর্ক নাই, একথা আমরা বলি না এবং বলিতে পারি না, কিন্তু কেবল আহারের উপরেই ধর্ম্মের সম্পূর্ণ নির্ভরতা ব্যক্ত করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশেষতঃ দেশ, কাল, পাত্র ভেদে আহারের ভিন্নতা জন্মে; খাদকের শারীরিক ও মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থানুসারে আহার্য্য দ্রব্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যাহা তুমি ঘৃণিত বলিয়া বিবেচনা কর, হয়তঃ তাহা অপরের পক্ষে মহোপকারী, সুতরাং কোন্ দ্রব্য উপকারী অথবা কোন্ দ্রব্য অনুপকারী, তাহা শরীরের অবস্থা ও প্রকৃতি দেখিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তর্কের দ্বারা তাহার মীমাংসা হয় না। তবে এ কথা অপ্রতিবাদ্য ভাবে বলা

যাইতে পারে যে, প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রর্ষিগণ যাহা শাস্ত্র ও সমাজবিরুদ্ধ বলিয়া "দূষণীয়" এবং "অব্যবহার্য্য"সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন, তাহার ব্যবহারে প্রশ্রয় দিবার কাহারও অধিকার নাই। দৃষ্টান্ত—গোমাংস হিন্দুমাত্রেরই অখাদ্য; শূকর মাংস মুসলমান মাত্রেরই অব্যবহার্য্য। কিন্তু যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ এবং সমাজসিদ্ধ, তাহা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে অব্যবহার্য্য থাকিলেও, অপর সম্প্রদায় তাহা ব্যবহার করে বলিয়া ঘৃণিত হইতে পারে না। মাংসভক্ষণ শাস্ত্রমতে সিদ্ধ, কিন্তু ব্যবহার করা বা না খাদকের ইচ্ছাধীন। মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে নরকে পতন এবং তাহার অভক্ষণে স্বর্গে আরোহণ—এই উভয় মতই ভ্রান্ত। গভীর চিন্তাশীল মহাত্মা মনু যজ্ঞার্থে পশুবধের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াও অবশেষে লিখিয়াছেন—"প্রাণী সকল প্রবৃত্তি মাত্রেরই অধিকতর অনুগামী, কিন্তু নিবৃত্তি মার্গেই মহাফল।" এ বিষয়ে সাধু পলুষ (St. Paul) নামে এক মহাপুরুষ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সারগর্ভ বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন, "The Kingdom of God is not meat and drink but righteousness and holiness in Holy Ghost" অর্থাৎ পবিত্রতা ও সাধুতাই ধর্ম্মের উপকরণ; আহার (মদ্যমাংস প্রভৃতি) ধর্ম্মের উপকরণ নহে। তিনি আরও বলেন, "যে দ্রব্যে যে ব্যক্তির অরুচি বা অসন্তোষ থাকে, তুমি সে দ্রব্যের খাদক হইলেও তাহার সম্মুখে তাহা কদাচ খাইও না।" ইহা বড় সুন্দর কথা! শাক্ত বা বৈষ্ণবের একথা সদত স্মরণ রাখা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ—

নির্ম্মাণ মোহা জিতসঙ্গ দোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্ত কামাঃ
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখ দুঃখ সংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্য মূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

এইরূপ ভাব হওয়া চাই, কেবল আহার লইয়াই স্বর্গ-নরক নহে। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ কবি জগন্নাথ দাস লিখিয়াছিলেনঃ—

"যে যাহার দ্রব্য খাউ
মোর নাম জপি থাউ॥"

অর্থাৎ, যাহার যাহা খাদ্য, সে তাহার সেই খাদ্য দ্রব্যের ব্যবহার করুক, কিন্তু (মোর) ঈশ্বরের নাম যেন জপ করিতে না ভুলে, অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচারে যেন আসল কথা (ধর্ম্ম) ভুলিয়া না যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে লিখিত আছেঃ—

"খাইবে মৎস্যের ঝোল
থাকিবে রমণীর কোল
তবুও না ছাড়িবে হরি হরি বোল্।"

অর্থাৎ, মৎস্যের ঝোলই খাও আর (অসংযতেন্দ্রিয় বলিয়া) রমণী-বিলাসই কর, দেখিও যেন ভগবানের মধুর হরিনাম তোমার কণ্ঠ হইতে অপসারিত না হয়। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ মহারাজা বলিয়াছেনঃ—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কিছু আহার কর, তাহা আমাকে অর্পণ করিয়া খাও। বাস্তবিক ব্রহ্মে অর্পণ (নিবেদন) করিয়া যাহা ব্যবহার করা যায়, তাহা শুদ্ধ এবং অঘৃণ্য। সুতরাং আহার বিষয়ে শাক্ত ও বৈষ্ণব এতদুভয় মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলে, তাহা নিতান্ত নিন্দনীয় এবং নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যঞ্জক। স্বীকার করি, ত্যাগস্বীকার ধর্ম্ম-জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান; স্বীকার করি, আহারেও ত্যাগস্বীকারের

প্রয়োজন, কিন্তু "শরীরকে অযথা কষ্ট দেওয়া নিতান্তই আসুরিক।" (গীতা)। স্বীকার করি, শৌচাচার এবং সাত্বিক আহার মানবমাত্রেরই বিশেষতঃ ধর্ম্মপ্রবণ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ আচারহীনতায় সত্যনিষ্ঠা থাকা অসম্ভব।

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরা সুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥"

কিন্তু অসূয়া সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। শাক্ত ও বৈষ্ণবে এই অসূয়া যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন উভয়েই ধর্ম্মপথ পরিভ্রষ্ট থাকিবেন, ইহা পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় সত্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেনঃ—

ইদন্তুতে গুহ্যমতং প্রবক্ষ্যাম্যন সূয়বে
জ্ঞানং বিজ্ঞান সহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে
অশুভাৎ॥

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়! তোমার চিত্তে অসূয়াদি দোষ দেখিতে পাই না, এজন্য আমি তোমাকে বিজ্ঞানের সহিত অতি গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ দিতেছি। (গীতা।)

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকো অলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

সুতরাং শাক্ত ও বৈষ্ণবের মুক্তি কোথায়? ধর্ম্মকল্পদ্রুম যুধিষ্ঠির, যোগীশ্বর অর্জ্জুন, ত্রেতাবতার শ্রীরামচন্দ্র, যোগীন্দ্র জনক, বৈদিক কালের রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ মাংস খাইতেন, ইহার অকাট্য প্রমাণ আছে। বৈষ্ণব মহাশয়েরা কি বলিতে চাহেন, মাংস খাইয়াছিলেন বলিয়া ইহারা সকলেই নরকাগ্নিতে নিপতিত হইয়াছেন, আর যাঁহারা মৎস্য মাংস

খান নাই, তাঁহারা কেবল স্বর্গে? পুরাকাল হইতে এপর্য্যন্ত কোটি কোটি মহাধার্ম্মিক লোক নিরামিষাশী হইয়া কেবল শস্য,ফল, দুগ্ধ প্রভৃতির উপরে নির্ভর করতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। শাক্ত মহাশয়েরা কি বলিতে চাহেন, তাঁহারা মৎস্য মাংস আহার করেন নাই বলিয়া নিরয়গামী হইয়াছেন, আর তোমরা "মৎস্যের ঝোল এবং রমণীর কোল" অবলম্বন করিয়া কালী দুর্গার নামে তিন শত তেত্রিশ প্রকারের মদিরা ধ্বংস করিতেছ এবং বিবিধ প্রকারের পশু ও পক্ষীমাংসের বিচিত্র চব্য চোষ্য, লেহ্য পেয় পদার্থে উদর পূরণ করিতেছ বলিয়াই তোমাদের জন্য স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার উন্মুক্ত হইবে? কি আশ্চর্য্য যুক্তি! কি আশ্চর্য্য ধারণা! কি অসহনীয় ভ্রম! মহাবিদ্বেষানল কি বঙ্গদেশকে কখনও পরিত্যাগ করিবেন না?

ইহার পরে শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিশ্বাসের কথা বলিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ, বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা; অন্য দিকে, কালী তারা মহাবিদ্যা দুর্গা অম্বিকা প্রভৃতি বঙ্গীয় শাক্তদিগের আরাধ্যা। বৈষ্ণবের তুলসী বৃক্ষ ও তুলসী পত্র এবং শাক্তের বিল্ববৃক্ষ ও বিল্ব পত্র প্রিয়বস্তু বলিয়া গণ্য। এইরূপে একের পক্ষে তুলসীমালা এবং অপরের পক্ষে রুদ্রাক্ষমালা অতীব প্রিয়। হিন্দুধর্ম্মের ঘোরতর বিদ্বেষী সম্রাট্ আওরঙ্গজেব যেমন অনেকস্থানে হিন্দুমন্দিরের পার্শ্বেই মুসলমান মশ্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তেমনি বৈষ্ণবের বিষ্ণুমন্দিরের পার্শ্বে শাক্তের কালী মন্দির এবং বৈষ্ণবের বিষ্ণুগঞ্জের পার্শ্বে শাক্তের শক্তিগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নবদ্বীপে রাসলীলা প্রভৃতি বৈষ্ণবোৎসবকালে এখনও শাক্তের কালীপূজার ধুমধাম হয়। বৈষ্ণব ভাবে, "আমার ধর্ম্ম বড়" শাক্ত ভাবিয়া থাকে, "আমার ধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। বৈষ্ণব

বলে, "মাংসাশী ম্লেচ্ছ শাক্তের মুক্তি নাই" ; শাক্ত বলে, "ইন্দ্রিয়পরবশ বৈষ্ণবের জন্ম-জন্মান্তরেও মোক্ষ হওয়া অসম্ভব।" বৈষ্ণব বলে, "মদ্য-মাংস, মৈথুন প্রভৃতির সম্ভোগ জনাই শাক্তের ধর্ম্ম" ; শাক্ত বলে, "গাঁজা টানা, টিকি নাড়া ; মুসলমানকে হিন্দু করা আর কুলবধূর কুল মজাইয়া বৈষ্ণবী করাই প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম।" এইরূপে তর্ক-বিতর্ক বাদ-প্রতিবাদ চলে, কিন্তু উভয়েই ভ্রান্ত!! অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া চলিলে যেমন উভয়েই গহ্বরে পতিত হইয়া আঘাতিত হয়, শাক্ত ও বৈষ্ণব ঠিক তদ্রূপবস্থায় পতিত! শাক্ত ও বৈষ্ণব যদি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখে, তাহা হইলে জানিতে পারে, শাক্ত বৈষ্ণব একই বস্তু, কেবল নামান্তর মাত্র। যে ব্যক্তি প্রকৃত শাক্ত, সেই প্রকৃত বৈষ্ণব ; এবং যে ব্যক্ত প্রকৃত বৈষ্ণব, সেই ব্যক্তি প্রকৃত শাক্ত। জলপূর্ণ সহস্র সহস্র ঘটে সহস্র সহস্র সূর্য্য পরিগণিত হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য কয়টী? ঘটের বিনাশ হইলে আকাশের সেই এক সূর্য্য একই আকাশে বিরাজিত দেখিতে পাই। মায়িক জ্ঞানের অপনোদন হইলে শাক্ত ও বৈষ্ণবকে একই ভাবে দেখিতে পাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, তুমি একই পুরুষ, কিন্তু তোমার পুত্র তোমাকে পিতা, তোমার জামতা তোমাকে শ্বশুর, তোমার ভৃত্য তোমাকে প্রভু, তোমার শিষ্য তোমাকে গুরু, তোমার ছাত্র তোমাকে শিক্ষক এবং তোমার ভ্রাতা তোমাকে দাদা বলিয়া ডাকে ; কিন্তু তুমি কয়জন? তুমি একা হইয়াও সম্পর্কভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট বহু উপাধিতে আখ্যাত। অখিল বিশ্বের অধিপতি ও নিয়ন্তা সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বর এক, কিন্তু ভক্তের ভাব ও ভক্তি অনুসারে তিনি অসংখ্য আখ্যায় অভিহিত। শ্রুতিতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "একোহং" অর্থাৎ অহম্ এক অর্থাৎ আমি (ঈশ্বর) এক, কিন্তু ভক্তের হৃদয়গত ভাব অনুসারে আমি নানা

উপাধিতে খ্যাত।* ভয়ে, বিপদে, শোকে কাতর হইয়া যখন ভগবানকে ভক্ত ডাকে, তখন ভক্তবৎসল ভগবান "অভয়া" রূপে দর্শন দেন; জ্ঞানবিহীন পুরুষ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া "জ্ঞানং দেহি" বলিয়া যখন ভক্তিভরে ডাকে, তখন ভগবান সেই ভক্তের নিকটে সরস্বতী বা বীণাপাণি রূপে দর্শন দেন; যখন দারিদ্র্যদুঃখে অবশ হইয়া ধনং দেহি বলিয়া ভক্ত সকাম প্রার্থনায় অনুরক্ত হয়, তখন ভগবান তাহার নিকটে লক্ষ্মী নারায়ণী হয়েন; এইরূপে কল্পপাদপ স্বরূপ ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দর্শন দিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিসংজ্ঞিত হয়েন। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নাম "ভাবগ্রাহী," সেই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভাব ও ভক্তির বিচারক; ব্যাকরণ বা বিদ্যাবত্তার বিচারক নহেন। ভক্ত যে ভাবে ও যে নামে ডাকে, ভাবগ্রাহী ও ভক্তবৎসল ভগবান সেই ভাবেই তাহা শ্রবণ করেন। সেই একই ভগবান——সেই একোহং পরব্রহ্ম——কংস জরাসন্ধের বিনাশ জন্য শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ বিনাশ জন্য শ্রীরামচন্দ্র, বলির পরীক্ষার জন্য বামণাবতার, হরি নাম বিলাইয়া জীবোদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরচন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েন। বস্তুতঃ যে যে ভাবেই ডাকুক না, ভক্তবৎসল ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ভক্তের সেই প্রকারেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্ত হনুমান প্রভু ভাবে, বিভীষণ সখাভাবে, রাবণ শত্রুভাবে, অহল্যা প্রাণদায়ক ভাবে, সীতা স্বামী ভাবে, লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভাবে, কৌশল্যা পুত্রভাবে, বশিষ্ঠ শিষ্য ভাবে, তুলসীদাস পরমেশ্বর

---

* বিভূতি বর্ণনাস্থলে ভগবৎগীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—"আমিই রাম এবং আমিই শিব"। তুলসীদাস গোস্বামী বলিতেন, রাম ও কৃষ্ণ কেবল মূর্খেরাই ভেদজ্ঞান করে।

ভাবে, গুহক অভিন্নহৃদয় ভাবে এবং অযোধ্যাবাসীরা রাজা ভাবে ভজনা করিয়াছিল, ইহারা সকলেই সেই অব্যয় ব্রহ্ম (শ্রীরাম) পদ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় অক্ষয়ানন্দ ভোগ করিয়াছেন। তাহাতেই বলিতেছি, শক্তিপূজায় শাক্তের এবং বিষ্ণুপূজায় বৈষ্ণবের উভয়েরই মুক্তি। ভগবান দেশ কাল-পাত্রের বশবর্ত্তী নহেন, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেনঃ—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং অধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজামহং।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুস্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সেই একই ভগবান কখনও শক্তিরূপে, কখনও ভক্তিরূপে, কখনই যোগীন্দ্ররূপে, কখনও মুনীন্দ্ররূপে, কখনও শিবরূপে, কখনও বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েন। ভগবানের অপার লীলা কে বুঝিতে পারে? একজন তত্ত্বদর্শী অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন, "Who can-penetrate into God's mind? He fulfils his mysterious ways in mysterious ways," অজ্ঞানী সে কথা জানে না, তাহারা ভগবানের অজরত্ব, অমরত্ব, অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব বুঝে না। অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা দিবার সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "হে অর্জ্জুন! আমি যে যোগবিদ্যা তোমাকে শিক্ষা দিলাম, অনেক বৎসর পূর্ব্বে তাহা সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলাম।" অর্জ্জুন বলিলেন "সে, কি কথা প্রভো! সূর্য্যদেবের জন্ম আপনার অনেক পূর্ব্বে হইয়াছিল, আপনি সূর্য্যদেবকে কেমনে যোগশিক্ষা দিলেন? ভগবান বলিলেনঃ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

ভগবান আরও বলিতেছেন, "যে অবিবেকী ব্যক্তি আমাকে কেবল বাসুদেব বলিয়াই জানে এবং কেবল ত্রেতা যুগেরই সমসাময়িক বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়ায়, সে ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না" তিনি আরও বলিতেছেন, (গীতা। ১৩ অ। ২২ শ্লোক) "আমিই ভক্তের ভাবানুসারে পরমপুরুষ, উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, পরমাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত হই।" বস্তুতঃ বেদে যিনি প্রণব, উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম, বেদান্তে যিনি পুরুষ, ভাগবতে যিনি বিষ্ণু, দর্শনে যিনি প্রকৃতি, ন্যায়ে যিনি ঈশ্বর, গীতায় যিনি ভগবান, তন্ত্রে যিনি শিব, পুরাণে যিনি আদ্যাশক্তি, ছন্দে যিনি বিরিঞ্চি, কাব্যে যিনি শব্দ, বিজ্ঞানে যিনি কারণ, বৈষ্ণবগ্রন্থে যিনি হরি, সেই একই ভগবান কখনও নর, কখনও বা নারী, কখনও পুরুষ, কখনও বা প্রকৃতি, কখনও শ্যাম, কখনও বা গৌররূপে আবির্ভূত!! সেই অনধিগম্য, অচিন্তনীয় ভগবানের অতুল লীলা কে বুঝিবে? তিনি শাক্তও বটেন আবার তিনি বৈষ্ণবও বটেন; তিনি কৃষ্ণও বটেন আবার তিনি কালীও বটেন। আয়াণ ঘোষের ঘরে কৃষ্ণ, কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা কি জান না? তবে কালী ও কৃষ্ণকে কেমন করিয়া ভিন্ন জ্ঞান কর? তবে শাক্ত ও বৈষ্ণবকে ভেদজ্ঞান (ভেদ চক্ষে) কেমন করিয়া দেখ? দেখিতেছ না, যে পতিতপাবনী গঙ্গা শাক্তের তীর্থ কাশীতলবাহিনী, সেই গঙ্গাই আবার বৈষ্ণবের তীর্থ নবদ্বীপের নীচে প্রবাহিতা। দেখিতেছ না, সেই একই গঙ্গা কালীঘাটে ও বিন্ধবাসিনীতে এবং সেই গঙ্গাই আবার শান্তিপুর, কাল্না এবং কাটোয়ায়! যে যমুনা নদী শ্যাম সলিল বক্ষে লইয়া বৈষ্ণবের মথুরা ও বৃন্দাবনের নীচে তালে তালে নাচিতেছে, সেই যমুনাই আবার শাক্তপ্রধান দিল্লী, আগ্রা ও এটোয়ায়

বিরাজিত!! তবে ভেদজ্ঞান কোথায়? রামায়ণে যিনি রাম, ভাগবতে তিনিই শ্যাম; মথুরায় যিনি কৃষ্ণ, আয়াণের ঘরে তিনিই কালী! সেই মধুর মধুর মধুর "কৃষ্ণকালী" নামের মাহাত্ম্য যদি বুঝিতে পার, সেই সুন্দর সুন্দর সুন্দর "কালীকৃষ্ণ" রূপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি রূপসাগরে ডুবিতে পার, তাহা হইলে তুমি সত্যই জীবন্মুক্ত পুরুষ; যদি এই মুর্ত্তির মধুরতা বুঝিয়া থাক, আইস, তোমার পবিত্র পদে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি।

"হৃদয় কুঞ্জরে, কে বিহরে, কালোকামিনী।
রূপেতে জগৎ আলো, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী॥
ঐ রূপ-সাগরে ডুব্‌লে পরে (দেখ্‌বে)
কমল মাঝে কমলিনী।
হৃদয় কুঞ্জরে, কে বিহরে, কালোকামিনী॥

শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েই পরস্পরের জাতিভেদ ও আচার লইয়া নিন্দা করে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে উভয়েরই আচার বা জাতি নাই। বৈষ্ণবতীর্থ জগন্নাথে (শ্রীক্ষেত্রে) জাতি বা আচার কোথায়? যবন হরিদাস, চণ্ডাল গুহক, পতিত জগাই মাধাই এবং মদ্যপায়ী মাংসাশী বহুতর সন্ন্যাসী কি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব হয় নাই? এখনও কি হইতেছে না? প্রকৃত বৈষ্ণবের জাতি কোথায়? এখনও মুর্গী-মারা, হোটেলে-খাওয়া বৈষ্ণবত্বের অভাব নাই! আর "ভৈরবীচক্রে" বসিলে শাক্তের জাতিভেদ বা আচার কোথায় থাকে? তাহাতেই বলিতেছি, উভয়েই অন্ধ, উভয়েই ভ্রান্ত!

হে বিশ্বাসী বৈষ্ণব! তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, তোমার শ্রীমতি মানময়ী রাধিকা "হ্লাদিনী শক্তি" রূপিণী! আর হে তার্কিক-

তান্ত্রিক বা শক্তিমান শাক্ত! তুমি কি এখনও বুঝিতে পার নাই যে, তোমার মহিষাসুরমর্দ্দিনী শ্রীমতি দুর্গা বা কালী পরমা বৈষ্ণবী! বাঙ্গালী বৈষ্ণবের আরাধ্য শ্রীচৈতন্য আর বাঙ্গালী শাক্তের আরাধ্য "শক্তি"; কিন্তু হে শাক্ত ও বৈষ্ণবমণ্ডলী! আপনারা কি জানেন না, শক্তি না হইলে চৈতন্য নাই এবং চৈতন্য না হইলে শক্তি নাই!! সুতরাং কৃষ্ণ ও কালীকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিবে? সুতরাং বৈষ্ণবত্বে ও শাক্তত্বে কেমনে ভেদজ্ঞানে বিচার করিতে আকাঙ্ক্ষা কর? গোবিন্দ অধিকারী বলিয়াছেন—

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
সারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ;
ন'ইলে শুধুই মদন।"

এখন বুঝিলে কি, বামে শক্তিরূপিণী রাধা না থাকিলে কৃষ্ণ আর "মদনমোহন" নামে আখ্যাত হইতে পারেন না, তাহা হইলে তিনি (রাধা বিহনে) "শুধুই মদন"।

শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
সারি বলে আমার রাধার তাহে শক্তি সঞ্চার ছিল ;
ন'ইলে পার্ব্বে কেন ?

দেখিলে, রাধা কেমন শক্তিরূপিণী!! বৈষ্ণবচূড়ামণি গোবিন্দ অধিকারী আরও বলিতেছেন—

"শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা,
সারি বলে আমার রাধার নামটি তাহে লেখা;
ন'ইলে সাজ্‌বে কেন ?"

আহা কি মধুর! কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব যুগল মিলন! কি

অপূর্ব্ব পুরুষ প্রকৃতির——কি অপূর্ব্ব শাক্ত ও বৈষ্ণবের—মহাসুন্দর মিলন! হে দ্বন্দ্বকারী ভাই! এখন বুঝিলে কি——

"প্রেম মাখা অপঘন, অপঘন প্রেম।
রাধা নহে শুধু রাধা, সুধা ভরা হেম॥"

হে নির্ব্বোধ! তুমি রাধা ছাড়িয়া কেমনে কৃষ্ণ ভজিতে চাও? তুমি বিষ্ণুকে ছাড়িয়া শক্তিকে এবং শক্তিকে ছাড়িয়া বিষ্ণুকে কেমনে ভজিতে চাও? ভক্তাধিক ভক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা গাহিয়াছিলেন, তাহা কখনও শুনিয়াছ কি? এই মধুর গীত একবার শুন।

গীত।

রামকেলি—— একতালা।

জাননারে মন, পরম কারণ
শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখনও কখনও পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া,
ময়ুর পুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী,
কখনও রামের জানকী হয়॥
জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখনও কখনও পুরুষ হয়। ১
হয়ে এলোকেশী, কর লয়ে অসি,
দানব চয়ে করে সভয়।

কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী,
ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয় ॥ ২
অযোধ্যাতে হন তিনি শ্রীরঘুরাম,
মথুরাতে হন তিনি নবঘনশ্যাম,
কামিখ্যাতে হন তিনি পুষ্পধনুকাম,
কভু কৈলাসেতে শিব হয়।
বৃন্দাবনে হন তিনি বনমালী,
আয়ানের ঘরে হন কৃষ্ণ-কালী,
নদীয়াতে আসি হরি হরি বলি,
গৌরাঙ্গ নামেতে বিখ্যাত হয় ॥ ৩
জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখনও কখনও পুরুষ হয়। ৪
কখনও পুরুষ, কখনও প্রকৃতি,
কখনও প্রকৃতি, কখন পুরুষব্রতী,
অপূর্ব্ব তাঁহার ঐশীক রীতি,
মানবের বুঝা সহজ নয় ॥
কখনও বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত,
কখনও সৌর, কখনও গাণপত্য,
কে বুঝিবে তাহার মহত্ত্ব তত্ত্ব,
মূর্খেতে কেবল প্রভেদ কয় ॥ ৫
জাননারে মন, পরম কারণ,
শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।

সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ,
কখনও কখনও পুরুষ হয়।
যেরূপে যে জন, করয়ে ভজন,
সেইরূপে তাহার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদি-সরোবরে
কমল মাঝে হয় কমল উদয়॥ ৬

হে শাক্ত ও হে বৈষ্ণব ভ্রাতৃবৃন্দ! এখন বুঝিতে পারিলে কি যে, তোমরা উভয়েরই ভ্রান্তি-সাগরে নিমগ্ন! গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যেমন পবিত্র প্রয়াগ তীর্থের উৎপত্তি, বরুণী ও অসী নদীর সম্মিলনে যেমন বারাণসীর সৃষ্টি, কৃষ্ণা ও কাবেরীর মিলনে যেমন ভবানী তীর্থের উৎপত্তি, আইস, সেইরূপ আজি শাক্ত ও বৈষ্ণবের "কৃষ্ণ-কালী তীর্থের" সৃষ্টি করি। ইহারই নাম যুগল মিলন, ইহাই প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন, ইহাই শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন, ইহাই শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চির মিলন, ইহাই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন এবং ইহাই শাক্তের সহিত বৈষ্ণবের সম্মিলন। এই সম্মিলন কি সুখকর, কি সুন্দর, কি শাশ্বত, কি মধুর, কি মধুর!!

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"ব্রহ্ম" শব্দ তত্ত্ব।

(গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন)।

শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া গুরু বলিলেন, "হে বৎস! ঐ যে সুবিশাল সুরম্য প্রান্তরমধ্যস্থিত অভ্রভেদী অত্যুচ্চ অশ্বত্থ মহীরুহকে দর্শন করিয়া পুলকিত চিত্তে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অনধিগম্য মহিমা কীর্ত্তন করিতেছ, যাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডময়ূখমালা-বিদগ্ধ পরিশ্রান্ত পথিক শান্তিলাভ করিতেছে, যাহার সুকোমল পল্লবাচ্ছাদিত শাখার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপবেশন করিয়া বিবিধ বিমান-বিহারী বিহঙ্গবর্গ বিনোদ কাকলী লহরী-দ্বারা দিক্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে, বল দেখি, ঐ অত্যুচ্চ অশ্বত্থমহীরুহের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত কোথায়? ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর এবং ক্ষুদ্রতর হইতে ক্ষুদ্রতম একটি সামান্য সর্ষপ সমান বীজ এই প্রকাণ্ড তরুবরের জন্মদাতা। উদ্ভিদজগৎ হইতে নয়নদ্বয় প্রত্যাহার করিয়া যদি পৃথিবীর ধর্ম্মেতিহাসক্ষেত্রেরদিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শী প্রভৃতি জগতের সমুদয় সভ্য জাতির বিস্তৃত ধর্ম্মতত্ত্ব (Theology), ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ধর্ম্মবিজ্ঞান, একটি ক্ষুদ্র শব্দের মধ্যে নিহিত——ঐ ক্ষুদ্র শব্দের নাম "ব্রহ্ম"। এই ব্রহ্মশব্দরূপ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতর অবস্থায় ধর্ম্ম-মহীরুহের উৎপাদন করিয়াছে, এই শব্দ কি মধুর! কি শাশ্বত!"

শিষ্য কহিল, "প্রভো! তবে আসুন, আজি আমরা এই মহাপ্রয়োজনীয় শব্দের কিছু আলোচনা করি।"

গুরু। বৎস! আমি স্বীকার করি, তুমি ব্রহ্মে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস

কর। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে, ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা হয় না, নাস্তিকের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করা আর অনর্থক সময় নষ্ট করা একই কথা। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, সে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার অনুপযুক্ত। ধর্ম্মকথা জানিতে, বুঝিতে, শুনিতে বা শিখিতে হইলে প্রথমে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তাহার পরে অসূয়া, অশ্রদ্ধা, অভক্তি, অবিনয় প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া গুরু বা সদুপদেশক বা তত্ত্বজ্ঞানী সাধুর নিকটে আসিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে হয়। শুনিতে আসিবার সময় মনে মনে ভাবা উচিত, আমি শিখাইতে যাইতেছি না, আমি শিখিতে যাইতেছি। বিদ্যার্থী বালকের ন্যায় উপদেশকের নিকট বিনীত ও নিরহঙ্কার ভাবে আসা উচিত। যাহারা কেবল সময়ক্ষেপ জন্য অথবা তর্ক, তামাসা, খোসগল্প, পরীক্ষা, অহঙ্কার, আত্মাভিমান, আত্মম্ভরীতা কিম্বা স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি প্রদর্শন জন্য উপদেশ শুনিতে আইসে, তাহাদের ধর্ম্মকথায় উপকার হয় না, এবং তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মকথার আলোচনা করাও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। উপদেশকের অবকাশ এবং শরীর ও মনের অবস্থার দিকেও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ধর্ম্মকথা যত একান্তচিত্তে এবং গোপনে হয়, ততই ভাল। আমি জানি, ঈশ্বরে, গুরুপদে, স্বধর্ম্মে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে তোমার ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, আমি ইহাও জানি, তুমি প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু, এই জন্য আমি তোমাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে ইচ্ছা করি।

শিষ্য। প্রভো! ধর্ম্মকথা শুনিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস কি নিতান্ত আবশ্যক?

গুরু। নিতান্তই আবশ্যক। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজ বপিত হইলে তাহা কি কখনও অঙ্কুরিত হয়? নাস্তিক ও অবিশ্বাসীর সহিত কি ধর্ম্মচর্চ্চা চলে? বনের ভিতর মুক্তা ছড়াইলে কিম্বা গর্দ্দভের সম্মুখে

হীরক রাখিলে ফল কি? "ঈশ্বর আছেন কি না আছেন," এই প্রশ্নের —এই সন্দেহ—যাহাদের এখনও মীমাংসা হয় নাই, তাহারা ধর্ম্মতত্ত্বের এখনও ক, খ শিক্ষা করে নাই। দুগ্ধপোষ্য শিশুর সহিত কি কথোপ-কথন চলে? জন্মবধিরের নিকটে সুমধুর সংগীত করিলে ফল কি? বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'——এই কথা সদত স্মরণ রাখিও। বিশ্বাসই সৃষ্টিরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। খৃষ্টানেরাও সে কথা বলেন। সাধু পল (St. Paul) বলিয়াছেন, He who wisheth to come to God must believe that He is অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে, এইটি বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আছেন। কোরাণের প্রথম আয়েৎ (শ্লোক) এই——

"আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহো রব্‌ উল্‌ আল্‌মীণ"

অর্থাৎ ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বসংসারের প্রভু। এই বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তবে কোরাণ সংগৃহীত হয়। বাইবেলের প্রথম শ্লোক শ্রবণ কর——

In the beginning God created the heaven and the earth.

"আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃজন করিলেন।" বুঝিতে পারিলে কি, বাইবেলের প্রথম শ্লোকেই ঈশ্বরকে জগৎস্রষ্টা বলিয়া বিশ্বাস করা হইল। বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণবাদী, শূন্যবাদী, কিন্তু তাহাদেরও গ্রন্থ সমূহের সর্ব্বপ্রথম সূত্র ও নীতি শ্রবণ কর,——

অহং বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

অহং ধম্মম্ শরণং গচ্ছামি

অহং সংঘম্ শরণং গচ্ছামি

অগ্নি-উপাসক পার্শীদিগের সকল শাস্ত্রেরই মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি

এই——"অহ্‌রউ মজিদ্দ্‌জাবা" অর্থাৎ সেই সর্ব্বগুরুর গুরু স্বরূপ অহর্ম্ম্য মজিদ (ঈশ্বরকে) জয়যুক্ত বিশ্বাস করিয়া বশ্যতা স্বীকার করি। তাহার পরে, পৃথিবীর সর্ব্বপুরাতন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাধিক পবিত্র ও সনাতন ঋকবেদের প্রথম শ্লোক শ্রবণ কর———

"অগ্নি মীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং।
হোতারং রত্ন ধাতমং॥"

অর্থাৎ অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক এবং প্রভূত রত্নধারী, আমি অগ্নির স্তুতি করি।

দেখিলে, প্রথম শ্লোকেই ঋষিরা ঈশ্বরের কেমন স্তব করিয়াছেন?

শিষ্য। প্রভো! ইহাত অগ্নির স্তব, ইহাতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর শব্দ কোথায়? আজি কালি যাহারা বেদের আলোচনা বা অনুবাদ করিতেছে, তাহারা বলে, বেদের ঋষিরা জল, স্থল, অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির পূজা করিত।

গুরু। বৎস! কেবল মূর্খেরাই বলে, বৈদিক ঋষিদিগের ব্রহ্মজ্ঞান (ঈশ্বরজ্ঞান) ছিল না। কেবল অবিবেকী ও ভ্রান্তজনেরাই বলে, বেদের সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না। তোমাকে বেদের যে শ্লোক শুনাইলাম, ইহাতে বিভাবসু মধ্যস্থিত মহাজ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনাই বুঝাইতেছে, কিন্তু তোমাকে আরও পরিষ্কার করিয়া কয়েকটি বৈদিক শ্লোক শুনাইতেছি, তদ্যথা—

গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং
গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চ রথাং।
আদ্রৌ চিদস্মা অংতর্দুরোণে
বিশাং ন বিশ্বো অমৃতস্বাধীঃ॥ ১

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব
সংপ্রশ্নং ভুবনা যংতানা॥ ২

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষ্যং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৩
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৪
যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৫

অর্থঃ—"যে অগ্নি (মহাতেজ) জলের মধ্যে, বনের মধ্যে, স্থাবর পদার্থের মধ্যে, জঙ্গমের মধ্যে, যজ্ঞগৃহে, পর্ব্বতের উপর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তিনিই সকলের নিকট হব্যগ্রহণ করেন, তিনি প্রজাবৎসল রাজার ন্যায় হিতকারী, তিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, বিধাতা, তিনি একেশ্বর, তিনিই সমগ্র ভুবনের জিজ্ঞাস্য এবং তিনিই এক হইয়াও অনেক দেবতার নামে উপাহিত। তিনি জীবাত্মা ও বল দিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা সকলে মান্য করে, তিনি অমৃত স্বরূপ, তিনি সকলের প্রভু, তিনি স্রষ্টা, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার পূজা করিব?".

দেখিলে, ইহাতে পিতা, বিধাতা, ঈশ্বর, স্রষ্টা, জীবাত্মা, প্রভু প্রভৃতির কেমন পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে।

শিষ্য। প্রভো! এখন নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, বেদই ব্রহ্মজ্ঞানের আকর। তাহার পরে যাহা বলিতে হয় বলুন।

গুরু। বৎস! এইবারে তোমাকে "ব্রহ্ম" (ঈশ্বর) শব্দের বৈয়াকরণিক ব্যুৎপত্তি শুনাইতে ইচ্ছা করি। "ব্রহ্ম" শব্দ (পুংলিঙ্গ) বৃন্হ ধাতুর উত্তর, কর্ত্তৃবাচ্যে, মন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ হইয়াছে। ই কারে ন কারের লোপ হয়। পাণিনি বলিয়াছেন, বৃহি——বৃদ্ধৌ। অর্থাৎ বৃহি শব্দ বৃদ্ধি অর্থবাচক।

শিষ্য। মহানুভব! বৃদ্ধি শব্দের ব্যুৎপত্তি কি?

গুরু। বৃ ধাতু ভাবে ক্তি। বৃদ্ধি শব্দের অনেক অর্থ. সাধারণ অর্থে অভ্যুদয়, আধিক্য, বিস্তার প্রভৃতি বুঝায়।

শিষ্য। মহোদয়! এই মহা প্রয়োজনীয় শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা বিস্তৃত ব্যাখ্যাই ভাল।

গুরু। পুত্র! দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে দুগ্ধই উপযুক্ত; যাহার দাঁত আছে, তাহার পক্ষে ইক্ষু খাওয়া সহজ। যাহা হাতীর খাদ্য, তাহা মানুষের খাদ্য নহে; যাহা বৃদ্ধের আহার্য্য,তাহা বালকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। তোমার বয়স, শিক্ষা, জ্ঞান, মনোবৃত্তি, প্রকৃতি প্রভৃতি বুঝিয়া তোমাকে ধর্ম্মকথা শুনাইব; তুমি যতটুকু শুনিবার উপযুক্ত, যতটুকু শুনিয়া তুমি শিখিতে, বুঝিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, ততটুকুই তুমি শুনিতে পাইবে, তাহার অধিক শুনাইব না বা বুঝাইব না। আজিকালিকার অব্যবস্থচিত্ত লোকেরা "মুক্তি ফৌজের" (Salvation Army) খৃষ্টানদের ন্যায় এক ঘণ্টাতেই মুক্তি (Salvation) প্রার্থনা করে! আজকালিকার বাবুরা অর্দ্ধ ঘণ্টায় ব্রহ্মজ্ঞানী এবং অর্দ্ধ ঘণ্টায় ঈশ্বরদর্শী হইতে চায়! সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত সাধু তাহাদের সংশ্রবে ধর্ম্মকথার প্রায়ই আন্দোলন করেন না। ধর্ম্মকথার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেও তাঁহারা প্রায়ই চুপ করিয়া থাকেন অথবা বিরক্তি-সূচক অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এইজন্য বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত

শ্রীমৎ পশুপতি রাও বহুবর্ষকাল ব্যাপিয়া সন্ন্যাসী রামদাস বাবার সেবা করিয়াও "কৃষ্ণ" শব্দের অর্থ শুনিতে পান নাই, এইজন্য ব্রহ্ম-দর্শিনী মীরাবাইএর দ্বাদশবর্ষ কাল সেবা করিয়াও রাজপুত রমণীরা তাঁহার মুখে রাম নাম শুনে নাই। সাধু মহোদয়দিগের অপার লীলা! তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়া কি সহজ কথা? তুমি তাঁহাদিগকে চিনিতে পার না। কিন্তু তোমাকে তাঁহারা চিনিয়া লয়েন। তোমার শিক্ষা ও বুদ্ধির দোষে সাধু ও মহাত্মাদিগকে প্রকৃত রূপে চিনিতে না পারিয়া তুমি হয় ত কাহাকে পাগল, কাহাকে অজ্ঞানী, কাহাকে মাতাল, কাহাকে কপটী প্রভৃতি স্থির করিয়া রাখিয়াছ! সাধু চিনা কি সহজ কথা? তন্ত্রে লিখিত আছে, "নানা ভেক ধরে কৌল"; মুসলমান শাস্ত্রে আছে, "নানা বেশে রমে মৌলা"; ভক্ত তুলসীদাস লিখিয়াছেন, "কোন্ জানে কেয়া ভেক্‌মে নারায়ণ মিল যায়"। বাইবেলে সাধু পল বলিয়াছেন, "Entertain strangers, for by so doing many have entertained angles unawares" সাধু না হইলে কি সাধু চিনিতে পার? মণিকার না হইলে মণি চিনিবে কেমনে? যাহা হউক, বৎস! তুমি বিবেকী ও বিশ্বাসী, বিশেষতঃ ধর্ম্মবীজ তোমার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছে, এজন্য আমি তোমাকে ভাল করিয়াই সকল কথা বুঝাইয়া বলিব।

শিষ্য। মহানুভব! আমি ধন্য হইলাম। আপনি যাহা শুনাইবেন, তাহাই অমৃত তুল্য গ্রহণীয় হইবে। অদ্য প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি, কল্য আসিয়া আবার শুনিব।

গুরু। বৎস! আর একটি প্রয়োজনীয় কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। ঠিক সায়ংকালে, ঠিক অরুণোদয় কালে, গ্রীষ্ম ঋতুর প্রচণ্ড মধ্যাহ্নে, পিপাসিত বা ক্ষুধিত অবস্থায়, মনের চঞ্চলতায়, অত্যন্ত শীত বা বৃষ্টি

বা ঝড়ের সময়ে, মত্তাবস্থায়, যানারোহণে, অপবিত্র স্থানে, কোলাহলে, ধর্ম্মকথার প্রসঙ্গ করিও না এবং শুনিও না।

শিষ্য। গুরো! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু আজিকালি দেখিতে পাই, অনেকে বড় বড় প্রকাশ্য সভা করিয়া লেক্‌চর (ধর্ম্মোপদেশ) দেয়, আবার শ্রোতারা খুব কোলাহল করিয়া হাততালি দিয়া থাকে।

গুরু। লেক্‌চরে (বক্তৃতায়) কখনও প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা বা ধর্ম্মব্যাখ্যা হয় না। তথাপি ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যকতা আছে। লেফফা দোরস্ত উপদেশ (Prayers) বা লেফফা দোরস্ত প্রার্থনায় (Sermon) লেফফা দোরস্ত ধর্ম্মেরই আলোচনা হয়, প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা বনে, মনে ও কোণে হইয়া থাকে। মুর্গী খাইয়া বেদ পড়িলে যেমন সে বেদ কেহ শুনে না, অব্রাহ্মণের মুখে বেদ পঠিত হইলে সে বেদ শ্রবণে যেমন কাহারও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় না, হ্যাট্‌ কোট্‌ পরিয়া, চুরট মুখে দিয়া, টেবিলের উপরে সবুট পদ ছড়াইয়া দিয়া ভাগবৎ শুনাইলে কোনও বৈষ্ণবই যেমন সেই ভাগবত শুনিতে চায় না, তেমনি আজিকালিকার লেক্‌চর শুনিয়া প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না এবং প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানী এরূপ লোকের নিকট বা এরূপ সভায় যাইতে স্বীকৃতও হন না। অহিন্দুগণ, সমাজের বৈরীগণ এবং হিন্দুধর্ম্মত্যাগীগণ কখন কখন সভা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম শিখাইবার ভাণ করে, তুমি সে সভায় যাইও না; ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে ইহাদের সহিত সম্পর্ক যত কম রাখা যায়, ততই ভাল। ইহারা হিন্দুধর্ম্ম-শিখাইতে আসিলে বলিও হিন্দুধর্ম্মে তাহাদের অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যকতা নাই, তাহারা নিজের ধর্ম্ম লইয়াই যেন সন্তুষ্ট থাকে, অপরের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাহাদের মুখবন্ধ করাই ভাল। এ

বিষয়ে কোরাণের শেষে মহম্মদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা অত্যন্ত প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন, "তোমার ধর্ম্ম তোমার নিকটে ভাল, আমার ধর্ম্ম আমার নিকটে ভাল, তুমি তোমার ধর্ম্ম যাজন কর, আমি আমার ধর্ম্ম যাজন করি।" বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে ও শান্তিতে থাক; ধর্ম্মে তোমার মতি হউক, তুমি দীর্ঘ-জীবি হও। অদ্য তোমাকে ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি তত্ত্ব শুনাইয়াছি, কল্য ব্রহ্মশব্দের অর্থতত্ত্ব শুনাইব।

* * *

দ্বিতীয় দিবস।

গুরু। বৎস! পাণিনির মতে, বৃদ্ধি শব্দই ব্রহ্মপদের অর্থ। বৃদ্ধি অর্থে সাধারণতঃ অভ্যুদয়, আধিক্য, বিস্তার প্রভৃতি বুঝায়। তুমি ইংরাজি শিখিয়াছ, এজন্য কোন কোন কথা ইংরাজীতে বুঝাইব, তাহা হইলে তোমার বুঝিবার পক্ষে উপায়টা সহজ হইতে পারে। "অভ্যুদয়" শব্দের অর্থ প্রকাশ, খৃষ্টানেরা ইহাকে Glorious Manifestation অথবা Glory and wisdom বলে; বাইবেলে সাধু পল লিখিয়াছেন, Christ is the express image and effulgence of God's person; Christ is the wisdom of God. বাইবেলের পুরাতন টেশ্‌টামেণ্ট্‌ গ্রন্থে লিখিত আছে, The Creation is the glory of God. এখানে এই সকল শব্দ প্রকাশ বা অভ্যুদয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুসলমান শাস্ত্রে এই অভ্যুদয়ের নাম জেলাল, হিব্রু ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ সেকিনা এবং পুরাণে ইহার নাম চিৎশক্তি। আধিক্য শব্দের অর্থ অপরিসীমা বা অনন্তত্ব, ইংরাজি বিজ্ঞানে ইহা Complete developement বা Perfection নামে অভিহিত; আরব্য ভাষায়

ইহার নাম য়েন্‌তেহা এবং পারস্য ভাষায় ইহাকে কামালিয়ৎ কহে। বিস্তার শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপীত্ব, ইউরোপীয় দর্শনে ইহাকে Absolute Possession কহে, পারস্য ভাষায় ইহার নাম হাজির্‌-উল্‌-নাজিরী এবং ল্যাটিন ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ Omnipresence. তাহার পরে বৃদ্ধি শব্দের প্রকট অর্থ শ্রবণ কর। যাঁহার ক্ষয় নাই (অক্ষয়), যাঁহার বয়স সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, যাহার হ্রাস হয় না এবং যাঁহার ক্ষমতা, গুণ, স্থিতি প্রভৃতির যতই বর্ণনা কর, বর্ণনার শেষ হয় না, তিনিই প্রকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থাৎ "বৃদ্ধ"। অন্নদামঙ্গলে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় শিবের (ঈশ্বরের) বর্ণনায় বলিয়াছেন—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার, কপালে আগুণ॥

এই কবিতার "অতি বড় বৃদ্ধ" এই তিন শব্দে, ঈশ্বরের অনাদিত্ব প্রমাণীত হইতেছে, ঈশ্বরাপেক্ষা কাহারও বয়স অধিকতর হইতে পারে কি? এই জন্য তিনি সয়ম্ভু নামে অভিহিত, অর্থাৎ তাঁহার জন্মদাতা কেহ নাই, তিনি স্বয়ং সিদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও প্রধান। তাহার পরে, বৃদ্ধি শব্দের গূঢ় (esoteric) অর্থ শ্রবণ কর। ঐ কবিতায় "সিদ্ধিতে নিপুণ" পাঠ করিয়াছ, ঐ সিদ্ধি শব্দই বৃদ্ধি শব্দের গূঢ় অর্থ। সিদ্ধি শব্দের সাধারণ (বাঙ্গালা) অর্থ ভাং (নেশার দ্রব্য); মধ্যম অর্থে সফলতা বুঝায় এবং পরিণাম বা গূঢ় অর্থে যাহা বুঝায়, তাহাই এখন ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইব। বৃদ্ধি শব্দে "সিদ্ধি, ঋদ্ধি এবং একাদশ যোগ" ইহা বুঝায় বৎস! কথাগুলি বুঝিতেছত?

শিষ্য। প্রভো! আপনার কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি।

গুরু। তুমি যে বুঝিতে পারিবে তাহা জানি, কারণ তোমার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে ধর্ম্মকথা শুনিবার কেহই

উপযুক্ত হয় না। এই জন্য বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র এই. "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হওয়ার পরে ব্রহ্মকথার প্রসঙ্গ করিবে। স্থূলতঃ প্রগাঢ় বিশ্বাসই চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপাদান।

শিষ্য। মহানুভব! ব্রহ্মশব্দার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা বলুন।

গুরু। বৃদ্ধি অর্থে সিদ্ধি ঋদ্ধি এবং একাদশ যোগ। ঋদ্ধি শব্দ বেদে আছে। ইহা বৈদিক শব্দ, পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণিকেরা ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু নিরুক্তকারেরা ইহার আরও পরিষ্কার অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছেন। সে কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে সিদ্ধি ও ঋদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা তোমার বুঝা আবশ্যক। একাদশ যোগের বিবরণ এক্ষণে শুনিবার আবশ্যক নাই। সে কথার সহিত বর্ত্তমান প্রসঙ্গের সম্পর্ক আপাততঃ অধিক নাই, বিশেষতঃ একাদশ যোগের ফল, সিদ্ধি ও ঋদ্ধি মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিদ্ধি শব্দের যাহা অর্থ তাহা শুন। সিদ্ধি অষ্ট প্রকার। সাধনায় মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সিদ্ধপুরুষ বলা যায়।

শিষ্য। প্রভো। সাধনা করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন হয় কি না?

গুরু। অবশ্য প্রয়োজন হয়; এই জন্যই সাধকের দীর্ঘজীবী হওয়া আবশ্যক, এই জন্যই শরীর রক্ষা করা পরম ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্যলাভ পরম সুখ।

এই জন্য যোগীরা যোগ করেন, এই জন্য চিকিৎসকেরা ঔষধের আবিষ্কার ও ব্যবস্থা করেন, এইজন্য শরীর-বিজ্ঞানবিদেরা (Anatomists) মানব শরীরের অভ্যন্তরে নাড়ী, শিরা, যন্ত্র প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করতঃ দেহের পুষ্টি জন্য নানা উপায়ের উদ্ভাবনা

করিয়া দেন এবং এইজন্য দেবাধিদেব মহাদেব ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না প্রভৃতি নাড়ীর প্রকৃতি বুঝিয়া, রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতি দ্বারা দেহস্থিত বায়ুর শোধন বিষয়ে তন্ত্রশাস্ত্রে অনেক গুহ্য কথার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এই দীর্ঘজীবন লাভের নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "হে অর্জ্জুন! তুমি যোগাভ্যাস কর, তুমি যোগী হও।"

শিষ্য। মহানুভব! অতঃপর ঋদ্ধি ও সিদ্ধির কথা বলুন।

গুরু। বৎস! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিদ্ধি অষ্ট প্রকার, তদ্যথা—(১) অণিমা (২) লঘিমা (৩) প্রাপ্তি (৪) প্রাক্রম্য (৫) মহিমা (৬) ঈশীত্ব (৭) বশীত্ব এবং (৮) কামাবসায়িত্ব। এখন অর্থ শ্রবণ কর। যে সিদ্ধি দ্বারা দেহকে অণু (সূক্ষ্ম বা ছোট) করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহার নাম অণিমা, যাহা দ্বারা দেহকে লঘু করা যায়, তাহা লঘিমা, যাহা দ্বারা ইচ্ছামত পদার্থ মাত্রকে হস্তগত করা যায়, তাহাই প্রাপ্তি, যাহার দ্বারা সমগ্র বিশ্বসংসার পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা প্রাক্রম্য, যাহা দ্বারা দর্শন মাত্রেই দৃষ্টজীবের শক্তি, গুণ বা দোষ প্রত্যাহার করা যায়, তাহাই মহিমা, ঈশীত্ব অর্থে সকল প্রকার পদার্থের উপর প্রভুত্ব, বশীত্ব অর্থে বশীভূত করার শক্তি এবং কামাবসায়িত্ব অর্থে ইন্দ্রিয় সমূহকে সঙ্কীর্ণ বা প্রকীর্ণ করিবার সামর্থ্য। ইহাই প্রধান অর্থ, গৌণ অর্থ আরও পরে শুনাইব। ঋদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থ ঔষধ বিশেষ। চিকিৎসাশাস্ত্রে (সুশ্রুতে) ইহা জীবনীয় ও বৃংহনীয়বর্গের অন্যতম, কিন্তু ইহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য; মধ্যম অর্থে সংগীতের 'নি' সুরের অন্তর্ভুক্তি (অতি কোমল সুর) বুঝায়, এবং আধ্যাত্মিক অর্থে বিভব, ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি, উত্তম গুণাবলী পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। ঋধ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয়ে ঋদ্ধি শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

শিষ্য। মহানুভব! এক্ষণে এই কথা গুলি আরও বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু আর একটা নিবেদন আছে। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, বাকসিদ্ধি, ভূতসিদ্ধি প্রভৃতি আছে, তাহা ত বলিলেন না?

গুরু। তাহা ইহারই অন্তর্গত। ব্যাখ্যার সময়ে তাহা বুঝিতে পারিবে। আমি প্রথম দিনে তোমাকে ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি তত্ত্ব শুনাইয়াছি, অদ্য (দ্বিতীয় দিবসে) অর্থ তত্ত্ব শুনাইলাম, তৃতীয় দিবসে ব্যাখ্যা তত্ত্ব শুনাইব, চতুর্থ দিবসে প্রমাদতত্ত্ব শুনাইব এবং পঞ্চম দিবসে বিচার তত্ত্ব বুঝাইব।

শিষ্য। ব্যাখ্যা তত্ত্ব ও প্রমাদ তত্ত্ব কাহাকে বলে? আর বিচার তত্ত্বটাই বা কি?

গুরু। বৎস! ঋদ্ধি ও সিদ্ধির প্রত্যেক অংশ দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং তৎসহ শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করার নাম ব্যাখ্যা। ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ করিতে অনেকে জানে না, এই শব্দ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রমাত্মক ধারণা আছে। তাহার সংশোধন করাই প্রমাদ তত্ত্বের উদ্দেশ্য। বিচার তত্ত্বটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এই তত্ত্বে ব্রহ্ম শব্দের পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষ ধরিয়া বিচার করতঃ এই শব্দের সহিত জগতের সমুদয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের সম্পর্ক বুঝাইব, তৎসঙ্গে আরও অনেক নূতন কথা শুনিতে পাইবে। আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, প্রবল শীতল বায়ু বহিতেছে, বোধ হয় বৃষ্টি হইবে, তুমি শীঘ্র ঘরে যাও।

তৃতীয় দিবস।

গুরু কহিলেন "বৎস! গত কল্য আমি তোমাকে অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে যাহা শুনাইয়াছি, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। তোমার যদি কিছু সংশয় থাকে, এক্ষণে বলিতে পার।"

শিষ্য।—প্রভো! আপনি প্রথম দুই দিবস যাহা শুনাইয়াছেন, তাহাতে তিনটি তত্ত্ব স্থির করিয়াছি—১ম, সাধনার আবশ্যকতা আছে, ২য়, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়, ৩য়, অষ্ট প্রকারে "সিদ্ধ" হইলে অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ঈশীত্ব প্রভৃতি ফল বা গুণ অথবা ক্ষমতা প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ইহাতে আমার মনে অনেক সন্দেহের উদয় হইয়াছে; সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না, যদি ইহাই প্রতিজ্ঞা হয়, তাহা হইলে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কি সাধনা করিতে হইয়াছিল? তিনি যদি সাধন করিয়া থাকেন, তবে কবে, কোথায় এবং কেমনে সাধন করিয়াছিলেন? শাস্ত্রে কি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়? অষ্টসিদ্ধি লাভ না হইলে যদি অনিমা লঘিমাদি ক্ষমতার উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, প্রথমে সাধন দ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ এবং তৎপরে ঐ সকল ক্ষমতা ঈশ্বরের করায়ত্ব হইয়াছে।

গুরু।—আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের অপর নাম স্বয়ম্ভু; ভগবান স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাঁহার সাধনা বা সিদ্ধির প্রয়োজন নাই। সাধনার কথা মানুষের পক্ষে খাটে ঈশ্বরের পক্ষে খাটে না।

শিষ্য।—সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়, যদি ইহাই স্থির মীমাংসা, তাহা হইলে আমি সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি কি না?

গুরু। যদি প্রকৃত সাধনা হয়, তাহা হইলে অবশ্য পার।

শিষ্য। তাহার পরে আর এক কথা; যদি পারি, তাহা হইলে অষ্টসিদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে সক্ষম কি না?

গুরু।—সম্পূর্ণ সাধনায় তাহাও সুলভ।

শিষ্য।—ভাল, যদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইল, তাহা হইলে অনিমা লঘিমাদি শক্তি জন্মিবে কি না?

গুরু।—অবশ্য জন্মিবে।

শিষ্য।—তবে এখন বুঝিলাম,সাধনায় আমি ঈশ্বরও হইতে পারি; কারণ ঈশ্বরের যে সকল ক্ষমতা ও গুণ আছে, তাহা যদি সাধনা দ্বারা লাভ করিতে আমি সক্ষম হই, তাহা হইলে ঈশ্বরে ও আমাতে প্রভেদ কোথায়? মনে করুন, আমি একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং আমার প্রধান শিক্ষক একজন সুশিক্ষিত এম, এ, উপাধিধারী ব্যক্তি; আমি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিলাম, তদনন্তর এনট্রান্স, এফ্ এ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, তাহার পরে যদি এম,এ, পরীক্ষা পাশ করি, তাহা হইলে আমার প্রধান শিক্ষকের ন্যায় আমিও কি এম, এ বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইব না? অষ্টসিদ্ধি বলে ঈশ্বর যাহা করিতে পারেন, অষ্টসিদ্ধি দ্বারা লব্ধ ক্ষমতাবলী দ্বারা আমিও যদি ঠিক তাহাই করিতে সমর্থ হই,তবে আমাকে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বলিবেন না কেন?

গুরু।—কি ভ্রম! তাহা হইলেও তুমি ঈশ্বর নহ। মানুষে ঈশ্বর হইতে পারে না এবং ঈশ্বরও মানুষ নহেন।

শিষ্য।—তবে সাধনার প্রয়োজন কি?

গুরু।—তুমি ব্রহ্ম হইতে পার না, এ কথা সত্য; কিন্তু ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পার।

শিষ্য।—সে আবার কি কথা! কিছুই বুঝিলাম না।

গুরু।—বৎস! মানুষ ঈশ্বর নহেন এবং ঈশ্বরও মানুষ নহেন। মানুষকে ঈশ্বর বুঝা অত্যন্ত ভ্রম, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে অর্থে শিবোহং শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহা বুঝে না। দর্শন শাস্ত্রাদিতে প্রত্যেক জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া যে ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, অনেকে তাহার অর্থ জানে না। বস্তুতঃ মানুষ ব্রহ্ম নহে, মানুষকে ব্রহ্ম বলা অমার্জ্জনীয় অপরাধ—Downright blasphemy!

শিষ্য।—তবে কিরূপ বুঝিব?

গুরু।—বৎস! মহাসাগর হইতে কিঞ্চিৎ জল স্বতন্ত্র করিয়া অঞ্জলি মধ্যে রাখিলে, অঞ্জলির জলকে সাগরের জল বলা যায়, কিন্তু অঞ্জলি বা জলকে সাগর বলা যায় না। কিন্তু ঐ জল যখন সাগরে ফেলিয়া দাও, তখন তাহা সাগর বলিয়াই গণ্য হয়, অর্থাৎ সতন্ত্র সত্বাজ্ঞানের নাশ হইলেই ব্রহ্মত্ব আসিয়া পড়ে, শাস্ত্রে এই অবস্থার নাম নিরুপাধিক অবস্থা। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সাগর হইতে যতদিন বিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিনই গঙ্গা ও যমুনা উপাধি ধারণ করে, সাগরে গিয়া মিশিলে গঙ্গা ও যমুনা নাম থাকে না। তথায় একটি মাত্র নাম হয়—মহাসাগর!

শিষ্য।—মহানুভব! নিরুপাধিক অবস্থায় উপনীত হইলে কি প্রাপ্ত হওয়া যায়?

গুরু।—যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহা এই, প্রথমে সালোক্য, তৎপরে (আরও ক্রমোন্নতি দ্বারা) সারূপ্য এবং তদনন্তর সাযুজ্য; অর্থাৎ ধ্রুব-লোক, বিষ্ণুলোক, দেবলোক, ভবলোক প্রভৃতি স্বর্গীয় রাজ্যে উপনীত হইয়া অমৃতাস্বাদী হইতে পারিবে। ইহাকে খৃষ্টানেরা Paradise বা Kingdom of God বলেন; মুসলমানদিগের নিকটে ইহা "বেহেস্তা" বলিয়া কথিত হয় এবং য়িহুদীয়া ইহাকে "কব্-উর্ব্বা" কহেন। তাহার পরের অবস্থার নাম সারূপ্য অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ আনন্দময় মূর্ত্তির জ্যোতির্ম্ময় চিৎশক্তিতে প্রতিভাসিত হওয়ার নাম সারূপ্য অবস্থা এবং সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে তন্ময় হইয়া যাওয়ার নাম সাযুজ্য অবস্থা, যাহাকে গীতায়

"সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥"

কহা গিয়াছে; ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, অব্যভিচরিত ভক্তি-

যোগের দ্বারা (আমাকে) ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, "আমিই ঐকান্তিক সুখের আকর"।

"মাঞ্চ যোব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।"
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ভুয়ায় কল্পতে॥
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠামমৃত স্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্যচ॥"
গীতা।১৪।২৬।২৭।

এই অবস্থায় অত্যন্ত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য।—মহানুভব! তবে কি এই সিদ্ধান্ত হইল যে, ক্রমে সাধনা দ্বারা পরব্রহ্মে আবার মিলিব?

গুরু। শাস্ত্রের তাহাই উক্ত, ঋষিদিগের তাহাই যুক্তি, গুরুদিগের তাহাই পরামর্শ এবং সাধকের তাহাই ঈপ্সা। সকল শাস্ত্রে ঈশ্বরও তাহাই বলিয়াছেন। ধর্ম্মেরও তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ধৃধাতু হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা, যদ্বারা মানবেরা উত্তরোত্তর আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন প্রথানুসারে উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মে তন্ময় হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে এই উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না, তাহা ধর্ম্ম নহে; তাহা ফিলসফি বা পাণ্ডিত্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম নহে, ইহা নিশ্চয়।

শিষ্য।—ভাল, তবে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি সাধনা করিয়াছিলেন? ইঁহার অষ্টসিদ্ধি কেমনে লাভ হইল? ইনিত মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া অষ্টসিদ্ধির ক্ষমতা গুলি দেখাইয়াছিলেন, তবে সাধনায় সিদ্ধি হয় কেমনে বুঝিব? রঘুনন্দন রাম কোথায় তপস্যা করিয়াছিলে? তিনি ত বাল্যাবস্থা হইতেই ঐশীশক্তি সম্পন্ন। তাহার পরে দেখুন, মহাপ্রভু

চৈতন্যে কবে তপ জপে ব্রতী ছিলেন? তবে ইহাঁদের সিদ্ধি কোথা হইতে ঘটিল?

গুরু।—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ও শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার উত্তর দিতেছি। ইহাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন নাই। মনুষ্য হইলেই সাধনার প্রয়োজন হয়। যাঁহারা মনুষ্যাতীত, তাঁহাদের সাধনের আবশ্যকতা কোথায়? স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান লোকশিক্ষার জন্য মনুষ্যরূপে রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সকল নামও ব্রহ্ম শব্দের অর্থবাচক, সুতরাং বুঝিতে হইবে, স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্ম মথুরা, অযোধ্যা ও নবদ্বীপে দর্শন দিয়াছিলেন।

শিষ্য।—প্রভো! আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, মনুষ্য ঈশ্বর নহে এবং ঈশ্বরও মনুষ্য নহেন।

গুরু।—এখনও তাহাই বলিতেছি, এবং চিরকাল তাহাই বলিব। ঈশ্বর ঈশ্বরত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানবত্ব গ্রহণ করিয়া মানুষ হয়েন নাই, তিনি চিরস্থায়ী—নিত্যস্থায়ী অক্ষয় ঈশ্বর, তখনও ঈশ্বর ছিলেন; এখনও ঈশ্বর আছেন,কেবল মানুষের আকৃতিতে আসিয়াছিলেন। রাজারা কখন কখন ছদ্মবেশে দীনহীন কাঙ্গালীর মত স্বরাজ্য দেখিতে যান, তাঁহাদের ছদ্মবেশ দেখিয়া কাঙ্গাল বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকই কি তাঁহারা দীনহীন? ভগবান স্বকার্য্য সাধনার্থ মনুষ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি মানুষ নহেন। ঈশ্বর ঈশ্বর হইয়াও মানুষ হইতে পারেন, ইচ্ছা করিলে সকলই হইতে পারেন, ইচ্ছা করিলে গুরু হইতে লঘু এবং লঘু হইতে গুরু, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ইত্যাদি ক্ষমতা দেখাইতে পারেন। এতক্ষণে অষ্টসিদ্ধির মানে বুঝিলে কি? অনিমা লঘিমাদির অর্থ এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে কি?

শিষ্য।—তাহা হইলে বুঝিলাম, ঈশ্বর সর্ব্ব-শক্তিমান।

গুরু।—তাহাই যথেষ্ট নহে, তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বজ্ঞ, ন্যায়বান এবং নিত্য। তিনি দয়ালু কিন্তু ন্যায়ের উপর তাঁহার দয়া প্রতিষ্ঠিত।

শিষ্য।—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ ছিলেন বুঝিলাম, কিন্তু যোগীগণ সাধনবলে অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে কি অবস্থায় উপনীত হয়েন?

গুরু।—তুমি লোকের মুখে শুনিয়া থাকিবে, অনেক সন্ন্যাসী পারদ (পারা) নামক ধাতুতে লতা বিশেষের রস মিশ্রিত করিয়া সুবর্ণ প্রস্তুত করে। কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, এস্থলে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। মনে কর, এক তোলা পারা লইয়া যদি কোনও সন্ন্যাসী এক তোলা সুবর্ণ প্রস্তুত করে এবং ঐ সুবর্ণ শত বার অগ্নিতে দাহন করিয়াও যদি প্রকৃত সোণা বলিয়া প্রমাণীত হয় এবং কষ্টি প্রস্তরে শতবার ঘর্ষণ করিয়াও যদি প্রকৃত সুবর্ণ প্রমাণীত হয় এবং সুবর্ণের যাহা গুণ ও বর্ণ তৎসমুদয়ই ইহাতে বর্ত্তমান থাকে, মোট কথায়—যদি ঐ পারা প্রকৃতই সুবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহাকে পারদ্ বলিবে কি সুবর্ণ বলিবে?

শিষ্য।—সুবর্ণই বলিব, কারণ ইহা আর পারদ নহে; পারদের বর্ণ, গুণ, দোষ, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি ইহাতে কিছুই বর্ত্তমান নাই, সুতরাং ইহা সুবর্ণ।

গুরু।—তাহা হইলে অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত মনুষ্যকে আর মনুষ্য বলিতে পারিবে না। তিনি মনুষ্যাতীত; মহামতি যিশুখৃষ্ট, ধর্ম্মপ্রাণ মহাবীর মহম্মদ ইহাঁরা এই শ্রেণীর মহাপুরুষ।

শিষ্য।—অষ্টসিদ্ধ বুঝিলাম; বুঝিলাম, ভগবান ইচ্ছা করিলে সকল প্রকারের রূপ ও বর্ণ ধারণ করিতে পারেন, তাহা যদি না পারেন,

তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিবার অধিকার কোথায়? তিনি ৫টি পারেন আর ৪টি পারেন না, অথবা ৩টী পারেন আর একটি পারেন না, এরূপ নহেন, তিনি সকল বিষয়েই সমর্থ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান। সর্ব্বশব্দের অর্থ—সমুদয়, Omnipotent—কিছুই বাদ নাই। তাহা হইলে তিনি শরীরী হইতে পারেন—মানুষের আকার ধারণ করিতে পারেন। যদি সকল কার্য্যেই তিনি সক্ষম, কেবল মানুষের আকার ধারণে অক্ষম, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা যায় না। অতএব ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণ করা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, কিন্তু কথা এই যে, মানুষের আকার ধারণ করেন কেন?

গুরু—বাঘের সঙ্গে মিলিতে গেলে বাঘ হইতে হয়, শৃগালের সঙ্গে মিশিতে গেলে শৃগাল হইতে হয়, মানুষের সঙ্গে মিশিতে গেলে মানুষ হইতে হয়, নতুবা তিনি মিশিবেন কেমনে? মানুষের শিক্ষার জন্য, ভগবানের মনুষ্যাকারে অবতার হওয়ার প্রয়োজন। এই জন্য অষ্ট-সিদ্ধির ক্ষমতা দেখান। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অথবা একত্রে তাঁহার গুণাবলী, প্রয়োজন বশতঃ, প্রতিভাষিত হইয়া থাকে। অষ্টসিদ্ধির কথাটা তোমাকে আর একটু বুঝাইয়া অদ্যকার কথোপকথন বন্ধ রাখিব। যোগীরা যোগবলে অতি সূক্ষ্ম বা লঘু দেহ ধারণ পূর্ব্বক গমনাগমন করিতে পারেন, নানা দেশের নানা গ্রন্থে এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এ সকল প্রত্যক্ষ সত্য কথা। যোগীরা সাধনবলে যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা আরব্য উপন্যাসের আশ্চর্য্য প্রদীপের উপ-কথার ন্যায় তন্মুহূর্ত্তেই প্রাপ্ত হয়েন এবং ইচ্ছা করিলে যথা ইচ্ছা তথায় প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়েন। অষ্টসিদ্ধি যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের এমন ক্ষমতাও আছে যে, তাঁহারা গুণীর গুণ, বিক্রমীর বীরত্ব, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, সুন্দরের সৌন্দর্য্য

প্রভৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে হরণ করিয়া লইতে পারেন। ইহার নাম মহিমা-সিদ্ধি। রামায়ণ পাঠ করিলে জানিবে, বালীরাজা মহাসিদ্ধ ছিল, তাহাতেই শ্রীরামচন্দ্র ইহাঁকে গোপনে নিধন করিয়াছিলেন। যোগীরা সকলের উপরে প্রভুত্ব করিতে পারেন, যত বড় বীর বা যতবড় হিংস্রক বা অপকারী হউক না, যোগীরা তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন এবং বশীভূত করিয়া ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরাইতে ও ফিরাইতে পারেন। যোগীগণ সিদ্ধিবলে কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে প্রকীর্ণ বা সংকীর্ণ করিবার ক্ষমতা রাখেন। অদ্য এই পর্য্যন্ত রহিল, আগামী কল্য আবার শুনিও।

চতুর্থ দিবস।

শিষ্য।—প্রভো! অবতারের কথা গত কল্য শুনিয়াছি। ব্রহ্ম (ঈশ্বর) অবতার হয়েন, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহার মনুষ্যশরীর ধারণের অন্য হেতু আছে কি?

গুরু।—ঈশ্বর এত পবিত্র, এত জ্যোতির্ম্ময়, এত আনন্দস্বরূপ, এত মহান, এবং এত অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা ও গুণ সম্পন্ন যে, অপবিত্র ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন, হীনতেজ, মূঢ় মানব তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারে না এবং তিনি দেখা দিলেও দেখিতে পারে না। মহান্ সূর্য্য কিম্বা প্রজ্ব-লিত হুতাশনের দিকে চাহিয়া থাকা মানুষের পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে সেই সূর্য্যের সূর্য্যকে, হুতাশনের হুতাশনকে, জ্যোতির জ্যোতিকে কেমনে দেখিতে পার? তিনি সেই মূর্ত্তি যখনই দেখাইয়াছেন, তখনই জগত কম্পিত হইয়াছে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি এত বড় বীর, এত বড় যোদ্ধা এবং এত বড় বোদ্ধা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পারিয়াছিলেন: কি? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ দেখাইলেন, তখন অর্জ্জুন ভীত হইলেন, তাঁহার হৃৎকম্প হইল,

সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন "প্রভো! দেবাদিদেব! আমাকে তোমার সুন্দর নরমূর্ত্তি দেখাও, আমি তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।" পর্ব্বতের উপরে ভগবান যখন মূসাকে স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখাইলেন, তখন মূসা (Moses) কাঁপিতে লাগিলেন, চক্ষুতে আর তিনি দেখিতে পারিলেন না। অলিভ্ পর্ব্বোতোপরে ঈশা (খৃষ্ট) যখন পিটর প্রভৃতিকে স্বীয় ঐশী মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন, তখন পিটর প্রভৃতি অবসন্ন হৃদয় হইয়া মৃতের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। (Vide Transfiguration of Christ in the NewTestament) যাহা হউক, এই জন্যই মানবশরীরী হওয়া ঈশ্বরের আবশ্যক। ঈশ্বরের স্বমূর্ত্তি দেখা সহজ নহে। ভগবৎ গীতায় তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমাকে দেখিলে ত্রিলোক কম্পিত হয়, আমার নররূপই সৌম্য, তাহাই মানবের পক্ষে সুদর্শনীয়।" তদ্ভিন্ন আর এক কথা এই যে, মানব মাত্রই ভ্রান্ত, তাহাদের শিক্ষাও তজ্জন্য অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত, প্রত্যাদিষ্ট না হইলে মানবের শিক্ষা অভ্রান্ত হয় না। এই সর্ব্বশিক্ষকের শিক্ষক, সর্ব্বগুরুর গুরু শ্রীশ্রীভগবান মানবকে স্বয়ং শিক্ষা দেন; তাঁহার বাক্য (ব্রহ্মবাক্য) শাস্ত্রে আছে বলিয়া শাস্ত্র আমাদের শিক্ষক, এই জন্য পবিত্র ও প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, শাস্ত্রাজ্ঞা অমান্য করিলে কেহই সুখ বা উৎকৃষ্ট গতি বা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥"

শিষ্য।—এখন বুঝিলাম, ব্রহ্মে (ঈশ্বরে) অষ্টসিদ্ধির সমুদয়ই আছে, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বজ্ঞ ন্যায়বান, পবিত্রতম, স্বতঃসিদ্ধ, ইত্যাদি। তাঁহার সমুদয়ই "বৃদ্ধি"; তিনি প্রয়ো-

জন বশতঃ ইচ্ছা অনুসারে অণু বা লঘু হইলেও অণুত্বে বা লঘুত্বে তাঁহার হ্রাস বা ক্ষয় নাই। পাণিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য—"বৃহিবৃদ্ধৌ"।

গুরু।—ঈশ্বরকে এখন কি প্রকার বুঝিলে? তিনি সকর্ম্মী কি ক্রিয়া বিহীন? তিনি সগুণ কি নির্গুণ?

শিষ্য।—তিনি কর্ম্মী হইয়াও কর্ম্মরহিত; "ইচ্ছু" হইয়াও ইচ্ছা বা কামনা রহিত, তিনি পদ্মপত্রের বারির ন্যায় নির্লিপ্ত।

গুরু।—ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ?

শিষ্য।—প্রভো! আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার?

গুরু।—সগুণ কি নির্গুণ, ইহার উত্তর দিলেই সাকার কি নিরাকার তাহা বুঝা যায়।

শিষ্য।—তিনি সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই। তিনি সকল গুণের আকর ও আধার হইয়াও গুণহীন এবং গুণাতীত হইয়াও সগুণী। তিনি অদৃশ্য হইয়াও দৃশ্য, নির্গুণ হইয়াও সগুণ। "দিব্যচক্ষু" প্রাপ্ত পুরুষের নিকটে তিনি 'দৃষ্ট'। ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার উভয়ই, তিনি নিরাকার, অতীন্দ্রিয় এবং নির্গুণ হইয়াও সগুণে শরীর ধারণ করেন বলিয়া "সাকার"।

গুরু।—বৎস! অতি সত্য কথা বলিয়াছ। তিনি সত্য সত্যই সাকার এবং নিরাকার উভয়ই।

"অব্যক্ত ব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।"

অর্থাৎ—তিনি (ঈশ্বর) ব্যক্তও বটেন অব্যক্ত ও বটেন, নির্গুণও বটেন এবং গুণযুক্তও বটেন। তেলে জলে একত্রে থাকে, কিন্তু মিশে না, তিনি সেইরূপ নির্লিপ্ত।

"অচিন্ত্যায়া প্রেমেয়ায় ব্রহ্মণে সগুণায় চ।
নিগুর্ণায় জগদ্বীজ-রূপায় ভাস্বতে নমঃ।"

বৎস! এখন বল দেখি ঈশ্বরকে কেবল নিরাকার বলিয়া স্বীকার করা এবং সাকার বলিয়া অস্বীকার করা অন্যায় কি না?

শিষ্য।—ইহা যে অত্যন্ত অন্যায়, তাহা স্বীকার করি। কেবল নিরাকার বলিলে, ঈশ্বরের অষ্টসিদ্ধির সম্পূর্ণত্ব স্বীকার করা হইল না, তাহা হইলে "ব্রহ্ম" ব্রহ্ম রহিলেন না, অসম্পূর্ণ ঈশ্বরকে স্বীকার করা হইল এবং ব্রহ্ম শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ হইল না। তবে এ কথা বলা যায়, ঈশ্বর নিরাকার কিন্তু সাকার হয়েন। বেদে তিনি বলিয়াছেন, "আমি এক, কিন্তু ইচ্ছা করিলে বহু হইতে পারি", গীতায় তিনি বলিয়াছেন, "যুগে যুগে লোকশিক্ষা, ধর্ম্মস্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশ জন্য আমি সাকার হই।"

গুরু।—ব্রহ্মশব্দের অর্থ বুঝিলে ব্রহ্মকে কেবল নিরাকার বা কেবল নিগুর্ণ বলিয়া কেহ সন্তুষ্ট হইতে পারে না। বিজ্ঞানের কথা তুলিয়াও ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে কথা এখন তুলিব না। ব্রহ্ম শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে কেবল নিগুর্ণ ও কেবল নিরাকার বলিলে, ব্রহ্ম শব্দের ভুল অর্থ করেন। ব্রহ্ম শব্দ ছাড়িয়া দিয়া ঈশ্বর বা ভগবান শব্দ ব্যবহার করিলেও সেই সাকারত্ব এবং সগুণত্ব আসিয়া পড়িতেছে, ব্রহ্ম শব্দের কেবল নিগুর্ণ ঈশ্বরবোধক অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বাকী কথা কল্য শুনাইব।

পঞ্চম দিবস।

শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া গুরু বলিলেন, বৎস! ব্রহ্মশব্দ এবং তৎসম্পর্কে নানা বিষয়ের নানা কথা তোমাকে ইতিপূর্ব্বে শুনাইয়াছি,

অদ্য বাকী কথাগুলি শুনাইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিয়া দিব। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ করিতে গিয়া আমি তোমাকে অন্যান্য অনেক কথা বলিয়াছি এবং অদ্য আরও অনেক কথা বলিব; আনুষঙ্গিক কথাগুলি মূল বিষয়ের সহায়ক বলিয়া, অনিচ্ছা এবং অনবকাশ সত্ত্বেও উল্লেখ করিয়াছি; মূল বিষয়টি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এই কথা গুলি হিতকর হইতে পারিবে বলিয়া আমার ভরসা আছে। গীতার দশম অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "আধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং" অর্থাৎ বিদ্যার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিদ্যাই (Spiritual Science) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তোমার এই বিদ্যায় সুমতি দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিতেছি। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ বলিয়াছেন।—

"উর্দ্ধমূলং অধঃশাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।"

অর্থাৎ এই বিস্তৃত মায়াক্ষেত্রে সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উর্দ্ধ-দেশে (ঈশ্বরে) স্থিত, সেই মূলকে বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন ব্যাপার; তথাপি নিরাশ হওয়া উচিত নহে, ভগবান যাহা স্বয়ং কহিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর।

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ় মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা।
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন গত্বা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেবাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।

জ্ঞানরূপ শস্ত্রদ্বারা এই মূলকে ছেদন করা যায় অর্থাৎ এই মূলের অভ্যন্তরস্থ পদার্থ (ব্রহ্মতত্ত্ব) বুঝিতে পারা যায়, সুতরাং "সেই অব্যয় ব্রহ্মপদ অবশ্যই জ্ঞান-সহযোগে অনুসন্ধান দ্বারা বুঝিতে পারিব", এইরূপ

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আধ্যাত্মিক-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে; আধ্যাত্ম-বিদ্যার অনুশীলন দ্বারাই এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারা যায়। মোক্ষসাধন জন্য (ধ্রুবের ন্যায়, প্রহ্লাদের ন্যায়) এইরূপ প্রতিজ্ঞা, এইরূপ অধ্যবসায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রতিজ্ঞার পরিণাম—মুক্তি। এইরূপ অধ্যবসায়ে সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, সালোক্য অথবা সাযুজ্য মুক্তিলাভে সক্ষম হওয়া যায়। সেই মুক্তিপদ—সেই অব্যয় পরমধাম—অত্যন্ত পবিত্র, অত্যন্ত সুখকর; সেই অনুপম এবং পরমানন্দদায়ক ব্রহ্মপদে পৌঁছিতে পারিলে এই মায়াময় কল্মষিত এবং কষ্টকর ভবজন্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন,—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

(গীতা, ১৫ অ, ৬ শ্লোক)

বৎস! এখন বুঝিলে কি আধ্যাত্মিকী বিদ্যা সকল বিদ্যার সকল জ্ঞানের, সকল সুখের আকর; ইহারই অনুশীলনে, ইহারই সহায়তায়, মুক্তিলাভ করা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বর করুন, শাস্ত্রে ধর্ম্মে, ব্রহ্মজ্ঞানে তোমার সুপ্রবৃত্তি আরও বর্দ্ধিতা হউক।

শিষ্য। প্রভো! যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু চঞ্চলতায় অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ি।

গুরু।—বৎস! মহাবীর অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

(গীতা, ৬ষ্ঠ অ)

মহাসাধু পল এত বড় সন্ন্যাসী হইয়াও বলিয়াছিলেন,—

My spirit is willing, but my flesh is weak.

মহামতি মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন, "মিন্‌সর্‌রিল্ বাসোয়াশিল্ খন্নাস"। ধর্ম্মপ্রাণ যীশুখ্রীষ্ট এত বড় জিতেন্দ্রিয় হইয়াও এই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন "Eli Eli Lama Sabachthani," অতএব তোমার মন যে সময়ে সময়ে চঞ্চল হইয়া থাকে, একথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিলাম না। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা প্রমাথী মন ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হইয়া যায়।

শিষ্য।—তপস্যা দ্বারা মনকে আয়ত্ত করা যায় কি?

গুরু।—তপস্যা বা ধ্যান দ্বারা মনকে আয়ত্ত করা যায়। মন আয়ত্ত করিলেই, মনকে জয় করিতে পারিলেই, ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে পার, কিন্তু অনর্থক শরীরকে কষ্ট দেওয়া তপস্যা নহে, এরূপ তপস্যা আসুরিক তপস্যা। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ৫মও ৬ষ্ঠ শ্লোক পড়িয়া দেখ। উক্ত অধ্যায়ের ১৪ এবং ১৬ শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা কর। ধ্যানশীল হওয়াপ্রত্যেক আধ্যাত্মিকবিদ্যার অনুশীলনকারীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানের বিশেষ গুণাদি বর্ণিত আছে। কিন্তু উগ্র তপস্যা, তীব্র বৈরাগ্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভিন্ন মনকে জয় করা অথবা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব। "সাধনা" ছেলে খেলার জিনিস নয় অথবা বক্তার বক্তৃতা নহে; উগ্র তপস্যার প্রয়োজন। মনু মহারাজ লিখিয়াছেন,—

"তপসশ্চরনৈশ্চাগ্রেঃ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্।"

ঈশ্বর আমাদের হৃদয়েই আছেন, কেবল সাধনার আবশ্যক। কেবল পুঁথি পড়িয়া, খবরের কাগজ পড়িয়া বা লিখিয়া অথবা লেক্‌চর দিয়া বেড়াইলে তপস্যা হয় না, ক্রিয়া চাই Practically কিছু করা চাই, কেবল মুখ-ভারতী হইলে চলিবে না।

• ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।"

ভোগ, বিলাস, ইন্দ্রিয়লালসা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে; প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে প্রমাথী মনকে আনিতে হইবে; অনেক অধ্যবসায়, অনেক কষ্ট, অনেক ত্যাগস্বীকার সহ্য করিলে তবে হৃদয়-স্থিত ঈশ্বরের তপস্যা হয়; "প্রবৃত্তিমার্গেও থাকিব আর ব্রহ্মপদও প্রাপ্তি হইবে", এরূপ সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত মূর্খের কথা। God and Mammon cannot be served together. "রাম" ও "কাম" একত্রে থাকিতে পারে না। সর্ব্বতোভাবে সেই পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত!"

অর্থাৎ ("সর্ব্বভাবে") সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করা চাই, ইহার নাম unconditional surrender. পারস্য কবি সেখ সাদি মহাশয়ও তাহাই বলিয়াছেন,—

সোপর্‌দম্ বো তো মায়ে খেশ্‌রা।
তু দানী হেশাবে কম্ ও বেশ্‌রা॥

(গোলেস্তা।)

এইরূপ আত্মসমর্পণ দ্বারা ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, ইহা নিশ্চয় এবং ইহাই ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রতিজ্ঞাবাক্য। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "ইহা সত্য বাক্য, আমি সত্য (প্রতিজ্ঞা) করিয়া ইহা বলিলাম"।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে।

বাইবেলের ভক্তেরাও তাহাই বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর তাঁহাদের নিকটেও এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং বিদেশীয় ভক্তেরা ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, কারণ "Our God cannot lie" (Bible) অর্থাৎ ঈশ্বর সতত সত্যবাদী। যাহা হউক, বৎস! এক্ষণে ব্রহ্মশব্দ সম্বন্ধে আরও কিছু শুনাইতেছি। বেদান্ত সূত্রে পড়া যায়—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কিন্তদ্ ব্রহ্ম"? অর্থাৎ ব্রহ্ম কি? ঐ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান উত্তর দিতেছেন—"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম।"

শিষ্য।—মহানুভব! "অক্ষর" শব্দের অর্থ কি?

গুরু।—তাহা বিস্তৃতভাবে তোমাকে বুঝাইব। এক্ষণে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া রাখি।

কবিং পুরাণ মনুশাসিতার
মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্‌যঃ।
সর্ব্বস্থ ধাতারমচিন্ত্যরূপ
মাদিত্যবর্ণং তমস পরস্তাৎ॥

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, সমস্ত জগতের নিয়ন্তা এবং অণু হইতেও অণু, সমস্ত জগতের বিধাতা, অচিন্তনীয় আদিত্য এবং প্রকৃতির পরে অবস্থিত, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

শিষ্য।—গুরো! আপনি শ্রীমৎভগবৎগীতা হইতে পুনঃ পুনঃ শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। গীতা আপনার খুব প্রিয় দেখিতেছি।

গুরো। বৎস! শ্রীমৎভগবৎগীতা কাহার না প্রিয়? এই গীতা সকল গুণের গুণমণি, সকল রসের ভাণ্ডার এবং সকল জ্ঞানের মহাবিদ্যালয়। এই সংসার-সাগর পার করিতে শ্রীমৎভগবৎগীতা তরণীস্বরূপ।

সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ।

জর্ম্মণ আচার্য্য বুলো বলিয়াছেন,—

"Go where you will, the path is lying straight before you—but nowhere you will find grander—nobler—holier and older religion than Hindooism which is based upon Bhagabatgita to which more than one third of the population of the world owe their allegiance. If you wish to steer clear off all sorts of human frailties, if you think that your concern is not with this world alone, then read and follow the *Bhagabat Gita*—the solace of the life of Scophenhaur, the repository of divine wisdom in its highest form, the grandest outcome of Hindoo conception countless centuries ago, when your Western gurus were in embryonic state."

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাইবেল নামক পবিত্র গ্রন্থকে সুন্দর-রূপে ও প্রকৃতরূপে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য যেমন এ পর্য্যন্ত একজন পাদ্রীরও জন্ম হয় নাই, শ্রীশ্রীমৎভগবৎগীতা বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য একজনও লোক এখানকার কালে জন্মে নাই। কৃষ্ণকৃপা না হইলে কি কৃষ্ণকথা বুঝা যায়? কৃষ্ণকে না বুঝিলে কি গীতা বুঝা যায়?

"কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্, কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ।"

কৃষ্ণই সমগ্র গীতা জানেন ও বুঝেন, কুন্তীসুত কিঞ্চিৎমাত্র জানিয়াছেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমং।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে মোক্ষমব্যয়ং॥

সুতরাং গীতা আমাদের কাছে প্রিয়তম ও পবিত্রতম না হইবে কেন? আমার উপদেশ এই যে, তোমরা নিত্য গীতা পাঠ কর ও বুঝিতে চেষ্টা কর।

শিষ্য।—মহানুভব! এক্ষণে "অক্ষর" শব্দের অর্থ বলিতে আরম্ভ করুন।

গুরু।—অক্ষর শব্দের অর্থ ওঁ, ইহাকে প্রণব বলে, ইহাই ব্রাহ্মণের প্রকৃত গায়ত্রী, ইহাই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, ইহাই পরব্রহ্ম। ইহাতে তিনটি বর্ণ আছে, অ উ ম।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভবঃ স্বরিতীতি চ॥

(মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।)

এই জন্য মনু মহারাজা বলিয়াছেন,—

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।

(মনুসংহিতা, ২য় অ, ৮৩ শ্লোক।)

অ, উ, ম মিলিত হইয়া ওঁ পদ নিষ্পন্ন হয়, এই জন্য এই তিনটি ব্রহ্ম। মনু কহিয়াছেন,—

"ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম।"

(মনুঃ, ১১ অ, ২৬৬ শ্লোক)

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "গিরামস্ম্যেকমক্ষরং" অর্থাৎ "বাক্যের মধ্যে আমি (ব্রহ্ম) অক্ষর (প্রণব = ওঁকার)।" এই জন্য আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ (ওঙ্কার)।" গীতার নবম অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে বলিতেছেন, "বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার" অর্থাৎ এক মাত্র আমিই (পরমব্রহ্ম) বেদ্য (জানিবার ও বুঝিবার বস্তু) আমিই ওঁকার।" বেদের ব্রাহ্মণভাগে বেদান্তে ও স্মৃতিতে এই প্রণব বা ওঁকার ওঁতৎসৎ রূপেও বিদ্যমান আছে। গীতায় (১০ম অ, ৩৫ শ্লোক) ঈশ্বর বলিয়াছেন, "ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী।"

শিষ্য।—মহানুভব! এই অ উ ম বর্ণত্রয়ের অর্থ কি?

গুরু। বৎস। তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। এই তিনটি অক্ষরকে ভাগ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। অ অর্থে ব্রহ্মা, উ অর্থে বিষ্ণু এবং ম অর্থে মহাদেব (মহেশ্বর)।

শিষ্য।—ইহাতে 'ব্রহ্ম' কেমনে বুঝিব? ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বুঝিলাম, ব্রহ্ম বুঝিলাম কৈ?

গুরু। ইহাই ব্রহ্ম; তোমাকে ইহা ভাগ করিয়া বুঝাইতেছি। মনুসংহিতায় ১ম অধ্যায়ে ব্রহ্মাশব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, দেখিও।

স্রষ্টা স পুরুষো লোকে ব্রহ্মা ইতি কীর্ত্ত্যতে (মনু)।

স্রষ্টা পুরুষই ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। অ অর্থে সৃষ্টিকর্ত্তা (ব্রহ্মা) বুঝায়, গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে ভগবান কহিয়াছেন, "অক্ষরানাম অকারোস্মি" অর্থাৎ "আমি (ঈশ্বর) অক্ষরের মধ্যে অ।" উপরি উক্ত অর্থে বিষ্ণু অর্থাৎ পালন কর্ত্তা এবং ম অর্থে মহেশ্বর অর্থাৎ সংহারকর্ত্তা বুঝায়।

শিষ্য।—মহানুভব! ইহাতে বুঝিলাম যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব ইহাঁরা সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা, কিন্তু 'ব্রহ্ম' বুঝিলাম কি?

গুরু।—বৎস! অধীর হইও না, অধীরতাদোষেই দেশ মাটী হইয়া যাইতেছে। ধর্ম্ম কথায় খুব ধীরতা চাই ক্রমে ক্রমে ভাল করিয়া বুঝাইতেছি, কথা এখনও শেষ হয় নাই।

শিষ্য।—গুরুদেব! আমাদের অধীরতা কৃপা করিয়া মার্জ্জনা করুন, ইহা যৌবনসুলভ স্বভাবের দোষ।

গুরু।—বৎস! খৃষ্টানেরা বলেন, পরমেশ্বরে তিনটি শক্তি আছে—পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মা (Father, Son, Holy Ghost.) মুসলমানদিগের মতে এইরূপ তিনটি আছে—তাহা কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, তাহাদের নাম—আলিফ্, লাম্, মীম্! হিন্দুরের অ,

উ, ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরমারাধ্য পরমেশ্বর ত্রিমূর্ত্তি (Trinity) অর্থাৎ তিনটি গুণের প্রকাশক রূপ।

শিষ্য। ঐ তিনটি গুণ কি কি? অথবা ঐ তিনটি শক্তি কি কি?

গুরু।—Procreative Power, Protective Power, (and) Destructive Power. অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার (অথবা প্রলয়)। এই তিনটি গুণ ও শক্তি আছে বলিয়া তিনি 'ব্রহ্ম'। এই জন্যই তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বশক্তিমান, অজ, অব্যয়, নিত্য, ইত্যাদি। বৎস! এখন পাণিনির সেই কথা আবার স্মরণ কর—"বৃহি বৃদ্ধৌ"। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "এই কারণে আমি ব্রহ্ম"।

পরব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেমজং বিভুং॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষি নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষী মে॥

(গীতা, ১০ম অ)

এই শ্লোকে ভগবানকে অর্জ্জুন কহিয়াছেন, "হে ঈশ্বর! তুমি যে পরব্রহ্ম, তাহা তুমি স্বয়ং আমাকে বলিয়াছ"। শ্রীমৎভগবৎগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে লিখিত আছে—

অবিভক্ত ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূত ভর্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

অর্থাৎ—ভূতেষু চ অবিভক্তং (সদপি) বিভক্তং চ ইব স্থিতং ভূতভর্তৃ (ভূতানাং পোষকং) গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ তৎ (ব্রহ্ম)।

অর্থাৎ—তিনি (ব্রহ্ম) ভূতের (সমগ্র জগতের) পোষক, ভক্ষক (নাশক) এবং উৎপাদক (স্রষ্টা) রূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। গীতার

উক্ত অধ্যায়ের ৭ হইতে ১১ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ এবং ১২ হইতে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ঈশ্বরের লক্ষণ সুন্দর ও স্পষ্টভাবে কথিত আছে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ সমূহ পাঠ কর।

শিষ্য।—ভগবানের এই সুমধুর 'ব্রহ্ম' নাম সর্ব্ব প্রথমে কাহার মুখপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছিল?

গুরু।—বৎস! আমাদের পিতৃপুরুষ পরম পবিত্র আর্য্যঋষির শ্রীমুখারবিন্দ হইতে সর্ব্বপ্রথমে উপনিষদ শাস্ত্রে এই মহামধুর 'ব্রহ্ম' নাম উচ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও সতত স্মরণ রাখিও যে, বেদে যিনি ইন্দ্র, সাংখ্যে যিনি পুরুষ, তন্ত্রে যিনি প্রকৃতি, যোগশাস্ত্রে যিনি পরমাত্মা, ভক্তিশাস্ত্রে যিনি ভগবান্, উপনিষদে তিনিই ব্রহ্ম। শ্রীভাগবৎগ্রন্থের দশম অধ্যায়ের অষ্টম ও ১৪ শ্লোকেও শ্রীবেদব্যাস এইরূপ কহিয়া গিয়াছেন।

শিষ্য।—তাহা হইলে বুঝিলাম, সমগ্র বিশ্বসংসারের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকের নাম ব্রহ্ম। ইনিই পরমেশ্বর, ঈশ্বর, ভগবান্, হরি, গড্, খোদা, আল্লা, জেহোভা প্রভৃতি নামে নানা স্থানে প্রখ্যাত। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।

গুরু।—তিনি নিজেই তাহা বলিয়াছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"।

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! আমার (ঈশ্বরের) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই। (গীতা, ৭ম অ, সপ্তম শ্লোক।) দশম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বলিতেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ (গীতা)

অর্থাৎ—ভো গুড়াকেশ (অর্জ্জুন)! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্ব

ভূতানাং অন্তঃকরণে অবস্থিতঃ) আত্মা অহং ভূতানাং আদিঃ (জন্ম) মধ্যং (স্থিতিঃ) অন্তঃ (প্রলয়ঃ) চ অহং এব।

শিষ্য।—মহানুভব! বাস্তবিকই এই ব্রহ্মপদ পরম পবিত্র ও পরম সুখকর, কিন্তু এই পবিত্র ব্রহ্মলোকে কে যাইতে সক্ষম?

গুরু। আমি তোমার এই নূতন প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করি নাই; ব্রহ্মশব্দ বুঝান আমার উদ্দেশ্য, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বুঝান আমার উদ্দেশ্য নহে। তথাপি তোমাকে এ বিষয়ে অনেক কথা শুনাইয়াছি। তোমার অনুরোধে আরও কিছু শুনাইব। মনু মহারাজা কহিয়াছেন—

"গুরু শুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে।"
(২য় অধ্যায়, ২৩৩ শ্লোক)

অর্থাৎ—গুরুভক্তি বলে ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়।

ভগবান কহিয়াছেন—

যো ঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোধিগচ্ছতি॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥

তিনি আরও বলিতেছেন, "যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন, ব্রহ্মই যাঁহাদের আত্মস্বরূপে অবগত হইয়াছেন, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ, তাঁহারা সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিদ্ধূতকল্মষ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন।" (গীতা ৫ম অ, ১৭ শ্লোক)। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত মুক্তির (ব্রহ্মলোক গমনের) লক্ষণ সমূহ লেখা আছে।

শিষ্য।—আপনি বলিয়াছেন, গুরুভক্তিই ব্রহ্মলোক গমনের প্রধান সহায়। বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করি গুরু কাহাকে বলে ?

গুরু।—তুমি ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন প্রশ্নের অবতারণা করিতেছ, অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ বশতঃ এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দিব না।

শিষ্য।—মহানুভব! অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটু সংক্ষেপে আদেশ করিতেই হইবে, ইহা আমার প্রার্থনা।

গুরু।—গুরু শব্দের অর্থ এবং গুরুর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃত ভাবে বলাই আবশ্যক, সংক্ষিপ্ত ভাবে এ সকল ব্যাখ্যা না করাই ভাল। আমি সংক্ষেপে শুনাইতে ইচ্ছা করি না, বিস্তৃত ভাবে বলিবার সময় নাই। গীতার একটি মাত্র শ্লোক শুনাইতেছি—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"

অর্থাৎ "গুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত ও সুশ্রূষা সহকারে তাঁহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিও।"

শিষ্য।—মহাশয়! গুরুকে কেন জিজ্ঞাসা করিব, অপরকে কেন জিজ্ঞাসা করিব না ?

গুরু।—কারণ এই যে,

"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।"

অর্থাৎ "গুরু তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ।

শিষ্য।—তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানী কাহাকে বলে ?

গুরু।—কেবল অধ্যয়নের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে তত্ত্বজ্ঞানী বলা যায়। অধ্যাত্ম গুলিতে কার্য্যতঃ যিনি অভিজ্ঞ, যিনি ক্রিয়াবান, তিনি তত্ত্বদর্শী। প্রকৃত গুরুপুরুষ মধ্যে এই উভয় গুণ থাকা আবশ্যক; তিনি তত্ত্বদর্শী এবং তত্ত্বজ্ঞানী উভয়রূপে সিদ্ধ না হইলে গুরু নহেন।

শিষ্য।—মহারাজ! এবিষয়ে অধিক আর জিজ্ঞাসা করিব না,

কিন্তু, "অক্ষর" শব্দ "ব্রহ্ম" শব্দের প্রতিপাদক বলিয়া আপনি আমাকে যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি।

গুরু—কিসের দৃষ্টান্ত?

শিষ্য।—পরব্রহ্মকে "অক্ষর" বলিয়া কি কেহ কোনও কালে স্তব করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি দৃষ্টান্ত দিউন।

গুরু।—একটি নহে, ৪টী দৃষ্টান্ত দিতেছি, শুন।

(১) দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।

(গীতা ১৫ অ, ১৬ শ্লোক)

(২) ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং।

(গীতা ১১ অ, ১৮ শ্লোক)

(৩) যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি নচাত্তমঃ।

(১৫ অধ্যায়)

ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ।

(গীতা ১১ অ, ৩৭ শ্লোক)

শিষ্য।—এখন বুঝিলাম, ওঁ শব্দের অর্থ এবং ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এক। এখন বুঝিলাম, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী আর বেদের প্রণব, "ব্রহ্ম" শব্দ বাচক। কিন্তু এখন একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর কোথায় বলিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু এবং তিনিই শিব?

গুরু।—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তোমাকে ইতিপূর্ব্বে মনুসংহিতা হইতে শুনাইয়াছি। মহাভারতের বহুস্থানে বিশেষতঃ বনপর্ব্বে ভগবান বলিয়াছেন, "অহং ব্রহ্মা" আমিই ব্রহ্মা। গীতার দশম অধ্যায়ে তিনি "মহেশ্বর" "শঙ্কর এবং পুনরায় "মহেশ্বর" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। দশম অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে তিনি বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং

দশম অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে "রাম" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকে শ্রীভগবান আবার "মহেশ্বর" নামে নিজের বিভূতি বর্ণনা করিয়া ভক্তকে বুঝাইয়াছেন। মনু লিখিতেছেন—

ব্রহ্ম শাশ্বতম্

(১২ অ, ১৩৩ শ্লোক, মনু)

কিন্তু তিনি ইহাও লিখিতেছেন যে, "এই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম অগ্নি প্রজাপতি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ প্রভৃতি রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং উপাসিত হয়েন।"

শিষ্য।—মহানুভব! আপনার অনুগ্রহে এখন বুঝিলাম, সেই সচ্চিদানন্দ শাশ্বত পরমব্রহ্ম ব্রহ্মারূপে, সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুরূপে পালনশক্তি এবং শিবরূপে সংহারশক্তি প্রকাশ করিতেছেন; তিনিই অগ্নিরূপে তেজ, প্রজাপতি রূপে সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়রূপে চৈতন্য, প্রাণরূপে অবলম্বন। রামরূপে বীর্য্য, প্রভৃতি প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনিই আদি, মধ্য ও অন্ত। ইহাও বুঝিলাম যে, সেই পরমসুখকর ব্রহ্মপদ সহজে মিলে না, সাধন, ধ্যান, তপস্যা প্রভৃতির Practical ক্রিয়া চাই।

গুরু।—বৎস! ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।"

অর্থাৎ, অয়ং লোকঃ অযজ্ঞস্য (অক্রিয়াবানস্য) ন অস্তিঃ; কুতঃ অন্যঃ লোক ইত্যর্থঃ।" (গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৩১ শ্লোক) অর্থাৎ যাহাদের কোন সাধন, ভজন, ক্রিয়া, তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি কিছুই নাই, যাঁহারা কেবল মুখ-ভারতী, যাহাদের পুস্তকে অথবা মুখে (লেক্‌চরে) ধর্ম্ম, অর্থাৎ যাহাদের Practical ক্রিয়া কিছুই নাই, তাহারা এই স্বল্প সুখসম্পন্ন মনুষ্যলোকেই আরাম পায় না, তবে দেবলোকাদি কেমনে প্রাপ্ত হইতে পারে?

শিষ্য।—তবে আমাদের (এই অধমদিগের) গতি কি হইবে, প্রভো?

গুরু।—পরম পবিত্র প্রাচীন বৈদিক ও ব্রহ্মজ্ঞানী আর্য্য ঋষি-দিগের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অতি উদার ভাবে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ, ইহাতে সকলেরই মুক্তির পথ প্রশস্ত আছে। কর্ম্মকাণ্ডী, জ্ঞানকাণ্ডী উপাসনা-কাণ্ডী, হোমকাণ্ডী, যপকাণ্ডী, তপকাণ্ডী, ধ্যানকাণ্ডী, কীর্ত্তনকাণ্ডী সকলেরই ইহাতে মুক্তি আছে। ইহা অতি উদার ধর্ম্ম—বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, এইজন্য ইহা অতি পৃথিবীর The Universal Religion, যে ব্যক্তি মুক্তি চায়, শাশ্বত হিন্দুধর্ম্ম তাহাকে মুক্তি দেন, যে চায় না, তাহাকেও ইনি মোক্ষ দেন।

শিষ্য।—প্রভো! যে চায় না, তাহাকে হিন্দুধর্ম্ম কেমনে মুক্তি দিয়া থাকে?

গুরু।—অত্যন্ত কুকর্ম্মী, দুরাচারী পাষণ্ডদিগকেও হিন্দুধর্ম্ম অভয় দিয়াছেন।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতি জানীহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥
(গীতা, ৯ম অ, ৩১ শ্লোক)

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বংজ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
(গীতা ৪র্থ অ, ৩৬ শ্লোক)

বৎস! তুমি এখনও যুবা, এখনও তোমার শিখিবার ও বুঝিবার অনেক সময় আছে। তুমি তোমার কর্ত্তব্য (কর্ম্ম) সম্পাদন করিয়া মানবজন্ম চরিতার্থ কর, এই কর্ম্মেই তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে। অভ্যাস, বৈরাগ্য। হোমাদি এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম দ্বারাই মুক্তিলাভ হইবে।

অভ্যাসেপ্য সমর্থোসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপস্যসি॥(গীতা,১২ অ,১০শ্লোক)

বৎস! পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম বাস্তবিকই অতি উদার সনাতন ধর্ম্ম। ইহা কাহাকেও মুক্তিপথ হইতে স্বতন্ত্র করে না। জগাই মাধায়ের ন্যায় পাপীকেও ইহা মুক্ত করিয়াছে, আর পাষাণ-পাপী অহল্যাকেও ইহা মোক্ষদান করিয়াছে। অতএব যে কেহ ব্রাহ্মণ হউক, ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে সকলেই মুক্ত! বৌদ্ধ হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, জৈন হউক, হিন্দু কাহাকেও বলে না যে, "আমারই মুক্তি আছে, তোমার মুক্তি নাই।" যে একথা বলে, সে হিন্দু নহে। প্রকৃত হিন্দু বলেন, খৃষ্টানই হও, আর মুসলমানই হও, তুমি যাহাতে আছ, তাহাতে কায়েম্ (পাকা-পোক্ত) হইয়া থাক, দুই নৌকায় পা দিও না। তাহাতেই তোমার মুক্তি।" ভগবানের নাম ভাবগ্রাহী, তিনি ভক্তের ভাব দেখেন, বাহ্যিক কিছুই দেখেন না। দেখিলে, হিন্দুধর্ম্ম কেমন বিশ্বজনীন অতি উদার ধর্ম্ম—It is the universal Religion কেবল তাহাই নহে, এই পরব্রহ্মকে সখা ভাবে, প্রভু ভাবে, পিতা ভাবে, স্বামী ভাবে, গুরু ভাবে, যে কোনও ভাবই ভক্ত ভাবুন না কেন, ভজুন না কেন, ভগবান চিরকালই ভক্তবৎসল এবং ভক্তের নিকটে বাঞ্ছাকল্পতরু। দেখিলে কেমন বিশ্বজনীন উদার ধর্ম্ম। It is the universal Religion.

শিষ্য।—প্রভো! খৃষ্টান পাদ্রীরাও বলিয়া থাকেন, Christianity is the only universal religion অর্থাৎ খৃষ্টান ধর্ম্ম একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম্ম।

গুরু।—তাঁহারা বলুন, ক্ষতি নাই; তুমি উপহাস বা তামাসা করিও না। কোনও ধর্ম্মকে নিন্দা বা ঘৃণা করিও না, তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমাকে আর হিন্দু বলিব না। খৃষ্টানেরও মুক্তি আছে, মুসলমানেরও আছে।

শিষ্য।—প্রভো যদি পাদ্রিদিগের অথবা খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের অযথা উক্তি সমূহের প্রতিবাদ না করি, তাহা হইলে সত্যের অপলাপ হইবে, দেশশুদ্ধ খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে।

গুরু।—তোমার কথা শুনিয়া হাসিতে ইচ্ছা হয়। দেশশুদ্ধ খ্রীষ্টান হওয়ার কথাটা আর ভাবিও না এবং তুলিও না। আমি নিজে এসম্বন্ধে কিছুই বলিব না। একখানি ইংরাজি কাগজ হইতে তোমাকে কিছু শুনাইতেছি।

Extract from the Supplement to the "Theosophist." (March, 1898.)

The Abbe Dubois, an earnest French missionary who toiled in India, thirty years, with a perseverance seldom equalled, living with the Hindoos and even adopting their dress and customs, wrote a history of unique and extensive experiences which has recently been translated from the original French by Mr. H. K. Beauchamp, editor of the "Madras Mail." In this admirable work the Abbe gives a very candid summary of the results of his labors as follows :—

"During the long period I have lived in the capacity of a missionary, I have made, with the assistance of a native Christian preacher, converts of both sexes who were beggars, vagrants, outcastes of several tribes and chandals (Pariahs). They were men and women without resources and they liked to be Christians in order to form connections, chiefly, for the purpose of marriage or with some other interested views."

Again as to the possibility of christianising India the Abbe freely expresses his honest opinion in these words :—"Let the christian religion be presented to these people under every possible light. * * * The time of conversion has passed away and under existing circumstances there remains no human possibility of bringing it back."

আর একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন,—

These loafing rogues (the converted native christians) entered in the fold of Christ by the right of a rite which they call Baptism and which I call a rite of wanton waste of water. For a piece of a bread or for a kiss of a girl they embraced christianty, and I am sure that when their interests will be at stake they will run away from the missionaries and forget Christ, forsake christianity and forgive their own foibles and follies. It will be merely a repetition of the old proverb to say that an attempt to convert the high class Hindoos to christianity will be as much futile and ludicrous as to search a lost pin or a missing needle in the waters of the Persian gulf."

শিষ্য।—হে দেব! হে প্রভো! হে মহানুবভব! আর শুনিতে চাই না, যথেষ্ট হইয়াছে; এখন বুঝিলাম, যাহা আমার আশঙ্কা ছিল, তাহা আশঙ্কা নহে।

গুরু।—ব্রহ্মশব্দের শেষ কথা শুন। ইহাই পরমগুহ্য কথা এবং ব্রহ্মশব্দের পরমগুহ্য অর্থ উপনিষদ বলিতেছেন,—

"রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্‌ধ্বানন্দী ভবতি।"

অর্থাৎ, সেই পরম পবিত্র ব্রহ্ম রসস্বরূপ, সেই রস পানে জীব সুখী হয়, সেই রস সাকার ভাবেই পেয়। তৈলের আধার না থাকিলে তৈল থাকে না; স্নেহ, প্রণয়, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির আধার আবশ্যক, সাকারে সেই আধারের পরিপূর্ণতা। সাকার উপাসনা অতি সহজ ও সুখসাধ্য, এই উপাসনায় প্রত্যেক অণুতে, প্রত্যেক পরমাণুতে পরমেশ্বর প্রত্যেক হয়েন, এই আরাধনাবলে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহঃ
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহি নৃসিংহ হৃদয়ে নৃসিংহ
নৃসিংহ আদি শরণ্য প্রপদ্যে ॥

ভক্তবৎসল ভগবান্ (পরমব্রহ্ম) রসস্বরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—The রস (spirit) of God pervades throughout the universe. এই জন্য গোপীগণ জলে, স্থলে, আকাশে, দর্পণে, বৃক্ষে, বস্ত্রে কেবল কৃষ্ণই দেখিয়াছিলেন, আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। পারস্যকবি সেখ সাদি যখন গাছের পাতা দেখিতেন, তখনই বলিতেন,—

"বর্গে দরখ্‌তাণে সব্‌জ্‌ দর্‌নজরে হুঁশীয়ার।"

অর্থাৎ "পাতায় পাতায় তাঁহার (ঈশ্বরের) মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি"। মানময়ী, প্রাণময়ী, আনন্দময়ী, ব্রজসুন্দরী শ্রীমতী রাধিকা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে রসরূপেই পান করিয়াছিলেন। আর বর্ত্তমান কালে, নবদ্বীপচন্দ্র• মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবই এই রসপানে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এই রসপানে অত্যন্ত সুখ, কিন্তু প্রথমে অত্যন্ত ত্যাগস্বীকার ও অত্যন্ত নিবৃত্তিধর্ম্মের আবশ্যক। সেই নিবৃত্তিপথ অত্যন্ত দুর্গম; পণ্ডিতেরা সেই পথকে অতি দুর্গম বলিয়াছিলেন,—"দুর্গমং পথ স্তৎ কবয়ো

বদন্তি।” কিন্তু তথাপি ব্রহ্মের সাকারভাবে এই রসপান পরিণামে পরম সুখকর। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, “আমি অমৃত; আমি ধর্ম্ম; আমি ঐকান্তিক আনন্দ”। (গীতা, ১৪ অ)।

শিষ্য।—তবে এখন বুঝিলাম, হিন্দুর, মুসলমানের ও খৃষ্টানের ব্রহ্ম (ঈশ্বর) এক।

গুরু।—নিঃসন্দেহ। অতএব তুমি কাহারও প্রতি ঘৃণা বা উপহাস করিও না। ব্রহ্মকে “এক ব্রহ্ম” এবং “সকলেরই সেই এক ব্রহ্ম” জানিয়া এই নশ্বর জগতে বিশ্বজনীন উদার সৌহৃদ্য স্থাপন কর—ইহাকেই বলে Universal Brotherhood. জগত এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মনামে শান্তিতে বিরাজ করুক। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান আর যেন পরস্পর “আমার ঈশ্বর” “আমার ঈশ্বর” বলিয়া অভিমান না করে; কেহ কাহাকে মুক্তির পথ হইতে বিচ্যুত না করে। বৎস! এই ব্রহ্মকে বুঝিতে না পারিয়া লোকে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করে, তাহাতে রজ ও তমগুণের সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তুমি জীবের এই সকল গতি অন্তঃকরণে আলোচনা করিয়া সর্ব্বদা ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে।

এতাদৃষ্টস্য জীবস্য গতীঃ স্বেনৈব তেজসা।
ধর্ম্মতো অধর্ম্মতশ্চৈ ধর্ম্মে দধ্যাৎ সদামনঃ॥

বৎস! ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমি স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।

শিষ্য।—দেব! আমি ভক্তিভরে আপনাকে প্রণাম করিলাম; আশীর্ব্বাদ করুন, ধর্ম্মকর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে।

সমাপ্ত। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা।

কায়স্থ কুলোদ্ভব কবিবর কাশীদাসের কবিত্বশক্তি অথবা জীবন-চরিত বর্ণনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অমর কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীদাসের মহাকাব্য মহাভারত বঙ্গসমাজ ও বঙ্গ-সাহিত্যের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহা বর্ণনার সম্পূর্ণ উপ-যুক্ত হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। সংক্ষেপতঃ এ কথা বলা আবশ্যক, কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশী দাসের মহাভারত বিদ্যমান না থাকিলে বঙ্গদেশ বোধ হয় তিন শত বৎসরের পশ্চাতে পতিত থাকিত। বাল্মীকির রামায়ণ অথবা বেদব্যাসের মহাভারত সুশিক্ষিত লোকের নিকটে সুপাঠ্য হইলেও, কয়জন শিক্ষিত লোক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন? কিন্তু কাশীদাসের মহাভারত অথবা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালার সুশিক্ষিত, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত নরনারীর প্রত্যেকেরই পক্ষে অতি উপাদেয় ও নিত্যপাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদেশের পুরুষ ও রমণীর চরিত্র-গঠন পক্ষে বাঙ্গালা রামায়ণ ও বাঙ্গালা মহাভারত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সহায়-কের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা যতদিন জীবিতা থাকিবে, ততদিন এই দুই মহাকাব্য বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ঘরে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিগৃহীত হইতে থাকিবে। কাব্যাংশেও কাশীদাসের মহাভারত বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজে অতুল্য ও অমূল্য। জলের মধ্যে যেমন জাহ্নবী, বৃক্ষের মধ্যে যেমন অশ্বত্থ, বেদের মধ্যে যেমন সামবেদ, ঋতুদিগের মধ্যে যেমন কুসুমাকর,

বাঙ্গালা কাব্যকারদিগের মধ্যে তেমনি কাশীদাস এবং বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে কাশীদাসের তেমনি মহাভারত। লেখকপুঙ্গবপুঞ্জ এবং সাহিত্য-স্যন্দনসারথীগণ কাব্যকার কাশীদাসকে গৌড়ীয় সাহিত্যপ্রাসাদের উচ্চ সিংহাসনে আরূঢ় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত বড় কবির যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা যে একটি অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন, তাহারই যথাসাধ্য অপনোদন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালার অনেক লেখক বলিয়া থাকেন,—"কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা ছিল না, তিনি মূল মহাভারতের অনুবাদে অসমর্থ ছিলেন, কেবল কথকের কথকতা শুনিয়া, পাঁচালিকারের পাঁচালি পাঠ করিয়া মহাভারত লিখিয়া গিয়াছেন।" কি আশ্চর্য্য অযথা কথা! কি অসহনীয় অন্যায় দোষারোপ! এতবড় কবি সম্বন্ধে এতবড় অসত্য ও অর্ব্বাচীন অভিমতি প্রকাশ করিতে যাঁহারা সাহসী, তাঁহাদের সাহসের প্রশংসা করিবার জন্য কেহ কেহ সম্মত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের অথবা বহুদর্শীতার প্রশংসা করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। এরূপ অন্যায় কথা বালকের মুখে শোভা পাইতে পারে, সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর মুখে ইহা কদাচ শোভা পায় না। "কাশী-দাস সংস্কৃত জানিতেন না" কেবল এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত নহেন, "তিনি পাঁচালি পাঠ করিয়া অথবা কথকতা শুনিয়া মহাভারত লিখিয়াছেন", ইহাও তাঁহাদের অভিমতির অন্যতম অঙ্গ! "লর্ড বেকন লাটিন জানিতেন না", অথবা "রাজা রামমোহন রায় পারস্য জানিতেন না" বলা যেমন অসত্য, অন্যায় ও অযৌক্তিক, কবিবর কাশীদাস সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিমতি প্রকাশ করা অতীব অসত্য এবং অতীব অন্যায়। ইহাঁদের এই ধারণা যে ভ্রমাত্মিকা, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। ইহাঁদের এই কুসংস্কার-

জনিত অভিমতির উর্ম্মিমালায় ভাসিতে ভাসিতে অনেক অজ্ঞলোকেরও মতিভ্রম ঘটিয়াছে; ইহাঁদের এই আন্দোলনের পূর্ব্বে কাশীদাসকে সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু এই অন্যায় সংস্কারের আন্দোলনে অনেকের মনে অযথা সংশয়ের সৃষ্টি হওয়ায় কাব্যকার কাশীদাসের মর্য্যাদার হানি হইয়াছে। কাশীদাস সম্বন্ধে এই ভ্রমাত্মিকা ধারণার যথাসাধ্য অপনোদন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত প্রমাণপুঞ্জের সহায়তায় পাঠক মহাশয়গণ কবিবর কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ও অভিজ্ঞতার কথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রমাণ।

কাশীদাসের পূর্ব্বে দাশরথি রায়, রসিকচন্দ্র রায়, বিদ্যাধন ভট্টাচার্য্য, শেখর সেন, গৌরহরি দাস প্রভৃতি পাঁচালিকারগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কাশীদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কোনও পাঁচালি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে হয়"কাশীদাস কোন্ পাঁচালী পড়িয়া মহাভারত লিখিয়াছিলেন?" ইহার যে সহজ, সরল বা সুস্পষ্ট উত্তর নাই, তাহা অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য। যতদিন পর্য্যন্ত কাশীদাসের পূর্ব্বসাময়িক পাঁচালির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের অভাব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত "কাশীদাস পাঁচালি পড়িয়া মহাভারত লিখিয়াছেন" এ কথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। অনেক দিন পূর্ব্বে "কলিকাতা রিভিউ" নামক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রে আমার লিখিত এক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, "শেখর সেন কাশীদাসের জন্মগ্রহণের প্রায় ৩১ বৎসর,পরে জন্মগ্রহণ করেন,তাহা হইলে কাশীদাসের পাঁচালি পাঠ করিয়া

মহাভারত রচনা করার কথাটা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না কি?*

দ্বিতীয় প্রমাণ।

কাশীদাসের পূর্ব্বে বেদব্যাসের মহাভারত ভিন্ন আর কোনও মহাভারত ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় তখন আর কেহ মহাভারত অনুবাদ অথবা প্রণয়ন করেন নাই। কাশীদাসের পূর্ব্বে মহাভারতীয় সাহিত্য বা মহাভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কোনও গ্রন্থ ছিল না। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে কথকের মুখে কাশীদাস মহাভারত শুনিয়াছিলেন, সেই কথক ঠাকুর অবশ্যই কোনও একটা গ্রন্থের আশ্রয় লইয়া কথকতা ব্যবসা চালাইতেন, কিন্তু সে গ্রন্থখানার নাম কি? তাহা অবশ্যই বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে পারে না, কারণ সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত কিম্বা মহাভারত সম্বন্ধে কোনও পুস্তক ছিল না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কথক ঠাকুর সংস্কৃত মহাভারতের কথকতা করিতেন। সংস্কৃত মহাভারতের কথকতা হইতে পারে, এবং এখনও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও কথক ঠাকুরকে বাঙ্গালা কবিতা মুখস্থ করিতে হয়, বাঙ্গালা কবিতায় সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ শুনাইতে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হয়; কাশীদাসের পূর্ব্বে এমন কোন দিগ্‌গজ বাঙ্গালী কথকের নাম শুনা যায় নাই। কথকেরা ছয়মাসকাল একস্থানে বসিয়া বসিয়া, ভাত ডালের ধ্বংস করিতে করিতে, অষ্টাদশ পর্ব্ব সমাযুক্ত প্রকাণ্ড হইতেও প্রকাণ্ডতর সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ শ্লোকের একাদিক্রমে কথকতা করিতেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? এরূপ কথকতার

* পাঁচালি ও পাঁচালী শব্দের ভিন্নতা সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ প্রমাণ দেখ।

অস্তিত্বের প্রমাণ নাই এবং এরূপ কথকতা এখনও চলেনা এবং চলাও সম্ভবপর নহে। তদ্ভিন্ন এরূপ কথকতার প্রথা ছিলনা এবং এখনও নাই। কিয়দংশ মাত্র চৈত্র মাসে, বৈশাখ মাসে, জ্যৈষ্ঠে, মাঘের ফাল্গুনীয় পূর্ণিমায় এবং আশ্বিনের কয়েক দিবসে মহাভারতের কথকতা হইত, কথকতার এই নিয়ম। এখন জিজ্ঞাসা করি, সংস্কৃত মহাভারতের লক্ষ লক্ষ শ্লোক কাশীদাস কি কথকতায় শুনিয়াছিলেন? এরূপ কথকতা কখনও হয় নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। রাজাদিগের বাটীতে কখনও কখনও হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কাশীদাস কোনও রাজবাটীতে যান নাই, রাজার আশ্রয় অবলম্বন করেন নাই এবং রাজবাটীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন নাই, তাহার প্রমাণ আছে। কাশীদাসের নিবাস কাটোয়ার নিকট সিঙ্গিগ্রাম, সেখানকার কায়স্থেরা কাশীদাসের বংশধর অথবা রক্তসম্পর্কীয় ব্যক্তিবর্গকে "অভোজী" বলিয়া বর্ণনা করেন, এস্থলে "অভোজী" শব্দের অর্থ "যাঁহারা কাহারও বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গমন করেন না এবং জাতিভিন্ন কাহারও হাতের তৈয়ারী অন্ন গ্রহণ করেন না।" শুদ্ধাচারী নৈকষ্য (কুলীন) ব্রাহ্মণদিগের "অশূদ্র পরিগ্রাহী" উপাধি সিঙ্গির কায়স্থদিগের "অভোজী" উপাধির তুল্য। সুতরাং জিজ্ঞাসা করি, কাশীদাস কোথায় বা কোন্ ঠাকুরের কথকতা শুনিয়াছিলেন?

তৃতীয় প্রমাণ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, কথকতা শুনিয়া মহাভারতের রচনা হয় নাই; যদি তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, কাশীদাস কথকতা শুনিতেন, তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে, কেবল কথকতা শুনিয়া কি এত বড় কাব্যের প্রণয়ন সম্ভবপর হইতে পারে? যদি বল,

'সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ হইলে এত অমিল থাকিবে কেন?' ইহার উত্তরে বলা যায়, 'অমিল' কথাটা তোমাদের কল্পনা-ব্যাকরণের শব্দ বিশেষ; 'সংক্ষিপ্ত' কথাটা ব্যবহার করিলেও কতকটা যুক্তিসঙ্গত হইত, কারণ কাশীদাসের মহাভারত সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও মূলের সহিত প্রকৃত তত্ত্বের বা সত্যের অমিল নাই। কবির কল্পনায়, লেখনীর জোরে, ভাষার উচ্ছ্বাসে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জন আছে, স্বীকার করি; কিন্তু আসল কথায় কোথাও 'অমিল' নাই। তবে কেমন করিয়া বলিতে পার, "কাশীদাসের মহাভারত মূলের আদৌ অনুবাদ নহে?" অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেই কি অসত্য অনুবাদ হয়? অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেই কি বলা যায় যে, অনুবাদক অনুবাদ্য গ্রন্থের মূল ভাষা জানিতেন না? সুপ্রসিদ্ধ ইটালীয় পণ্ডিত বেনিদিক্ত্ (Father Benedict) বহুল লাটিন গ্রন্থের ইটালীভাষায় সংক্ষিপ্তানুবাদ করিয়াছেন; অনেক মহাকাব্যের ঐতিহাসিক বিবরণ সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিয়া মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন; অথচ পাদ্রী বেনিদিক্তের মত সে সময়ে লাটীন পণ্ডিত ভূতলে আর দ্বিতীয় ছিল কি না সন্দেহ।*

চতুর্থ প্রমাণ।

কেরি, মার্শমান, হেন্‌বুশ্, সোয়েঞ্জার প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পাদ্রীরা শ্রীরামপুর হইতে "ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া" নামক সম্বাদপত্র প্রকাশ করিতেন। উক্ত ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার পঞ্চম খণ্ডে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সাহেবেরা প্রবন্ধ

---

* ফাদার বেনিদিক্ত অনেকদিন আগ্রা নগরীতে "ছিলিইট" নামক মহল্লায় প্রসিদ্ধ রোমান ক্যাথলিক মিশনে পাদ্রীর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি সেণ্ট যোসেফ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক বলেন "কাটোয়ার নিকটে সীতাহাটী গ্রামে কাশীদাস সংস্কৃত পড়িতেন।" এই সীতাহাটী গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে, ইহা গঙ্গাতটে অবস্থিত এবং কাটোয়া থানার অধীন। সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন "কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস ইহাঁরা উভয়েই সংস্কৃত জানিতেন। আমরা ইহাঁদের জন্মস্থানে ইহাঁদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহাতে সাহস করিয়া বলা যায়, কাশীদাস ও কৃত্তিবাস এই দুই কবি অত্যন্ত ভাবুক ভক্ত, ধর্ম্মপরায়ণ এবং পণ্ডিত ছিলেন; হিন্দুর সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাঁদের খুব জ্ঞান ছিল এবং কঠিন সংস্কৃত ভাষা ইহাঁরা খুব যত্নের সহিত অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিয়াছিলেন।" সে কালের প্রাজ্ঞ ও ধর্ম্মভীরু পাদ্রী মহাশয়েরা বাজে কাজ করিতেন না এবং বাজে কথা কহিতেন না। কাশীদাস সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধান ও অভিমতিকে উপেক্ষা করা যায় না।

পঞ্চম প্রমাণ।

কাশীদাসের সময়ে বাঙ্গালাদেশে মুদ্রাযন্ত্র (প্রেস) ছিল না, কিন্তু কাগজের প্রচলন ছিল। কাশীদাসের পুঁথি তালপাতা কি ভূর্জ্জপাতায় অতি অল্প সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল, তাঁহার অধিকাংশ পুঁথি (প্রায় শতকরা ৯২ খানা) প্রাচীন কাগজে লিখিত হয়। সে কালে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী "কাগ্‌জী" নামক জাতি বিশেষ কাগজ তৈয়ার করার জন্য প্রখ্যাত ছিল। হুগলী, চুঁচুড়া, পাণ্ডুয়া, মোগলমারী, গড় মান্দারণ প্রভৃতি স্থানের কাগজ পশ্চিম বঙ্গে এবং কিশোরগঞ্জ, সেনহাটী, বাঘের হাট, সুসঙ্গ, সন্দীপ প্রভৃতির কাগজ সে সময়ে পূর্ব্ব বঙ্গে খুব কাট্‌তি হইত। কাশীদাসের প্রাচীন পুঁথি সমূহে (কাগজের পুঁথি সমূহে) পুরাতন বাঙ্গালা অক্ষরে স্পষ্ট লেখা আছে "মূল সংস্কৃতের

অনুবাদ।" ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই গ্রন্থ হস্ত লিখিত হয়, কিন্তু সকলেই লিখিয়াছেন "মূল সংস্কৃতের অনুবাদ।" এই সকল গ্রন্থ অনেক দেশবিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারাও লিখিত হইয়াছিল, তাঁহারাও কি ভ্রান্ত? এই সকল গ্রন্থ একটি আদি গ্রন্থ হইতে নকল করা হয়, ঐ আদি গ্রন্থ কাশীদাসের স্বহস্ত লিখিত উহাতেও লেখা ছিল "মূল সংস্কৃতের অনুবাদ"। ঐ লেখা দেখিয়া নকল করা হইয়াছিল। কাশীদাস এত বড় ধর্ম্মভীরু কবি হইয়া কি একটা জলন্ত মিথ্যা কথা লিখিয়া আপনাকে "সংস্কৃতের অনুবাদকদারী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন? আর সমগ্র দেশের লোকেরা কাশীদাসের মহাভারতকে মূলের অনুবাদ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, তবে সমগ্র দেশের সেকালের লেখক ও পণ্ডিতেরা কি আগাগোড়া ভ্রান্ত ছিল? ইংরাজী স্কুলে একটু সংস্কৃত পড়িয়া তোমরা কাশীদাসকে সংস্কৃতাজ্ঞ বলিতে সাহসী হইয়াছ. কিন্তু সেকালের মহামহা দিগ্‌গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও একথা বলিতে সাহসী হয়েন নাই।

ষষ্ঠ প্রমাণ।

আজিকালিকার কয়েকজন বাঙ্গালী লেখক (অন্ততঃ ছয় জন) লিখিয়াছেন, কাশীদাস নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। আমি সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, কাশীদাস কোথায় এ কথা লিখিয়াছেন? কাশীদাসের মহাভারত ভিন্ন অন্য কাব্য ছিল না ও নাই, তবে কি তিনি তাঁহার মহাভারতে এ কথা লিখিয়াছেন? না, তাহা লেখেন নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা শুনুন—*

* কেহ কেহ বলেন, কাশীদাস আর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা কাশীদাসের প্রণীত বলিয়া আদৌ বিশ্বাস করি না।

(স্বর্গারোহণ পর্ব্বের শেষ দেখ)

"সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
পাপ, তাপ, ব্যাধি তারে কভু নাহি ধরে॥
শুচি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে শুনে যেই জন।
অন্তকালে গোলকেতে দেখে নারায়ণ॥
শোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুণি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥"

বলুন দেখি, ইহাতে কি এই বুঝায় যে কাশীদাস পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন? তিনি লিখিতেছেন 'পাঁচালী প্রবন্ধে' আমি মহাভারত 'প্রকাশ' করিলাম। অর্থাৎ পাঁচালীকারেরা যেরূপ ভাষায়—যেরূপ ভাবে—প্রবন্ধ (বর্ণিতব্য বিষয়) রচনা করে "আমিও সেই রূপে, সেই ভাবে, সেই ভাষায়" মহাভারত রচনা ও প্রকাশ করিয়াছি। তিনি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

সুধাপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসাত্মজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরামদাস।
অলি হই কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

এখানেও সেই কথা; "পাঁচালী শুনিয়া লিখিয়াছি" একথা কোথাও নাই। বনপর্ব্বের ধৃতরাষ্ট্রের খেদ নামক অধ্যায়ে তিনি লিখিতেছেন—

মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কয় কাশীরামদাস॥

অনেকস্থানে লেখা আছে "পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভনে";

"গীতছন্দে বিরচিল কাশীরাম দাস" "কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীতে গাথা"; আর একস্থলে দেখ—

অরণ্যপর্ব্বের কথা, অতিসুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালী ছন্দে, মানস আবেশানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস॥

আর উদ্ধৃত করিবার স্থান বা সময় নাই, আর উদ্ধৃত করিবার আকাঙ্ক্ষাও নাই, কারণ মহাভারতের আগাগোড়া এইরূপ ভণিতায় পরিপূর্ণ। "পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছি" এ কথা কোথাও লেখা নাই, সুতরাং লেখকদিগের এই ধারণা ভ্রমাত্মিকা। আর এক কথা এই যে, সেক্ষপীয়রের চম্পূকাব্য ও গদ্য পদ্যময় নাটক যদি কেহ বাঙ্গালা গদ্যে বা কেবল পদ্যে সংক্ষেপে অনুবাদ করে, তাহা হইলে এবং মূল নাটকের ঐতিহাসিক বিষয় (Plot) যদি অনুবাদের সহিত ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে, তাহা হইলে মূলের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইলেও—এবং তাহা হইবারই কথা—এই অনুবাদকে 'অমিল' এবং 'মূল হইতে স্বতন্ত্র' বলিবার তোমার অধিকার জন্মিতে পারে কি? তুমি কি বলিতে পার, অনুবাদক অমুক বাবু মোটেই ইংরাজী জানেন না? তাহার পরে আর এক কথা এই যে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার, প্রমাণে লেখা হইয়াছে যে, কাশীদাসের পূর্ব্বে পাঁচালীকার ছিল না, কিন্তু কাশীদাস পুনঃপুনঃ "পাঁচালী" শব্দের উল্লেখ করিতেছেন এবং পুনঃপুনঃ বলিতেছেন "আমি পাঁচালী ছন্দে রচনা করিয়াছি," তবে পাঁচালী শব্দ কোথা হইতে আসিল? এই কথার একটা মীমাংসা করা আবশ্যক। বাঙ্গালায় "পাঁচালী" এইরূপ বানান করা হয় কিন্তু কথাটা 'পাঁচালী' নহে—পাঁচালি।

পশ্চিম বঙ্গে (রাঢ়দেশে) এই কথার উৎপত্তি; পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চারণ দোষে সংস্কৃত পঞ্চশব্দ পাশ্‌ এবং পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ বলিয়া উচ্চারিত হয়। অলিশব্দে ভ্রমর। বাঙ্গালায় বারেয়ারী শব্দ বারোয়ারী বলিয়া উচ্চারিত হয়, বারেয়ারী হিন্দী শব্দ, অর্থ—বারজন ইয়ার বা এয়ার (বন্ধু অথবা গ্রামবাসী) একত্রে মিলিয়া যে উৎসব করে তাহাই। গ্রামের মাতব্বর (প্রধান) পঞ্চজন মনুষ্য মিলিয়া—অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ মিলিয়া—যাহা করে, তাহা পাঁচালির কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়। হিন্দীভাষায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাড়ার প্রধান লোককে "পাড়ার নাক" বলে, কাঠিবাড়ে পাড়ার প্রধান লোককে "পাড়ার চোখ্‌" বলে; কোচিন রাজ্যে পাড়ার প্রধান লোক "মশুর ডাল' (The Masoors Pulse of the Village) বলিয়া অভিহিত হয়, আর অতি পুরাকাল হইতে রাঢ়দেশে গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডল মাতব্বর লোক ও প্রধানেরা 'অলি' "ভ্রমর' 'মক্ষিকা' The Bee of the Village বলিয়া সম্বোধিত হইয়া আসিতেছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় অনেকের বংশগত উপাধি অলি, ভোম্‌রা ইত্যাদি। কাশীদাসের পূর্ব্বে ও তাঁহার সময়ে বারোয়ারীর লোকেরা পাঁচালি বলিয়া গণ্য হইত। ইহারা ছড়া গাহিত, সং সাজিয়া নাচিত ও তামাসা করিত, তর্জ্জা ও ঝুমুরের মত পয়ারছন্দে গালাগালি করিত, কিন্তু পাঁচালি গ্রন্থ লেখে নাই অথবা দাশুরায়ের মত পাঁচালি প্রথাও তাহারা জানিত না। পাঁচালি বলিয়া কোনও পুস্তক সে সময়ে ছিল না, তাহাদের অধিকাংশ ছড়া পয়ারে মুখে মুখে বিরচিত হইত, এবং তাহাই গান করা হইত। তখন এইরূপ পাঁচালি ছিল। ক্রমে উহা "পাঁচালী" নামে আখ্যাত হইয়া পুস্তকাকারে আসিয়া পেঁাছিল এবং উহার প্রথা পরিবর্ত্তিত হইল। রাঢ়দেশে এখনও ঐরূপ গাওনা আছে, তাহার নাম এখনও

পাঁচালি, তাহাদের পুস্তক নাই, মুখে কেবল কবিতা অভ্যাস করা আছে, কিন্তু তাহাদের রুচি অনেক সময়ে বিকৃত হইলেও রচনা ও ভাষায় তাহাদের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাশরথী রায় ইহাদের "ধরণ" অনুকরণ করিয়া পাঁচালী নাম দিয়াছেন, পাঁচালী শব্দ ভাল বাঙ্গালা নহে, ইহা রাঢ়দেশের প্রকৃত "পাঁচালি" শব্দ। ইহারা মহাভারত জানিত না এবং গাহিত না ; এখনও গায়না এবং কখনও গায় নাই। কাশীদাস ইহাদের মুখে মহাভারত শুনেন নাই, ইহাদের পয়ার ছন্দে এবং অন্যান্য ছন্দে ইনি মহাভারত রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ভাষার অনুকরণ করিয়া নিজের মহাভারত মধ্যে সেইরূপ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্যথা—

(বিরাটপর্ব্বে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য দেখ।)

প্রণমহ দ্বিজ পদ সরসিজ
স্বজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ মহিমা যে পদ
চক্ষে অধোক্ষজ ভূষা॥
যে পদ ভজিল সেই সাধু নীল
তরিল দুঃখ পিপাসা।
অবনি অবধি যতেক তীর্থাদি
যে পদে সবার বাসা॥
ভবার্ণবাপ্লব যে পদ পল্লব
লক্ষ্মী বশকারী ধূলি।
আয়ুযশপ্রদ অজয় সম্পদ
পাইতে যাহারে বুঝি॥

অন্যত্রে—

১। ঘটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কামকর্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥
(বনপর্ব্ব)।

২। রবি হেন চক্ষু রাঙ্গা দেখি লাগে ডর।
পাসরিল মুখ খান যেন সরোবর॥
চরণের দপদপি বসুমতি কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি এক লাফে॥
(দ্রোণপর্ব্ব)।

৩। উঠ উঠ মহারাজ, সকল বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়ত যার সেই দিন মৃত্যু তার
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যম ঘরে,
মৃত্যুবশ সব চরাচর।
সকল সংহারে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর।
(নারীপর্ব্ব)

৪। পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন পক্ষী যেন মরয়ে পুড়িয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন ধনহীন লোক॥

*　　　*　　　*　　　*　　　*

একাদশী ব্রত যেই জন না করিবে।
সত্য কহিলাম এই দেশে না থাকিবে॥
জীব হিংসা না করিবে আমার সংসারে।
এই নিরূপণ আমি কহিনু সবারে॥

(অশ্বমেধপর্ব্ব)

কাশীদাসের এই ছন্দ ও ভাষা রাঢ়দেশের পুরাতন পাঁচালির (পাঁচালীর নহে) ভাষার অনুকরণ। কাশীদাস রাঢ়দেশের লোক ছিলেন, কারণ সিঙ্গিগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। তিনি পাঁচালী শুনিয়া মহাভারত লেখেন নাই, পাঁচালির প্রবন্ধের (ভাষার) অনুকরণ করিয়াছেন।

মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥*

সপ্তম প্রমাণ।

কাশীদাস নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত মহাভারতের—ব্যাসদেবের মহাভারতের—বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। বনপর্ব্বে তিনি লিখিতেছেন—

বনপর্ব্ব ব্যাস ঋষি করিলা প্রকাশ।
ভাষায় রচিলা তাহা কাশীরাম দাস॥

এখানে ইহার এই অর্থ যে "ব্যাসের বিরচিত বনপর্ব্ব কাশীরাম দাস বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিল।" আদিপর্ব্বের শেষে স্পষ্ট লেখা আছে—

---

(১) বটতলার পুস্তকে ও অন্যান্য লোকের সংস্করণে পাঁচালি শব্দ ভ্রমক্রমে প্রায় "পাঁচালী"ই লিখিত আছে।—লেখক।

সুধাময় ভারত শ্রীব্যাস বিরচিল।
এত দূরে আদিপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

সভাপর্ব্বে দেখ—

সভাপর্ব্বে সুধারস রাজসূয় কথা।
কাশীরাম দাস কহে ব্যাসদেবে গাথা॥

ভীষ্ম পর্ব্বে দেখ—

ব্যাস বিরচিত গাথা, অপূর্ব্ব ভারত কথা,
শ্রুত মাত্র কলুষ বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত সুজনের মনঃপূত
বিচরিল কাশীরাম দাস॥

মুষলপর্ব্বে দেখ—

ভারত মুষলপর্ব্ব ব্যাস বিরচিত।
কাশীরামদাস কহে রচিয়া সঙ্গীত॥

সমগ্র মহাভারতের শেষে, ব্যাসের সমগ্র মহাভারতকে লক্ষ্য করিয়া কাশীরামদাস লিখিয়াছেন—

শ্লোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালি প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥

শান্তি পর্ব্বে তিনি নিম্নলিখিত কথায় সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
সংক্ষেপে কহিনু কিছু রচিয়া পয়ার।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধু নর॥

আবার দেখ আদি পর্ব্বে—

প্রথমে বন্দিব গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাঁহার রচিত ভারত কাহিনী॥

এই উক্তিতে কাশীরামদাস বেদব্যাসকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কবিতা দ্বারা অকাট্যভাবে দেখান যায়, কাশীদাস মূল মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছেন এবং সর্ব্বধারণের সুবিধার জন্য অনুবাদ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তিনি যে সংস্কৃত জানিতেন না, অথবা সংস্কৃতের অনুবাদ করেন নাই, একথা তিনি কোথাও বলেন নাই, বরং আপত্তিকারীদিগের অবথা আপত্তিগুলি তাঁহার রচনা দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে।

এই বারে আমি অষ্টম প্রমাণের অবতারণা করিবার আকাঙ্ক্ষা করি।

অষ্টম প্রমাণ।

কাশীদাসের পুঁথি (মহাভারত) সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বটতলার মোহনচাঁদ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। মোহনচাঁদ অপেক্ষা পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতা বটতলায় আর কেহ ছিল না, ইনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় রীতিমত বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ অধরচন্দ্র কর্ম্মকারের পিতামহের জ্যেষ্ঠসহোদর এজন্য বাঙ্গালা অক্ষর (Type) তৈয়ার করেন। ত্রয়োদশ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে কাশীদাসের মহাভারত বটতলায় প্রথম ছাপা হয়। গ্রন্থের মলাটে পণ্ডিতেরা লিখিয়াছিলেন,

শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।
"মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত।"
সংস্কৃত মূল মহাভারত।

যাহা কাটোয়া পরগণার এলাকায়
সিঙ্গিগ্রাম নিবাসী ৺ভগবদ্ভক্ত

কাশীরাম দাস তেঁহ বাঙ্গালায়
পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করণে
শ্রীশ্রীশ্রীবিষ্ণুপদ সরোজের বিমল
মধু তেঁহ ভৃঙ্গরূপে পান করিয়াছেন ও ভক্তবৃন্দেরে
করাইয়াছেন।
আদি, সভা, বন, বিরাট প্রভৃতি অষ্টাদ
পর্ব্বের অনুবাদ।
পয়ারাদি ছন্দে
৺কাশীরামদাস অনুবাদকারী ও
প্রণয়নকারী।" (ইত্যাদি)।

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই তেরজন পণ্ডিতের সকলের নাম পাই নাই, কতকগুলির নাম পাইয়াছি, তদ্যথা—কৈলাসনাথ তত্ত্বনিধি সাং চাতরা (শ্রীরামপুর); যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সাং অধিকারীপাড়া (অম্বিকা কালনা গ্রাম); হরবল্লভ বিদ্যানিধি সাং সোণাকাটি, পরগণা হাঁসদহ; এবং কেনারাম শিরোমণি সাং গড়মান্দারণ পরগণা জাহানাবাদ। যাহা হউক, এই সকল পণ্ডিত সে সময়ে যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের কার্য্য দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহাঁরা কাশীরামদাসকে মূলের অনুবাদক বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া গিয়াছেন। এই তেরজন দিগ্‌গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের সার্টিফিকেট্‌খানা কি সহজে উপেক্ষা করা যাইতে পারে ?

নবম প্রমাণ।

কাশীদাসের অনেক পরে বর্দ্ধমানের মহারাজা শ্রদ্ধেয় মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের এবং কলিকাতার খ্যাতনামা জমিদার বাবু কালী প্রসন্ন

সিংহের যত্নে, ব্যয়ে ও উৎসাহে বহুসংখ্যক দেশমান্য সুপণ্ডিতের দ্বারা সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন মানকর নিবাসী প্রতাপচন্দ্র রায় অন্যের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন, ইহাঁদের কেহই—বিশেষতঃ সভাসদ পণ্ডিতগণ—"কাশীদাসের সংস্কৃতে অজ্ঞতা" সম্বন্ধে অভিমতি দেন নাই। বরং মহাতাপচাঁদ বাহাদুর স্পষ্টই বলিয়াছেন "কাশীদাস যে সংস্কৃত জানিতেন না, ইহা বালকের কথা। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, তিনি খুব সংস্কৃত জানিতেন, আমার বহুসংখ্যক পণ্ডিত মহাশয়দিগেরও এই মত।" মহারাজা মহাতাপচাঁদের ভাগলপুরে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে বহরমপুরের জনৈক দেশপ্রসিদ্ধ হিন্দু জমিদারকে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি ভাল বাঙ্গালা শিখিতে চাও, তবে কাশীদাসী মহাভারত পাঠ কর। কাশীদাসের বাঙ্গালা সংস্কৃতের খুব নিকট নিকটে পৌঁছিয়াছে, ইহা সংস্কৃত-অভিজ্ঞ বহুদর্শী পণ্ডিতের মহাকাব্য।" মহারাজা মহাতাপ চাঁদের বহুদর্শনজনিত এই অভিমতি সহজে খণ্ডন করা বা উপেক্ষা করা যায় না। পণ্ডিতের মতই বা কেমন করিয়া উপেক্ষা করিবে?

দশম প্রমাণ।

(সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।)

কায়স্থ-কুলোদ্ভব কবিবর কাশীদাস যে সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ—তাঁহার নিজের মহাভারত। কাশীদাসের মহাভারত কাশীদাসের সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতার অমর সাক্ষী। যাঁহারা তাঁহার মহাভারত মনোনিবেশ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া অর্থ বুঝিয়াছেন এবং মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে যে কাশীদাস কায়স্থ হইয়াও

ব্রাহ্মণ্যাধ্যাপকের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় প্রচুর দখল রাখিতেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে কাশীদাসের সংস্কৃত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

(ক) বেদব্যাসের সকল পর্ব্বই কাশীদাস উল্লেখ করিয়া মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সংক্ষিপ্তভাবে, বিবিধছন্দে, অনুবাদ করিয়াছেন। "আদি" হইতে "স্বর্গারোহণ" পর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল পর্ব্বেরই সংক্ষিপ্ত সারতত্ত্ব কাশীদাসের মহাভারতে পাঠ করিতে পাওয়া যায়।

(খ) ব্যাসের মহাভারতের পর্ব্বান্তর্গত অধ্যায় সমূহে যে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা আছে, বিশেষতঃ ভক্তি যোগ, মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্বন্ধে যে যে স্থলে বর্ণনা আছে, কাশীদাসে তাহার একটিও বাদ যায় নাই। (গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও মিলাইয়া দেখুন। প্রমাণের জন্য পুস্তকের কবিতা উদ্ধৃত করিতে গেলে একখানা বিস্তৃত পুস্তক লিখিতে হয়, সুতরাং উদ্ধৃত করিলাম না।)

(গ) নদনদী সাগর সরোবর নগর পল্লীপর্ব্বত অরণ্য প্রান্তর মরুভূমি ইত্যাদির বর্ণনা যাহা বেদব্যাসের ভারতে আছে, কাশীদাসে তাহার প্রয়োজনীয় অংশের উহ্য নাই। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনা ও বিষয় পর্য্যন্ত কাশীদাসে খুঁজিলে পাইবেন। সংস্কৃত না জানিলে, কেবল কথকতা শুনিয়া বা পাঁচালী শুনিয়া কি এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মিল থাকা সম্ভবপর? এবং এত বড় কাব্য লেখা সম্ভব? বেদব্যাসের মহাভারতের কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক আছে, কাশীদাস তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

(ঘ) বেদব্যাসের ভারতের অনেক শ্লোক কাশীরাম দাস অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়াছেন, যথা—

(বনপর্ব্ব)

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং ॥

(মূল মহাভারত)

প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যম ঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে ॥
আপনার চিরজীবী হউক অক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয় ॥ (কাশীদাস)

আরও দেখ—

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কশ্চমোদতেত।
মামৈত্তাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলংপিব ॥ (মূল)
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে ॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥ (কাশীদাস) ॥

উদ্যোগপর্ব্বে মূল মহাভারতের সংস্কৃত শ্লোক কাশীদাসের মহাভারতে উদ্ধৃত আছে। ঐ পর্ব্বে বিদুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন উপলক্ষে অবতারদিগের সংস্কৃত ভাষায় স্তব আছে। শান্তিপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের স্তবে কেবল সংস্কৃত ভাষায় স্তোত্র পড়ুন। এই সকল স্তব ও স্তোত্র কাশীদাসের নিজের, মূল হইতে উদ্ধৃত।

(ঙ) কাশীদাসের মহাভারতের অনেক স্থানের ভাষা ও রচনা পাঠ করিলে তাহার সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহ থাকে না। অসংখ্য স্থান হইতে অসংখ্য কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কেবল আপাততঃ কতকগুলি দেখাইয়া দিব।